প্রথম অধ্যায়

বাংলা নাটকের প্রবহমান ধারায় উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নাট্যচর্চার অবস্থান

দিনাজপুর জেলার পরিচয়:

ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা অন্যতম ও উল্লেখযোগ্য প্রান্তিক দেশ বাংলা। এই বাংলায় ক্রমান্বয়ে মিশেছে গঙ্গা-করতোয়া-আত্রেয়ী-তিস্তা, সাগর-পর্বত, রাঢ়-পুণ্ড্র-বঙ্গ-সমতট। সুদূরপ্রাচীনকাল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত মিশেছে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর রক্ত ও সংস্কৃতি। এই বিচিত্র রক্ত ও সংস্কৃতির ধারায় ঐতিহ্যমণ্ডিত বাংলার একটি সুসমৃদ্ধ ও প্রাচীন ভূখণ্ড হল দিনাজপুর। এই প্রসঙ্গেই ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন— ''গঙ্গা-করোতোয়া-লৌহিত্যবিধৌত, সাগর-পর্বতধৃত, রাঢ়-পুণ্ড্র-বঙ্গ-সমতট এই চতুর্জনপদসম্বদ্ধ বাঙলাদেশে প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া তুর্কী অভ্যুদয় পর্যন্ত কত বিভিন্ন জন, কত বিচিত্র রক্ত ও সংস্কৃতির ধারা বহন করিয়া আনিয়াছে, ... সকলের উপর এই বিচিত্র রক্ত ও সংস্কৃতির ধারা তাহার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রাখিয়া গিয়াছে বাঙালীর প্রাচীন সমাজবিন্যাসের মধ্যে।''[১] প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ এবং পুরনো জন-অধ্যুষিত অঞ্চল ছিল দিনাজপুর জেলা। নির্মাণ, বিনির্মাণ ও পুনর্নির্মাণের গতিচক্রে প্রবাহিত হয়ে এই জেলার একটি স্বতন্ত্র্য ধরণ বা রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। লক্ষ করা যায় যে, পূর্ব পাকিস্তান-বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলাও ভেঙ্গে নতুন নতুন জেলা হয়েছে কিন্তু তার পরিণামে খুব ইতিবাচক একটি নতুন সত্তা বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার জন্ম হয়েছে। অর্থাৎ প্রাক্ ঔপনিবেশিক দিনাজপুর, ঔপনিবেশিক দিনাজপুর, বৃহত্তর দিনাজপুর, বিভাজিত দিনাজপুর এসব নানারূপে দিনাজপুর জেলা এক ঐতিহ্যময় জেলারূপে পরিচিতি লাভ করেছে। মোটকথা অতীতের এই বৃহত্তর ভূখণ্ড বা অঞ্চল পর্যায়ক্রমে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমানকালে ক্ষুদ্র খণ্ডাংশে পরিণত হয়েছে।

অখণ্ড বা বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার অতীত জানার জন্য আমাদের ফিরে যেতে হবে প্রায় আড়াই হাজার বছর পিছনে। এই দিনাজপুর জেলা রামায়ণ, মহাভারত ও নানা পৌরাণিক কাহিনি-কিংবদন্তীতে সঞ্জীবিত, জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বহু স্মৃতি বিজড়িত, মৌর্য-গুপ্ত-পাল-সেন যুগের সভ্যতার আলোকে আলোকিত, অসংখ্য স্থপতি ও ভাস্করের কীর্তিধন্য, মুসলিম যুগের রাজধানীর অবস্থিতি এই জেলাকে করেছে মধ্যযুগের ইতিহাসে স্মরণীয় এবং আধুনিক যুগের বিপ্লবী আন্দোলনে ঐতিহ্যপূর্ণ ছিল এ দিনাজপুর জেলা। তাই ইতিহাস ও সভ্যতার নিরিখে দিনাজপুর জেলা আমাদের

সম্মুখে অতীত যুগের অনেকগুলি স্বর্ণময় অধ্যায় উন্মুক্ত করে দিয়েছিল।

এই ভুমিখণ্ড বারে বারে খণ্ডিত হলেও সাধারণ শব্দ দিনাজপুর নামটি থেকেই গেছে। তাই দিনাজপুরের যে কোন অংশ নিয়ে আলোচনা করতে গেলেই মূলত অখণ্ড দিনাজপুরের আলোচনা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। এর ইতিহাস, ভূগোল, নৃ-তত্ত্ব, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, নাট্যচর্চা, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলি এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনের দ্বারা আবদ্ধ। কারণস্বরূপ বলা যায় অতীতকাল থেকেই এই ভূমিখণ্ড প্রায় একই ভৌগোলিক সীমারেখায় আবদ্ধ। পাশাপাশি রাজনৈতিক সীমারেখার ক্ষেত্রেও তাই। এই ভুখণ্ডের উপর সুদৃঢ় অতীতকাল থেকে মৌর্য, গুপ্ত, পাল, সেন, মুসলমান, বৃটিশ রাজবংশ পর পর রাজত্ব করেছিলেন। দিনাজপুর নাম মুসলমান সময়কালের অবদান ছিল। যদিও বৃটিশ রাজত্বের প্রথম থেকেই এ নাম পাওয়া যায়। সুতরাং একথা সুস্পষ্ট ভাবে বলা যায় যে, এ নামের উৎপত্তি ব্রিটিশ শাসন শুরু হওয়ার পূর্ব থেকেই ছিল। মোটকথা ব্রিটিশ শাসনপর্বে দিনাজপুর জেলার একটি পাকাপাকি সীমানার রূপরেখা পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাচীনকালের কোন গ্রন্থে এ নামের উল্লেখ ছিল না। প্রাচীনকালে দিনাজপুর অন্য নামে পরিচিত ছিল। প্রভাসচন্দ্র সেনের 'বগুড়ার ইতিহাস' গ্রন্থ থেকে জানা যায় দিনাজপুর মহাভারতের কালে মৎস্যদেশের অংশ ছিল, নাম ছিল জৌতিষিক। প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে শক্তিশালী জাতি হিসেবে পরিচিত পুণ্ড্ররা উত্তরীয় দেশে বা উত্তরবঙ্গে আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তারের বহু পূর্বেই এই অঞ্চলে বসবাস শুরু করেছিল। অবিভক্ত দিনাজপুর জেলা প্রাচীন যুগে পুণ্ড্ররাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পুণ্ড্রজাতির বাসভূমি ছিল এই পুণ্ড্ররাজ্য। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' প্রদত্ত একটি উপাখ্যান অনুসারে জানা যায় যে, ঋষি বিশ্বামিত্রের শাপে তাঁর আজ্ঞা অমান্যকারী পুত্রদের বংশের অন্ত্যজ জাতিভুক্ত পাঁচটি সন্তান হয়—অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ ও মূতিব। এই পুণ্ড্র থেকেই পুণ্ড্রজাতির উৎপত্তি। মহাভারতের আদিপর্বে এবং হরিবংশে উল্লিখিত অপর একটি উপাখ্যান অনুযায়ী বলি রাজার পাঁচ পুত্রের অন্যতম ছিলেন পুণ্ড্র এবং তিনি যে জনপদের অধিপতি হন তার নাম পুণ্ড্রদেশ। এ প্রসঙ্গে নীহাররঞ্জন রায় জানিয়েছেন—''পুণ্ড্রজনদের সর্বপ্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায় 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' এবং তারপরে বোধায়ন—'ধর্মসূত্রে'। ...খ্রীষ্টপূর্ব আনুমানিক দ্বিতীয় শতকের মহাস্থান-ব্রাহ্মীলিপিতে এক পুন্দনগল বা পুণ্ড্র নগরের উল্লেখ আছে।'' তিনি আরও বলেছেন— ''পুণ্ড্র - পুণ্ড্রবর্ধন নগর উত্তর বাংলার সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রাচীন নগর। 'দিব্যাবদান' 'রাজতরঙ্গিনী' 'বৃহৎকথামঞ্জরী' প্রভৃতি গ্রন্থে এই নগরের উল্লেখ আছে।''[২] আবার ড. সুকুমার সেনের মতানুযায়ী বলা যায় 'পুণ্ড্রবর্ধন এর পুণ্ড্রজাতির নাম পাওয়া গিয়েছে 'ঐতরেয়ব্রাহ্মণে' (৭-১৮) অন্ধ্র-পুলিন্দ-শবর প্রভৃতি ব্রাত্য ও দস্যুভূয়িষ্ঠ জাতির সঙ্গে। 'পুণ্ড্র' নাম হইতেই বাঙ্গালায় আখের নাম 'পুড়'।[৩]

উত্তরবাংলায় প্রাপ্ত পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকের তাম্রশাসনে উত্তরবাংলাকে পুণ্ড্রবর্ধন নামক ভুক্তি বা প্রদেশ বলা হয়েছে। তাই প্রাচীন যুগে অবিভক্ত দিনাজপুরে জেলা পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি নামে পরিচিত ছিল। এর পশ্চিমে মহানন্দা, পূর্বে করতোয়া, দক্ষিণ-পশ্চিমে গঙ্গা এবং উত্তরে তিস্তা ও এর উপনদী দিয়ে ঘেরা অঞ্চলগুলিই ছিল মূলত পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির উঁচু ভূখণ্ড। মোটকথা প্রাচীনকালেই দেখা যায় এই পুণ্ড্ররাজ্য নিয়েই গুপ্ত ও পাল আমলে গঠিত হয়েছিল পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি নামে একটি প্রদেশ। পদ্মানদীর উত্তরস্থ অবিভক্ত দিনাজপুর, মালদা, বগুড়া, পাবনা ও রাজশাহী এই কয়টি জেলা পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত ছিল এবং পরবর্তী সেন আমলে এই ভুক্তির এলাকা বহু বিস্তৃত হয়েছে।

আমরা জানি গুপ্তযুগে প্রাপ্ত দশটি তাম্রলিপির মধ্যে ছয়টি উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর জেলায় পাওয়া গেছে। এই তাম্রলিপিগুলি থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, অন্তত ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত পুণ্ড্রবর্ধনে গুপ্ত আধিপত্য বজায় ছিল। কিন্তু গুপ্তদের পতনের পর এই অঞ্চলে বহিরাগতদের আক্রমণের ফলে বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়। এরপর সপ্তম শতকের সূচনায় দেখা যয়া স্বতন্ত্র গৌড়রাজ্যের উদ্ভব হয়েছে এবং মহাসামন্ত শশাঙ্ক ছিলেন সেখানকার অধিপতি। পুণ্ড্রবর্ধন শশাঙ্কের রাজ্যভুক্ত ছিল। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর কামরূপরাজ ভাস্কর বর্মা শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ অধিকার করে সেখান থেকে তাম্রলিপির মাধ্যমে ভূমিদান করেছিলেন এবং একথাও অনুমিত হয় পুণ্ড্রবর্ধনও সমায়িকভাবে তাঁর রাজ্যভুক্ত হয়েছিল কিন্তু বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। এর ফলে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলায় এক বিরাট শূন্যতা, অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয় মাৎস্যন্যায়। এই মাৎস্যন্যায় দূর করার জন্য 'প্রকৃতিপুঞ্জ' পুণ্ড্রবর্ধন নিবাসী গোপালকে রাজা নির্বাচিত করে। বাংলা তথা পুণ্ড্রবর্ধনে পাল রাজারা প্রায় চারশো বছর রাজত্ব করেন এবং খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকে সেন বংশীয় নৃপতিদের অভ্যুদয় হলে এই পুণ্ড্রবর্ধন তাদের অধিকারভুক্ত হয় ও পাল রাজত্বের অবসান ঘটে। পরিশেষে একথা বলা যায় যে অতীতকালের পুণ্ড্রবর্ধন সমগ্র উত্তরবঙ্গ ব্যাপি বিস্তৃত ছিল।

খ্রিস্টীয় দশম শতক থেকে পুণ্ড্রবর্ধন বরেন্দ্র নামে অভিহিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ এই পুণ্ড্রবর্ধন ভূখণ্ডই পাল শাসনকাল থেকে বরেন্দ্র অঞ্চল নামে খ্যাত হয়। বরেন্দ্রভূমির পরিচয় নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে নানা মত রয়েছে। পূর্বে প্রাচীন করতোয় নদী, পশ্চিমে মহানন্দা, গঙ্গা ও পদ্মা, দক্ষিণে পদ্মা, উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ চারিদিকে এই বিচ্ছিন্ন ভূভাগই 'বরেন্দ্রী' নামে পরিচিত ছিল। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বঙ্গদেশের প্রাচীন ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত এক বলিষ্ঠতম উপাদান। এই বরেন্দ্রভূমি সম্বন্ধে কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' কাব্যগ্রন্থে বলা হয়েছে, পুণ্ড্রবর্ধনপুর বরেন্দ্রীর মকুটমণি, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম স্থান (''বসুধাশিরো বরেন্দ্রী-মণ্ডল

চুড়ামনৈঃ কুলস্থানম্।'') এছাড়াও কবি তাঁর কাব্যের কবি প্রশস্তিতে বরেন্দ্রীকে পালরাজাদের 'জনকভু' অর্থাৎ পিতৃভূমি বলে ইঙ্গিত করেছেন এবং গঙ্গা-করতোয়ার মধ্যে বরেন্দ্রভূমির অবস্থিতি নির্দেশ করেছেন। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়ে মতে, ''বগুড়া-রাজশাহীর উত্তর, দিনাজপুরের পূর্ব এবং রংপুরের পশ্চিম স্পর্শ করে পুরা রেখার বিস্তৃত স্ফীতি, উচ্চ গৈরিকভূমি দেখতে পাওয়া যায়, এটিই মুসলমান ঐতিহাসিকদের বরিন্দ্, বরেন্দ্রভূমির কেন্দ্রভূমি।''[৪]

দীনেশচন্দ্র সেনের 'বৃহৎবঙ্গ', বৈদ্যদেবের 'কমৌলি-লিপি' ও হরিসেনের 'বৃহৎকথাকোষ' গ্রন্থে বরেন্দ্রীর উল্লেখসহ বর্ণনা পাওয়া যায়। হরিসেনের লেখা 'বৃহৎকথাকোষ' নামক জৈন গ্রন্থে বলা হয়েছে—

''পূর্ব্বদেশে বরেন্দ্রস্য বিষয়ে ধনভূষিতে।
দেবকোট্ট পুরং রম্যং বভূব ভূমি বিশ্রুতম্।।''

অর্থাৎ পূর্বদেশে ধনশালী বরেন্দ্র বিষয়ে বহু বিশ্রুত রমণীয় নগর দেবকোট অবস্থিত ছিল। সেন বংশীয় রাজাদের তাম্রলিপি থেকে জানা যায় বরেন্দ্রীর অন্তর্গত স্থানগুলির অবস্থান ছিল বর্তমান বগুড়া, দিনাজপুর, রাজশাহী জেলা এবং পাবনা। আবার এ বিষয়ে ঐতিহাসিক মিন-হাজ-উদ্দিনের লেখা 'তবাকাৎ-ই-নাসিরি' গ্রন্থে বলা হয়েছে গঙ্গার পূর্বতীরবর্তী এবং লক্ষণাবতী রাজ্যের একটি অংশমাত্র ছিল বরেন্দ্রভূমি এবং তাঁর এই গ্রন্থ থেকে আরও জানা যায় যে, লক্ষণাবতী রাজ্যের দুটি বিভাগ ছিল গঙ্গার দুই তীরে। পশ্চিমে রাল্ অর্থাৎ রাঢ়দেশ ও পূর্বে বরিন্দ অর্থাৎ বরেন্দ্রভূমি। প্রাচীন বরেন্দ্রভূমির উত্তরদিকে বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ নিয়ে গঠিত হয়েছিল দিনাজপুর জেলা।

বৃহত্তর বরেন্দ্রভূমির ভৌগোলিক পরিধি সুবিস্তৃত ছিল। তাই 'বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস' গ্রন্থে বরেন্দ্রী অঞ্চলের সীমা সম্পর্কে বলা হয়েছে—''প্রাচীন বরেন্দ্রভূমি পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্ধনের এক বিশাল অংশ জুড়ে অবিস্থিত ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশের রাজশাহী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ, বগুড়া, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলার অধিকাংশ এলাকা প্রাচীন বরেন্দ্র অঞ্চলের অন্তর্গত ছিল বলে মনে করা যায়। পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলার কিছু অংশ, শিলিগুড়ির অংশ এবং পশ্চিম দিনাজপুরের অধিকাংশ অঞ্চল বরেন্দ্রভূমির অংশ।''[৫]

কোনো কোনো অভিধানে বরেন্দ্র বলতে সাধারণভাবে উত্তরবঙ্গকে বোঝানো হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বরেন্দ্রের সীমারেখা হিসেবে বলা যায়, অবিভক্ত উত্তবঙ্গের রাজশাহী জেলা, রংপুর ও বগুড়া এবং পাবনা জেলায় যে অংশ করতোয়া নদীর পশ্চিমে অন্তর্ভুক্ত মালদা জেলার যে অংশ মহানন্দার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত এবং দিনাজপুর জেলার যে অংশ বাণগড় ও তার দক্ষিণ অংশ, এই অঞ্চলগুলি নিয়েই ছিল বরেন্দ্রভূমি। একথা পরিষ্কার ভাবে বলা যায় বরেন্দ্রভূমি বলতে

সাধারণত যা বোঝায় তা হল অবিভক্ত উত্তরবঙ্গের রাজশাহী, দিনাজপুর, বগুড়া, মালদহ, রংপুর ও পাবনা জেলার অংশবিশেষ। বর্তমান মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলার অংশও বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত। বরেন্দ্রীর বাকী অংশবিশেষ বাংলাদেশের মধ্যে পড়েছে। এই বরেন্দ্রভূমি সম্পর্কে মেহ্‌রাব আলী জানিয়েছেন— ''সাম্প্রতিককালের বাংলাদেশের যে এলাকাটি উত্তরবঙ্গ নামে পরিচিত, মোটকথা তাই ছিল এককালের ইতিহাস প্রসিদ্ধ বরেন্দ্রভূমি। এই ভূমি প্রাচীনভূমি। ভূতাত্ত্বিকভাবে বলা যায় দিনাজপুর জেলা ও বরেন্দ্রভূমি এক ও অভিন্ন।''[৬]

তাই পরিশেষে একথা বলা যায় যে, বরেন্দ্রভূমি একটা বিরাট ভূখণ্ড ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতে পারে না। গুপ্ত-পাল-সেন যুগে উল্লিখিত পুণ্ড্রবর্ধনভুক্ত বা প্রদেশের অন্তর্গত কোটিবর্ষ বিষয় ও পঞ্চনগরী বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল দিনাজপুর। পুণ্ড্রদেশে দুটি প্রাচীন নগরের মধ্যে একটি হল কোটীবর্ষ বা বাণগড়। অপরটি হল গৌড়পুর। এই কোটীবর্ষ নগর বলতে সমগ্র দিনাজপুর অঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে। এই বিষয়ে নীরারঞ্জন রায় বলেছেন- ''পুণ্ড্রনগরের পরেই কোটীবর্ষ নগরের কথা এসে যায়। হেমচন্দ্রের 'অভিধান চিন্তামণি' পুরষোত্তমের 'ত্রিকাণ্ড শেষ' প্রভৃতি গ্রন্থের মতে দেবীকোট, বাণপুর, উমাবন, শোণিতপুর প্রভৃতি কোটীবর্ষেরই বিভিন্ন নাম। অভিধানকারদের মতে কোটীবর্ষের খ্যাতি ও মর্যাদা কৌশম্বী, প্রয়াগ, মথুরা, উজ্জয়িনী, কান্যকুব্জ, পাটলীপুত্র প্রভৃতি নগরের চেয়ে কম নয়। বায়ু পুরাণে 'কোটীবর্ষ নগরম' এর উল্লেখ আছে। জৈন কল্পসূত্রে বলা হয়েছে মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের গুরু ভদ্রবাহুর এক শিষ্য গোদান প্রাচ্য-ভারতের জৈনদেরকে যে চারটি শাখায় বিভক্ত করেছিল তার একটি কোটীবর্ষের সঙ্গে যুক্ত। পঞ্চম শতক থেকে শুরু করে পাল আমলের শেষকাল পর্যন্ত কোটীবর্ষ নগরেই পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির সর্বপ্রথান বিষয় কোটীবর্ষ-বিষয়ের শাসনাধিষ্ঠান অবস্থিত ছিল।''[৭] দিনাজপুর জেলার দামোদর গ্রাম থেকে পাওয়া তাম্রলিপি থেকে জানা যায় যে, গুপ্তযুগে বঙ্গদেশ দুটি বিভাগ বা ভুক্তিতে বিভক্ত ছিল। একটি পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি অপরটি বর্ধমানভুক্তি। এর মধ্যে পুণ্ড্রবর্ধন বিভাগের অধীনে তিনটি জেলা (বিষয়) ছিল। এগুলি হল কোটিবর্ষ, খারটপাড়া এবং পঞ্চনগরী। কোটিবর্ষ জেলার সদর ছিল বর্তমান বাণগড়।এ বিষয়ে নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন— ''হেমচন্দ্রের পুনর্ভবাতীরস্থ কোটীবর্ষ এবং বলিরাজপুত্র বাণাসুরের ও ঊষা-অনিরুদ্ধের পুরাণ-স্মৃতি বিজড়িত, বাণপুর বর্তমান দিনাজপুর জেলার বাণগড়, এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই।''[৮] আবার ঐতিহাসিক শ্রদ্ধেয় কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামীর নেতৃত্বে ১৯৩৮-১৯৪১ সাল পর্যন্ত বাণগড় খননকার্যের ফলে মৌর্য, শুঙ্গ, পাল, সেনযুগ থেকে শুরু করে মুসলমান অধিকার পর্যন্ত দিনাজপুরসহ বাংলার উত্তরাঞ্চলের সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বের সর্বভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার সঙ্গে

সরাসরি যুক্ত ছিল এখান থেকে তার যথার্থ প্রমাণ পাওয়া যায়।[৯] মোটকথা, মৌর্য যুগ থেকে শুরু করে গুপ্ত, পাল, সেন ও মুসলমান শাসনের প্রারম্ভকাল পর্যন্ত কোটিবর্ষেই শাসনকেন্দ্র ছিল।

ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধে অর্থাৎ ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে তুর্কি সেনাপতির অতর্কিতে নদীয়া আক্রমণ করায় রাজা লক্ষ্মণ সেন নুদীয়া (নদীয়া) থেকে পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বখ্‌তিয়ার খিলজী রাজধানী গৌড় জয় করে ১২০৫ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রা জারি করেন এবং পরবর্তীকালে আরও উত্তরদিকে অভিযান চালিয়ে ১২০৬ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মার্চ বখ্‌তিয়ার দেবকোট দখল করে সেখানে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেন। আর এরই সঙ্গে সঙ্গে দিনাজপুরে সেন শাসনের অবসান ঘটে এবং সেখানে মুসলিম শাসনাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় এই বিষয়ে বলেছেন— ''মুসলমান অধিকারের পর পুরাতন কোটীবর্ষ নগরেই দেবীকোট-দীব্‌কোট-দীত্তকোট নামে নূতন নগরের পত্তন হয়। বখ্‌তিয়ার খিলজীর বিজয় অভিযান নিয়ে মিনহাজ-উদ্দীন সিরাজের লেখা 'তবাকাৎ-ই-নাসিরী' ও ইসামির লেখা 'ফুতুহ-উস্‌-সালাতিন' গ্রন্থ থেকে নানারকম তথ্য পাওয়া যায়। গৌড়দেশ জয় করার পরেই বখ্‌তিয়ার লখনৌতি থেকে দেবকোটে রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন এবং এরপর তিনি তিব্বত অভিযান করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে আবার দেবকোটে ফিরে আসেন এবং তাঁর মৃত্যু হয় ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর মৃত্যুর পর মোহাম্মদ শিরান খিলজী এবং আলীমর্দান খিলজী এই দুই শাসনকর্তা দেবকোটেই রাজত্ব করেন। কিন্তু পরবর্তী শাসনকর্তা সুলতান গিয়াস-উদ্‌-দীন-ই-ওয়াজ খিলজীর শাসনকালের (১২১২-১২২৭) প্রথম দিকেও দেবকোটে রাজত্ব করার পর তিনি রাজধানী লখনৌতিতে স্থানান্তরিত করেছিলেন। এরপর গিয়াস-উদ্‌-দীন্‌-ই-ওয়াজকে দমন করার জন্য ইলতুৎমিস ১২২৫ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করে ব্যর্থ হয় এবং নাসিরউদ্দীন মহামুদের কাছে গিয়াস-উদ্‌-দীন্‌-ই-ওয়াজ পরাজিত ও নিহত হন। তারপর অনেক মুসলমান শাসক লক্ষ্মণাবতীর সিংহাসন দখল করে শাসনকার্য চালাতে থাকেন এবং সে তালিকা বেশ দীর্ঘ। পরবর্তীতে লক্ষ্মণাবতীর শাসক হিসেবে উঠে আসেন আলাউদ্দীন আলি শাহ। তিনি গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী থেকে পাণ্ডুয়ায় তার রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন। তার মৃত্যুর পর এ অঞ্চলের শাসক হন সামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ। ইলিয়াস শাহের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ক্ষুব্ধ হয়ে সুলতান ফিরোজ তুঘলক ১৩৫৪ খ্রিস্টাব্দে বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে বাংলা অভিযান চালালে ইলিয়াস শাহ সন্মুখ যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়ার ফলে ফিরোজ তুললকের বাংলা অভিযান ব্যর্থ হয়। ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তার পুত্র সিকন্দর শাহ এই অঞ্চলের শাসক হয়েছিলেন।

বাংলায় মুসলমান অধিকারের যুগেই অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলার একজন হিন্দুরাজা তার ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তির দ্বারা ইলিয়াস শাহের প্রপৌত্রকে সিংহাসনচ্যুত করে গৌড় ও

বাংলাদেশে হিন্দু রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তিনি গণেশ নামে পরিচয় লাভ করেছিলেন। রাজা গণেশের পরিচয় সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন— ''দরবেশদের নেতা নূর কুৎব্ আলম উত্তর-পূর্ব ভারতের শক্তিশালী নৃপতি জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কির কাছে রাজা গণেশকে সিংহাসনচ্যুত করতে অনুরোধ করলেন। ইব্রাহিম যদুকে মুসলমান করে বাংলার সিংহাসনে বসালেন। যদু সুলতান হয়ে জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ নাম গ্রহণ করলেন এবং এর ফলে মুসলিম প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পরিবর্তন যদিও বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। এই অবস্থার মধ্যে এদিকে রাজ গণেশ যখন নানা দিক দিয়ে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করলেন তখন তিনি পুত্র জালালুদ্দীনকে অপসারিত করে স্বয়ং 'দনুজমর্দনদেব' নাম গ্রহণ করে সিংহাসনে বসেন।''[১০] এই রাজা গণেশ সম্বন্ধে পারসিক ভাষায় লেখা ইতিহাসে কানস্ নাম পাওয়া গেছে। কানস্ সংস্কৃত বা বাংলা ভাষায় গণেশ হতে পারে। 'রিয়াস্-উস-সালাতিন' গ্রন্থে গণেশকে ভাতুরিয়ার জমিদার বলা হয়েছে। ভাতুরিয়া ছিল উত্তরবঙ্গের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল। আবার Buchanan Hamilton তাঁর 'প্রাচ্যভারত' গ্রন্থে দিনাজপুর জেলার বিবরণে গণেশ নাম ব্যবহার করেছেন। তার মতে গণেশ ছিলেন দিনাজপুরের জমিদার। বুকানন তাঁর রচিত 'Account of the District of Zila Dinajpur' গ্রন্থে লিখেছেন— 'Ganes, a Hindu and Hakim of Dynwaj (Perhaps a Petty Hindu chief of Dinajpur), Seized the Government.' অর্থাৎ গণেশ নামে একজন হিন্দু ও দীনওয়াজের হাকিম (সম্ভবতঃ দিনাজপুরের একজন ক্ষুদ্র হিন্দুপ্রধান) শাসন ক্ষমতা দখল করেছিলেন। এই 'Hakim of Dynwaj' কথার সূত্র ধরে অনেকের মনে ধারণা হয় যে এই দিনওয়াজ শব্দ থেকে দিনাজপুর নামের উদ্ভব হয়েছে। ফার্সি পণ্ডিতরা 'দনুজ' শব্দটি 'দিনওয়াজ' রূপে উচ্চারণ করেছিলেন যা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে 'দিনওয়াজ' অর্থাৎ দনুজ > দন-উ-য > দন-ওয়া-য > দিন-ওয়াজ রূপে প্রকাশ পেয়ে থাকে। ইংরেজরা 'দিনওয়াজ' শব্দটিকে বেছে নিয়েছিলেন যার বাংলা 'দিনাজ' তার সঙ্গে পরে 'পুর' যোগ করে 'দিনাজপুর' নামে স্থানটি সকলের কাছে পরিচিতি লাভ করেছিল। আবার অনেকে এই মত জ্ঞাপন করেছেন যে, গৌড়েশ্বর গণেশ যখন সিংহাসনে বসেছিলেন তখন তার সুহৃদ ছিল দীনরাজ ঘোষ এবং রাজা গণেশ খুশি হয়ে তাকে একটি বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড দান করেছিলেন। দীনরাজ ঘোষের নাম অনুসারে এই স্থানের নাম হয় 'দীনরাজপুর' যা স্থানীয় ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে দীনআজপুর পরে তা থেকেই দিনাজপুর হয়েছে। বুকাননের বিবরণের ভিত্তিতে প্রাচীন অবস্থা থেকে দিনাজপুর জেলার নামটি কিভাবে এসেছে সে সম্পর্কেও তাঁর গেজেটিয়ারে বলেছেন— ''Dinajpur is the North eastern quarter of the town where the Maharaja Bahadur of Dinajpur has is residence. The quarter as being originally the

seat of government, has given its name to the town and district. The name itself is probably derived from some former prince of Dinajpur. Dinaj or Dinowaz who has his place there, but it such a prince existed, his memory has been lost.[১১] F. W. strong তাঁর রচিত 'Eastern Bengal District Gazetteers Dinajpur 1912' গ্রন্থে রাজা গণেশ সম্বন্ধে তথ্য দিয়েছেন এই রকমভাবে— 'Dinajpur is said to signify the abode of beggars and is identical with Dynwaj, a Raja of which, ganesh usurped the government of Gour. The name appears orginally to have applied more particularly to the Locality in which the present Rojbari is situated, and a possible explanation of it may be that some forgotten Prince, Dinaj or Dinwaj was the original founder of the Dinajpur family and gave his name to the site.'

কোম্পানী আমলেই নথিপত্র প্রথম দিনাজপুর নামটি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। তবে ভৌগোলিক ভাবে দিনাজপুর মৌজাটি অতি প্রাচীন। ভূতপূর্ব দিনাজপুরের কালেক্টর (১৮৭২) বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ মি. ওয়েষ্ট মেকট্ সর্বপ্রথম দিনাজপুর নাম ও তার উৎস উদ্‌ঘাটন করেন বলে প্রসিদ্ধি আছে।

এরপর বেশ কিছু রাজবংশের উত্থান পতনে ভরা দিনাজপুরের ইতিহাস। শাহী, হাবসী মুসলিম রাজবংশের পর আফগান, মোঘল রাজবংশের কর্তৃত্ব শুরু হয়। সেই সঙ্গে শূর ও করবাণী বংশও সাফল্যের সঙ্গে দিনাজপুর শাসন করেছিল। হোসেন শাহী বংশের অবসান ঘটিয়ে হুমায়ুন গৌড়ের সিংহাসন দখল করেছিলেন ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে। সে সময় গৌড়ের নাম হয় 'জন্নতাবাদ'। ১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দে করবাণী বংশীয় দাউদ করবাণীকে পরাজিত করে তার রাজধানী 'টান্ডা' অধিকার করে আকবরের সেনাপতি মুনিম খাঁ। ষোড়শ শতকের শেষের দিকে দিনাজপুর জেলা আবার মোঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। মোঘল সম্রাট আকবরের সময়কালে (১৫৫৬-১৬০৫) সমগ্র মোঘল সাম্রাজ্য কয়েকটি 'সুবা'য় বিভক্ত ছিল। 'সুবা-ই-বাংলা' তার মধ্যে অন্যতম। ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে মোগল সম্রাট আকবরের সময় তাঁর ভূমি মন্ত্রী টোডরমল বাংলা প্রদেশকে ১৯টি সরকার ও ৬৮২টি পরগণায় বিভক্ত করেন। এর মধ্যে সরকার তাজপুর, সরকার পিঞ্জরা, এবং সরকার ঘোড়াঘাট দিনাজপুর ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সরকার তাজপুর, পিঞ্জরা ও ঘোড়াঘাটের সদর দপ্তরসমূহ বৃহত্তর দিনাজপুরেই অবস্থিত ছিল।[১৩] মোঘল ও নবাবী আমলের প্রথম দিকেও এসব স্থানের যথেষ্ট প্রাধান্য ছিল। দিনাজপুর নামে সে সময় কিছু ছিল না। মোঘল শাসনকালে বাংলা সুবার রাজধানী রাজমহলের পর ঢাকায় চলে যাওয়ার ফলে দিনাজপুরের গুরুত্ব কমে যায়।

বাংলার নবাবী আমলে দেখা যায় এ জেলা মুর্শিদাবাদের অধীনে চলে যায়। মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলার স্বাধীন নবাব হওয়ার পর ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে তিনি রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য বাংলা-সুবাকে আবার নতুন করে ১৩টি চাকলায় বিভক্ত করেন। এর মধ্যে ঘোড়াঘাট চাকলার অধীনে ছিল আদি দিনাজপুর জেলা।[১৪] সেই সঙ্গে মুর্শিদকুলি খাঁ দিনাজপুর রাজবংশের রাজা প্রাণনাথ রায়কে (১৬৮২-১৭২২ খ্রি.) দিনাজপুর অঞ্চলের চাকলাদার নিযুক্ত করেন। এই রাজ পরিবার দীর্ঘদিন দিনাজপুর শাসন করেছেন। ফ্রান্সিস বুকাননের 'দিনাজপুর রিপোর্টে' দিনাজপুরের জমিদারীর বিবরণ পাওয়া যায়। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী মোঘল সম্রাট শাহ আলম এর কাছ থেকে বাংলা-বিহার-ওড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করার ফলে সুবা বাংলার প্রশাসনের দায়িত্বভার কোম্পানীর হাতে চলে যায়। এবং তখন থেকেই দিনাজপুর জেলা ইংরেজের অধীনভুক্ত হয় ও দিনাজপুরের জমিদারিও ব্রিটিশ শাসনাধীনে আসে। এই প্রসঙ্গে মেহ্‌রাব আলী বলেছেন— ''১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানীর সেনাবাহিনী কর্তৃক মুঘল আমলের রাজধানী ঘোড়াঘাট নগর অধিকৃত হয়। তারপরে পরেই বিনাযুদ্ধে অধিকৃত হয় দিনাজপুর জমিদারীও। তখন দিনাজপুরের অধিপতি ছিলেন রাজা বৈদ্যনাথ (১৭৬৩-'৭৯)।''[১৫] সেই সময় দিনাজপুর জমিদারি ১২১টি পরগণা নিয়ে গঠিত ছিল এবং আয়তন ছিল ২১১৯ বর্গমাইল। তখন বৃহত্তর দিনাজপুর জেলা এবং পূর্বে মালদহের কিছু অংশ এর অধীনে ছিল। এরপর বাংলার প্রথম গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসে দেওয়ানী প্রশাসনের কিছু সংস্কার সাধন করেন। তিনি বাংলাকে ১৯টি প্রশাসনিক বিভাগে বিভক্ত করেন। প্রতিটি জেলার জন্য শাসনভার ন্যস্ত করা হয় 'কালেক্টর' নামক একজন ইংরেজ কর্মচারীর অধীনে তথা ভূমি প্রশাসন ও ভূমি রাজস্ব সংক্রান্ত ক্ষমতা নিয়ে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুরের প্রথম কালেক্টর নিযুক্ত হন মি. এইচ. কট্রিল। এইভাবে বাংলায় 'জেলা' নামে প্রশাসনিক ইউনিট প্রথম আত্মপ্রকাশ করে এবং জেলার অধীনে বড় জমিদারীর নাম অনুসারে জেলার নামকরণ করা হয়। মোটকথা ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর জেলা হিসেবে চিহ্নিত হয় এবং এ বছর থেকেই দিনাজপুর জেলায় ইংরেজ শাসনের প্রথম গোড়াপত্তন হয়। এরপর কোম্পানীর বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্তে ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গদেশের জেলার সংখ্যা ২৮এ উন্নীত করে সমগ্র দেশকে বা বেঙ্গল প্রেসিডন্সীকে ৫টি প্রদেশে ভাগ করা হয়। প্রদেশগুলি ছিল কলকাতা প্রদেশ (৬টি জেলা), বর্ধমান প্রদেশ (৪টি জেলা), মুর্শিদাবাদ প্রদেশ (৭টি জেলা), ঢাকা প্রদেশ (৪টি জেলা) এবং দিনাজপুর প্রদেশ (৫টি জেলা)। সদর দপ্তর দিনাজপুর। দিনাজপুর জেলার অধীনে ছিল দিনাজপুর, রংপুর, শিলবর্ষ (বগুড়া), ইদ্রাকপুর (ঘোড়াঘাট) এবং কোচবিহার জেলা। এরপর ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে জেলা সংখ্যা হ্রাস করে অর্থাৎ ২৮ এর স্থলে১৪টিতে নামিয়ে আনা হয়

এবং প্রশাসন, রাজস্ব, পুলিশ, বিচারসহ সর্বময় প্রশাসনিক ব্যবস্থায় দিনাজপুরের কালেক্টর নিযুক্ত হন এইচ. জে. হ্যাচ (১৭৮৬-১৭৯৩। এই সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মেহ্‌রাব আলী বলেছেন— ''১৭৮৬ খৃস্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে জেলা গঠিত হয়। তখন ইহার আয়তন ছিল ৫৩৭৪ বর্গমাইল। প্রথম সূচনা থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে প্রশাসনিক প্রয়োজন ও রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত সুবিধার কারণে এ জেলার সীমারেখা পরিবর্তন হয় অন্ততঃ ৬/৭ বার। ফলে কখনও এর আয়তন হয়েছে বর্ধিত, কখনও হয়েছে খর্বিত ও সংকুচিত, বৃটিশ রাজত্বের শেষপর্বে জেলার আয়তন ছিল ৩৯৪৬ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ছিল ১৩,৩৫,৫৮৮ জন মাত্র।''[১৬] তারপর ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্ণয়ালিশ নবাবের কাছ থেকে নিজামতের সমস্ত ক্ষমতা নিয়েছিলেন এবং সমস্ত ফৌজদারি ও পুলিশি ক্ষমতা জেলা কালেক্টরের হাতে ন্যাস্ত করেন। এই প্রথম আধুনিক জেলাপ্রথা সূচিত হয়। অর্থাৎ তিনিই দিনাজপুর জেলাকে প্রথম আধুনিক জেলা হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। ১৭৯৪-৯৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে দিনাজপুর জেলায় বিবিধ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে গভর্ণর জেনারেল লর্ড মিন্টো হ্যামিলটন বুকাননকে সার্ভেয়ার নিযুক্ত করেন। হ্যামিলটন বুকাননের বিবরণে ১৮০৭-০৮ খ্রিস্টাব্দের দিনাজপুর জেলার একটি সুস্পষ্ট রূপ পাওয়া যায়। ৫৩৭৪ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে ত্রিভুজের মতো এই জেলা ২৪°৪৮´ থেকে ৪৬°১৮´ উত্তর অক্ষরেখার ভেতরে অবস্থিত। পশ্চিমে নাগর ও মহানন্দা নদী পূর্ণিয়া জেলা থেকে এই জেলাকে পৃথক করেছে। দক্ষিণে গিয়েছে পুনর্ভবা নদী যেখানে মহানন্দার সাথে মিশেছে সে পর্যন্ত। পূর্বে রংপুর জেলা থেকে এ জেলাকে পৃথক করেছে করতোয়া নদী। উত্তরদিকে জেলার সীমারেখা তেমন নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত ছিল না। এই জেলা তখন ২২টি ভাগে বিভক্ত ছিল। এই সময় দিনাজপুর জেলাকে ২২টি থানায় বিভক্ত করা হয় এবং সিপাহী বিদ্রোহের আগে পর্যন্ত দিনাজপুর জেলায় ২২টি থানায় অটুট ছিল। কিন্তু ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতবর্ষের শাসনভার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে ব্রিটিশ সরকার অধিগ্রহণ করে। এই সময়ের পর থেকেই দিনাজপুর জেলার ২২টি থানা কখনও সংকোচন কখনও বৃদ্ধি করা হয়।

১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম উইলসন হান্টার দিনাজপুর জেলার পরিসংখ্যান ও বিবরণ সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত হন। মি. হান্টারের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে জেলার আয়তন ছিল ৪০৯৫.১৪ বর্গমাইল। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে লোকগণনা অনুযায়ী লোকসংখ্যা ছিল ১৫, ০১,৯২৪ জন এবং ১৭টি থানার উল্লেখ ছিল।[১৭] ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক এক আদেশ অনুসারে তিনি কয়েকটি জেলাকে নিয়ে একটি করে বিভাগ সৃষ্টি করেন। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে

প্রথম মহকুমা প্রশাসনিক ইউনিট সৃষ্টি করা হয়। সেই সঙ্গে স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন কাঠামোর গ্রামীণ এলাকায় ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে ইউনিয়ন গঠিত হয়েছিল। আবার ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে দেখা যায় শহর এলাকায় গঠিত হয় দিনাজপুর শহরে মিউনিসিপ্যালিটি বা পৌরসভা। তবে উল্লেখ্য যে, তিনি এক আদেশ বলে রাজশাহী, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, বগুড়া ও পাবনা নিয়ে যে রাজশাহী বিভাগ সৃষ্টি করেন তা পরবর্তীকালে সংকুচিত ও বর্ধিত হয়েছিল। জেলা প্রশাসনের সুবিধার জন্য লক্ষ করা যায় যে, দিনাজপুর জেলায় প্রথম কয়েকটি থানাকে নিয়ে একটি মহকুমা গঠন করা হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে ৭ ডিসেম্বর দিনাজপুর সদর মহকুমা গঠিত হয়। জেলার উত্তরাংশে থানাগুলি নিয়ে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে ঠাকুর গাঁও মহকুমা গঠিত হলেও ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দে তা বিলুপ্ত হয় এবং ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় ঠাকুর গাঁও মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হয়। আর দক্ষিণ অংশে থানাগুলি নিয়ে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের ৩১ অক্টোবর বালুরঘাট, গঙ্গারামপুর, পোর্ষা, পত্নীতলা ও ফুলবাড়ী থানার সমন্বয়ে বালুরঘাট মহকুমা গঠন করা হয়। এরপর ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কার্জনের বাংলা বিভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ফলে দিনাজপুর নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে দেখা যায় বঙ্গভঙ্গ রদ-এর ফলে দিনাজপুর আবার আগের জায়গায় ফিরে আসে।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতবাসী রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করে। এর ফলে ভারতবর্ষের ভূখণ্ড ভেঙ্গে গঠিত হয় পৃথক আর একটি নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান। বাংলাদেশ ভেঙ্গে গঠিত হয় পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ। তবে এই পূর্ববঙ্গ পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশ) নামে পরিচিত হলো। এই সময়ে অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার ৩০টি থানা ছিল। দিনাজপুর সদর মহকুমার অধীনে ১২টি থানা— ১) দিনাজপুর, ২) চিরির বন্দর, ৩) পার্বতীপুর, ৪) নাবাবগঞ্জ, ৫) ঘোড়াঘাট, ৬) বিরল, ৭) কুশমণ্ডি, ৮) বংশীহারী, ৯) কালিয়াগঞ্জ, ১০) হেমতাবাদ, ১১) রায়গঞ্জ, ১২) ইটাহার। বালুরঘাট মহকুমার অধীনে ছিল ৮টি থানা— ১) বালুরঘাট, ২) কুমারগঞ্জ, ৩) গঙ্গারামপুর, ৪) তপন, ৫) ফুলবাড়ী, ৬) ধমৈরহাট, ৭) পত্নীতলা, ৮) পোর্ষা। বালুরঘাট মহকুমা দপ্তর স্থাপনের ফলে দেখা যায় পতিরাম থেকে থানা সরিয়ে আনা হায়েছে বালুরঘাটে। ঠাকুর গাঁও মহকুমার অধীনে ১০টি থানা ছিল। যথা— ১) ঠাকুর গাঁও, ২) আটবাড়ি, ৩) বালিয়াডাঙ্গি, ৪) হরিপুর, ৫) রাণীসঙ্কইল, ৬) পীরগঞ্জ, ৭) বোচাগঞ্জ, ৮) বীরগঞ্জ, ৯) কাহারুল, ১০) খানসামা। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করায় স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের সীমানা বিভাজন নীতি অনুসারে অখণ্ড বা বৃহত্তর দিনাজপুর জেলাকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়। ফলে দুটি দিনাজপুরের উদ্ভব হয়— পূর্বদিনাজপুর ও পশ্চিমদিনাজপুর। স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ এই অখণ্ড বা বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার বিভক্তিকরণের

যে সীমারেখা নির্ধারণ করেছেন তা এইরূপ— "The line shall run along the boundary between the following thanas: Haripur and Raiganj; Haripur and Hemtabad; Ranisankail and Hematabad; Piraganj and Hemtabad; Pirganj and Kaliaganj; Bochaganj and Kaliaganj; Biral and Kaliaganj; Biral and Kushmandi; Biral and Gangarampur; Dinajpur and Kumarganj; Chiribandar and Kumarganj; Phulbari and Balurghat.

"it shall terminate at the point where the boundary between Phulbari and Balurghat meets the north south line of the Bengal-Assam Railway in the eastern corner of the thana of Balurghat. The line shall turn down the western edge of the railway lands belonging to that railway and follow that edge unit it meets the boundary between the thanas of Balurghat and Panchbibi.

"From that point the line shall run allong the boundary between the following thanas:-

Balurghat and Panchbibi; Balurghat and Jaypurhat; Balurghat and Dhamairhat; Tapan and Dhamairhat; Tapan and Patnitala; Tapan and Porsha; ..."[১৮] ভারত বিভাজনের পরিণামে দেখা যায় যে, অখণ্ড দিনাজপুর জেলার সাবেক ৩০টি থানার মধ্যে পূর্বাংশ ২০টি থানার সম্পন্ন অংশ এবং হিলির অংশ বিশেষ থানা নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পূর্বদিনাজপুর জেলা গঠিত হয়। তবে উদ্দিষ্ট ২০টি থানা ও হিলির অংশবিশেষ থানাগুলির মধ্য থেকে দিনাজপুর সদর মহকুমার ৬টি থানা দিনাজপুর, চিরির বন্দর, পার্বতীপুর, নবাবগঞ্জ, ঘোড়াঘাট, বিরল ও বালুরঘাট মহকুমার ফুলবাড়ি থানা নিয়ে বর্তমান দিনাজপুর জেলা গঠিত হয় (পূর্ব দিনাজপুর জেলা বর্তমানে দিনাজপুর নামে পরিচিত)। পরে ঠাকুর গাঁ মহকুমাকে আলাদা জেলায় পরিণত করা হয়েছে। এবং পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত পূর্ব দিনাজপুর জেলার সঙ্গে র‍্যাডক্লিফ বোয়েদাদ জলপাইগুড়ি জেলার দেবীগঞ্জ, বোদা, তেতুলিয়া ও পঞ্চগড় থানাগুলিকে দিনাজপুর অর্ন্তভুক্ত করেন। দিনাজপুর জেলার সাবেক পোর্ষা, পত্নীতলা ও ধামৈরহাট থানাগুলি রাজশাহী জেলায় স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। পরে নবগঠিত নওগাঁ জেলাভুক্ত করা হয়েছে। আর পশ্চিমাংশ পূর্বোক্ত ৩০টি থানার অবশিষ্ট ৯টি থানার সম্পন্ন অংশ এবং ১টি অংশবিশেষ থানা নিয়ে ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়। নাম হয় পশ্চিম দিনাজপুর জেলা।

দেশভাগের পর বালুরঘাট, কুমারগঞ্জ, গঙ্গারামপুর ও তপন থানা নিয়ে বালুরঘাট মহকুমা

গঠিত হয়। এরপর ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ৭মে বালুরঘাট মহকুমায় অন্তর্ভুক্ত হল হিলি থানা। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জুলাই রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, হেমতাবাদ, ইটাহার, কুশমণ্ডি ও বংশীহারী থানা নিয়ে গঠিত হয় রায়গঞ্জ মহকুমা। তবে পরে বংশীহারী থানার পশ্চিমাংশ নিয়ে হরিরামপুর থানায় রূপান্তরিত হয়। মোটকথা পশ্চিম অংশ যুক্ত হয় ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সঙ্গে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জুলাই বালুরঘাট ও রায়গঞ্জ মহকুমা নিয়ে যা পশ্চিম দিনাজপুর জেলা নামে পরিচিতি লাভ করে।

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশক্রমে বিহারের পূর্ণিয়া জেলার ৭৩২,৮৮ বর্গমাইল এলাকা ৩৮৫৮ নং বিজ্ঞপ্তি বলে ১লা নভেম্বর তারিখে দার্জিলিং জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয় এবং পরের দিনই অর্থাৎ ২রা নভেম্বর ৩৮৭৫ নং বিজ্ঞপ্তি বলে ঐ অংশ পশ্চিম দিনাজপুর জেলার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। আবার ২০শে মার্চ ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে উপরোক্ত এলাকার যে অংশ মহানন্দা নদীর উত্তরপাড়ে অবস্থিত তাকে দার্জিলিং জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দের ২০শে মার্চ এই নতুন এলাকা নিয়ে ইসলামপুর মহকুমা গঠন করা হয়। তার আগে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি অনুসারে এই মহকুমার চোপড়া, ইসলামপুর, গোয়ালপোখর, করণদিঘি থানা গঠিত হয়ে গেছে। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে গোয়ালপোখর থানার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত হয় চাকুলিয়া থানা। এবং তা পরে ইসলামপুর মহকুমাভুক্ত হয়। পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বর্তমান আয়তন ৫২০৬ বর্গকিলোমিটার। সর্বশেষ থানা সংখ্যা ১৭ এবং মহকুমা ৩টি জেলা সদর বালুরঘাট শহরে অবস্থিত। হিলি থেকে জেলার উত্তর সীমার দূরত্ব ২৭০ কিলোমিটার। অখণ্ড পশ্চিম দিনাজপুর জেলার অক্ষাংশ ২৫°৩৫′৫৫″ এবং ২৬°২৫′১৫″ এর মধ্যে দ্রাঘিমা ৮৯°০′৩″ এবং ৮৭°৪৮′৫৭″ এর মধ্যে অবস্থিত।

এরপর ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের ১লা এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গস্থিত পশ্চিম দিনাজপুর জেলা প্রশাসনিক কারণে পুনরায় দ্বিখণ্ডিত হলো উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর (Ntofification Date and No. 2803. 1992 177-L.R. 6m-7/92) নামে স্বতন্ত্র জেলারূপে। রায়গঞ্জ ও ইসলামপুর এই দুটি মহকুমা নিয়ে গঠিত হয় উত্তর দিনাজপুর জেলা। হেডকোয়াটার রায়গঞ্জ কর্ণজোড়া। ১৭ টি থানার মধ্যে ৯টি থানা পড়ে উত্তর দিনাজপুরের ভাগে। থানাগুলি হল— (১) রায়গঞ্জ (২) কালিয়াগঞ্জ (৩) হেমতাবাদা (৪) ইটাহার (৫) করণদিঘি (৬) গোয়ালপোখর (৭) চাকুলিয়া (৮) ইসলামপুর ও (৯) চোপড়া। মোটকথা ৯টি ব্লক, ৯৯টি গ্রামপঞ্চায়েত ও ১৫৭৭ টি গ্রাম। পৌরসভা হল ৪টি যথা— (১) রায়গঞ্জ, (২) কালিয়াগঞ্জ, (৩) ইসলামপুর ও (৪) ডালখোলা। উত্তর

দিনাজপুর জেলার ভৌগোলিক অবস্থান ২৫°১১′-২৬°৪৯′ উত্তর অক্ষাংশ থেকে এবং ৮৭°৪৯′-৯০°০০′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। জেলার আয়তন ৩১৪২ বর্গ কিলোমিটার। জেলা জনগণনা ২০১১ অনুযায়ী জেলার জনসংখ্যা হল ৩,০০০,৮৪৯ জন। উত্তর দিনাজপুর জেলার পূর্বে বাংলাদেশের ঠাকুর গাঁ ও দিনাজপুর জেলা, পশ্চিমে বিহারের কিষাণগঞ্জ, পূর্ণিয়া ও কাটিহার জেলা, উত্তরে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা এবং দক্ষিণে মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা অবস্থিত।

বালুরঘাট সদর ও গঙ্গারামপুর এই দুটি মহকুমা নিয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা গঠিত হয়। দক্ষিণ দিনজপুর জেলার হেডকোয়াটার বালুরঘাট। গঙ্গারামপুর মহকুমার সদর হল বুনিয়াদপুর।১৭টি থানার মধ্যে ৮টি থানা পড়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ভাগে। থানাগুলি হলো— (১) বালুরঘাট (২) হিলি (৩) কুমারগঞ্জ (৪) গঙ্গারামপুর (৫) তপন (৬) বংশীহারী (৭) কুশমন্ডি ও (৮) হরিরামপুর। মোটকথা ৮টি ব্লক, ৬৫টি গ্রামপঞ্চায়েত ও ২৩১৭টি গ্রাম। পৌরসভা হলো দুইটি। যথা—বালুরঘাট ও গঙ্গারামপুর। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ভৌগোলিক অবস্থান ২৫°১০′৫″ উত্তর অক্ষাংশ থেকে এবং ৮৯°০′৩০″ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। জেলার আয়তন ২,২১৯ বর্গকিলোমিটার। জেলা জনগণনা ২০১১ অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা হল ১৬,৭০,৯৩১ জন। দক্ষিণ দিনাজপুরের পূর্বে বাংলাদেশ, পশ্চিমে মালদহ ও উত্তর দিনাজপুর জেলা, উত্তরে বাংলাদেশ ও উত্তর দিনাজপুর জেলা, দক্ষিণে বাংলাদেশ ও মালদহ জেলা অবস্থিত।

পরিশেষে এ কথা বলা যায় যে, অখণ্ড বা বৃহত্তর দিনাজপুর জেলা পর্যায়ক্রমে নানারকম ভাঙ্গাগড়া ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হতে হতে বর্তমান রূপে এসে দাঁড়িয়েছে। তবে দৃঢ় কণ্ঠে বলা যায় যে, সীমানা দ্বিখণ্ডিত হলেও এই জেলাদ্বয়ের সভ্যতা, কৃষ্টি, লোকসংস্কৃতি, আঞ্চলিক ইতিহাস ও নাট্যচর্চাকে বিভক্ত করা যায়নি। যা আজও এক ও অভিন্ন সত্তারূপে প্রবাহিত হয়ে বিরাজমান।

দিনাজপুরে সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা:

বৃহত্তর বা অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাস অতি প্রাচীন। শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্যের গরিমায় সমৃদ্ধ কোটিবর্ষ, পুণ্ড্রবর্ধন ও বরেন্দ্রী ছিল এই জনপদের অন্তর্ভুক্ত। যতদূর জানা যায় আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি উত্তর বিহার থেকে পূর্বদিকে সংলগ্ন দিনাজপুর জেলায় প্রথম প্রবেশ করে ক্রমান্বয়ে তা সমগ্র বঙ্গদেশে বিস্তার লাভ করে। সেই সূত্রে দিনাজপুর জেলা আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির আগমনের প্রবেশ দ্বার। এই অঞ্চলের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারা খ্রিস্টজন্মের

পূর্ব থেকেই প্রবাহিত হয়েছিল। শুধু তাই নয় বানগড়ের ব্রাহ্মলিপি, গুপ্তযুগের তাম্রশাসন-এর মাধ্যমে আমরা জানতে পারি ভারতের ইতিহাসের গৌরবময় যুগের শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারা দিনাজপুর অঞ্চলকে বিধৌত করে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। তবে পরবর্তীকালে হিউ-এন-সাঙ বঙ্গদেশের বিশেষ করে উত্তরবাংলা পরিভ্রমণের সুবাদে এই অঞ্চলে মিশ্র সংস্কৃতির কথা ব্যক্ত করেছেন।

সাহিত্যে সমসাময়িক কাল, দেশ, মানুষ ও তার সমাজ জীবনের নিজস্ব সমস্যার রূপ বাস্তবোচিতভাবে ফুটে ওঠে। সেই কারণে সৃষ্টিশীল সাহিত্য কখনো উদ্ভুত স্থান বা নির্দিষ্ট জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। এবং সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারও করা যায় না তার গুণাগুণ। তবে স্রষ্টার বিচরণক্ষেত্র এবং নান্দনিক পরিপুষ্টির পরিপার্শ্বিক অবস্থা পাঠকের আন্তরিক কৌতূহলের সামগ্রী। সেই সূত্রে স্রষ্টা বা লেখকের জন্মভূমি তথা জেলার খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে তার সৃষ্টি জগতে। বৃহত্তর বা অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার ইতিহাস ও সভ্যতা খুবই প্রাচীন ও সমৃদ্ধ এবং শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রত্নতত্ত্বের দিক দিয়েও এই জেলা ছিল বিশেষভাবে ঐতিহ্যমণ্ডিত ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাই ড. নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' গ্রন্থে এই বিষয়ে মতামত জ্ঞাপন করে জানিয়েছেন— ''ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি হইতেই গৌড়েজনেরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সচেতন হইতে আরম্ভ করেন; ঈশান বর্মার হড়াহা-লিপি তাহার প্রথম প্রমাণ। তাহার পর হইতেই গৌড় ধীরে ধীরে নিজস্ব জনপদকে আশ্রয় করিয়া স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে যত্নবান হয়, শশাঙ্কে আসিয়া তাহা একটা সুস্পষ্ট রূপ গ্রহণ করে। মালব— স্থানীশ্বর-কনৌজ- উজ্জয়িনী-প্রয়াগ-বানারসীকেন্দ্রীক মধ্য-ভারতীয় রাষ্ট্রীয় প্রভাব হইতে মুক্ত, স্বতন্ত্র রাষ্ট্রই হইয়া উঠিল গৌড়তন্ত্রের রাষ্ট্রাদর্শ। সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এই গৌড়তন্ত্র রূপ লাভ করিল গৌড়ী রীতিতে— সর্বভারতীয়, বৈদর্ভী রীতিকে অস্বীকার করিয়া, তাহার প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন স্বতন্ত্র রীতির উদ্ভবে ও বিকাশে। সন্দেহ নাই, এই উদ্ভব ও বিকাশ ঘটিয়াছিল গৌড়জনের নিজস্ব প্রতিভা, প্রকৃতি, রুচি ও সংস্কার অনুযায়ী এবং ইহাদেরই প্রেরণায়, শুধু বিশিষ্ট জনপদসুলভ অহংকৃত স্বতন্ত্রপ্রিয়তা ও স্বাধিকার প্রমত্ততায় নয়।''[১৯] একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পরে পরেই পূর্ব-ভারতের রাজনৈতিক শক্তির মূল কেন্দ্র রূপে গৌড় রাজ্যের উদ্ভব ছিল এক বৃহত্তর ঐতিহাসিক ঘটনা। শুধু তাই নয়, এই গৌড় রাজ্যের মাধ্যমেই সর্বভারতীয় রাজনীতি, স্বাধীন স্বতন্ত্র রীতিতে সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় বাংলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এই গৌড় রাজ্যের হৃদয় স্থল স্বরূপ মালদা জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশ এবং সংলগ্ন

দিনাজপুর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের সমন্বয় ও সংযোগ থাকার তৎকালীন দিনাজপুরেও সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চা বিশেষ স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল।

আর্যদের সংস্পর্শে আসার ফলে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো দিনাজপুর অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসীরা নিজেদের ভাষা বর্জন করে পুরোপুরিভাবে আর্যভাষা গ্রহণ করেছিল। এবং সেকালে এখান থেকে যে-সব সাহিত্য রচিত হয়েছিল তা প্রধানত সংস্কৃত ভাষাকে অবলম্বন করে সৃষ্টি হয়েছিল। প্রাচীন দিনাজপুর জেলায় দেখা যায় গুপ্ত, পাল ও সেনযুগে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা ছিল। মূলত উচ্চ-শিক্ষা ও বিদ্যাচর্চার প্রসারের ক্ষেত্রে যে সংস্কৃত ভাষার প্রচলন অধিকতর ছিল তা জেলায় প্রাপ্ত তাম্রশাসনগুলি ও চীনদেশীয় পরিব্রাজকদের বিবরণ থেকে জানা যায়। মোটকথা, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর দিকে লক্ষ্য করা যায় যে, দিনাজপুর অঞ্চলে সংস্কৃত সাহিত্য একটি বিশিষ্টরূপ ধারণ করেছিল এবং বাঙালির প্রতিভা সংস্কৃত সাহিত্যে যে একটি অভিনব রচনারীতির প্রবর্তন করেছিল, যা পরবর্তীকালে আলংকারিকদের অভিধায় 'গৌড়ীয় রীতি' নামে আখ্যায়িত হয়। এই প্রসঙ্গে ড. নীহারঞ্জন রায় বলেছেন— ''বাণভট্ট, ভামহ এবং দণ্ডীর সাক্ষ্যে এ তথ্য পরিষ্কার যে, গৌড় জনেরা সপ্তম শতকের আগেই সুস্পষ্ট লক্ষণাক্রান্ত একটি বিশিষ্ট কাব্যরীতি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন এবং এই রীতি সর্বভারত গ্রাহ্য বৈদর্ভী রীতিমানের পাশেই আপন আসন এতটা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল যে, বাণভট্ট, ভামহ বা দণ্ডী কেহই তাহাকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই।''[২০] এই বিশেষ রীতির সাহিত্যচর্চা অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষার চর্চা ও কাব্যরচনা দিনাজপুরে অবিরাম গতিতে ব্যাপ্তি বা প্রসার লাভ করেছিল পাল শাসনকালে। এই সময়কালের অন্যান্য কৃতিসন্তানদের মধ্যে অন্যতম ও বিদগ্ধ পণ্ডিত কবি সন্ধ্যাকর নন্দী ছিলেন দিনাজপুর জেলার ভূমিজ সন্তান এবং সংস্কৃত ভাষার সাহিত্যচর্চা ও গ্রন্থ রচনা করে অমরকীর্তির অধিকারী হয়েছিলেন। রামপালের বিজয়কাহিনীকে কেন্দ্র করে সে যুগের বরেন্দ্রভূমির কবি সন্ধ্যাকর নন্দী কাব্য রচনা করে তৎকালীন অন্ধকারাচ্ছন্ন ইতিহাসের উপর অনেকখানি আলোকপাত করেছেন। তাঁর রচিত কাব্যের নাম 'রামচরিতম্'। এই কাব্যটি ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে তালপাতার পুঁথির আকারে উদ্ধার করেন। কাব্যের মধ্যে চারটি পরিচ্ছেদ লক্ষ্য করা যায় এবং শেষে কবি প্রশস্তি রয়েছে। কবি তাঁর আত্মপরিচয় অংশে জানিয়েছেন—

''বসুধাশিরো বরেন্দ্রীমণ্ডল চূড়ামণিঃ কুলস্থাহনম্।
শ্রী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুর প্রতিবদ্ধঃ পূণ্যভূঃ বৃহদ্বটুঃ।।''

পৃথিবী শ্রেষ্ঠ বরেন্দ্রীমণ্ডলে শ্রীপুণ্ড্রবর্দ্ধনপুর কুলস্থান (পালরাজাদের উদ্ভব স্থান/জনকভূমি) চূড়ামণি

ও বৃহদ্‌বটুর (বটুন) এর পূণ্যভূমি দ্বারা প্রতিবদ্ধ(আবদ্ধ) স্থান। অর্থাৎ কবি সন্ধ্যাকর নন্দী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরের কাছে বৃহদ্বটু নামে পুণ্যভূমিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই বৃহদ্বটু স্থানটি ছিল আদি দিনাজপুর জেলার বটুন গ্রাম।[২১] কবি সন্ধ্যাকরের পরিচয় সম্বন্ধে ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন— ''গ্রন্থের শেষে যে কবি প্রশস্তি আছে তাহা হইতে জানা যায়, সন্ধ্যাকরের পিতার নাম ছিল প্রজাপতি নন্দী, পিতামহের নাম পিনাক নন্দী, এবং জন্মভূমি ছিল বরেন্দ্রান্তর্গত পুণ্ড্রবর্ধনপুরে।... অলংকারপ্রিয়তায়, শ্লেষোক্তিতে এবং কাব্যের অন্যান্য লক্ষণে সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত অষ্টম-নবম-দশম-একাদশ শতকীয়, সংস্কৃত কাব্যের সমগোত্রীয়।''[২২] আবার বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক অরুণকুমার মজুমদার তাঁর 'কৈবর্ত বিদ্রোহ ও কবি সন্ধ্যাকর নন্দী' প্রবন্ধে জানিয়েছেন— এই কাব্যে কবি তাঁর পরিচয়ে নিজেকে পুণ্ড্রবর্দ্ধনপুরের নিকটস্থ বৃহদ্‌বটু গ্রামের লোক হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। ... অর্থাৎ সন্ধ্যাকর নন্দীর বাড়ী তিনি পৌণ্ড্রবর্ধনপুর সংলগ্ন বৃহদ্‌বটু বলেছেন। কুমারগঞ্জ থানার মাদারগঞ্জ হাটের কাছে একটা বটুন মৌজা আছে (জে.এল.নং ২০২)। এই গ্রামে প্রতিবছর একটা চামুণ্ডার মেলা বসে। কাব্যে বর্ণিত একদা শ্রীনদী এই গ্রামের কাছ দিয়েই বয়ে যেত। বর্তমানে এই নদীর আর তেমন ঐশ্বর্য নেই— মজে সংকীর্ণ হয়ে সে 'চিরি' নামে কোনমতে নিজেকে বজায় রেখেছে। এই গ্রামের সঙ্গে সন্ধ্যাকর বর্ণিত বড় বটুনের অভিন্নতা থাকা বিচিত্র নয়— এ মত অনেকে পোষণ করেন। গ্রামটা পুণ্ড্রবর্ধনপুর বা মহাস্থান গড় থেকে খুব বেশী দূরেও নয়।[২৩] তাই একথা বলা যায় যে, কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর জন্মভূমি স্থানটি বর্তমান দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ থানার অধীনে অবস্থিত। আমাদের গর্ব যে তিনি দিনাজপুর জেলার মাটিতে জন্মগ্রহণ করে বাঙালির মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন। মোটকথা, কবি সন্ধ্যাকর নন্দী বরেন্দ্রী বা পুণ্ড্রবর্ধন ভূ-খণ্ডের মধ্যে অর্থাৎ আদি বা বৃহত্তর দিনাজপুরের অন্তর্গত বৃহদ্‌বটুতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কবির এই 'রামচরিত' গ্রন্থটি ছিল দ্ব্যর্থব্যঞ্জক। এক অর্থে শ্রীরামচন্দ্রের কাহিনী অপর অর্থে পালরাজা রামপাল দেবের 'বরেন্দ্রী উদ্ধার কাহিনী' বিবৃত করেছেন। কাব্যটি তিনি গৌড়েশ্বর মদন পালদেবের শাসনপর্বে রচনা করেছিলেন এবং এই সময়কালে আরও অন্যান্যদের সংস্কৃত ভাষায় কাব্যগ্রন্থ রচনার মধ্যদিয়ে সাহিত্যচর্চার ধারাটি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

মধ্যযুগে নানা রাজনৈতিক প্রত্যক্ষ প্রভাব ও বিবর্তনের ধারা বেয়ে বৃহত্তর দিনাজপুরের ভাষা ও সাহিত্য স্বাধীন সত্তায় উত্তীর্ণ হয়ে ক্রমশ বিকাশ লাভ করেছিল। বাংলায় তুর্কি আক্রমণের ফলস্বরূপ দিনাজপুর অঞ্চলে প্রায় দুশো বছর কোন কাব্যগ্রন্থের সন্ধান মেলেনি। তবে এই অঞ্চলের কাব্য সাহিত্যে চৈতন্যপ্রভাব প্রধান্য লাভ করেছিল। তুর্কি বিজয়ের ফলে মুসলমান শাসনামলে

বৃহত্তর দিনাজপুর অঞ্চলে রাজভাষা ফার্সি চর্চার কারণে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য চর্চা অনেকটা সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল। পরবর্তীকালে ইংরেজ শাসন শুরু হলে তা আধুনিক শিক্ষার সংস্পর্শে এসে প্রাচীন ও আধুনিক দুটি ধারায় বিভক্ত হয় অর্থাৎ সংস্কৃত চর্চার প্রাচীন ধারাটি মূলত টোল-চতুষ্পাঠী-শিক্ষা ব্যবস্থা নির্ভর হয় এবং অপরদিকে আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য চর্চার দ্বিতীয় ধারাটি জেলার এই বৃহত্তর অঞ্চলে প্রবাহিত হতে দেখা যায়। এরপর ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত মঙ্গলকাব্যগুলি ছিল দিনাজপুর অঞ্চলের বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব নিদর্শন। উদাহরণ স্বরূপ বলতে গেলে সর্বাগ্রে উঠে আসে 'মনসামঙ্গল' কাব্যের কৃতিধর কবি জগজ্জীবন ঘোষালের নাম। তিনি ছিলেন দিনাজপুর জেলার ভূমিজ সন্তান। কবি জগজ্জীবন ঘোষাল দিনাজপুর জেলার অধীনে কোচ আমোরা (যার অপর নাম কুড়িয়া মোড়া) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর রচিত 'মনসামঙ্গল' কাব্যে আত্মপরিচয় অংশে নিজেকে দিনাজপুরের রাজা প্রাণনাথের সমসাময়িক ছিলেন বলে জানিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে চর্যাপদের কাল থেকে মঙ্গলকাব্যের শেষকাল পর্যন্ত সময়-সীমায় একমাত্র দিনাজপুরের কবিরূপে পরিচয় তিনি নিজেই জ্ঞাপন করেছেন। এই প্রসঙ্গে বাংলা 'মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থে শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন— ''আনুমানিক খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে কবি জগজ্জীবন ঘোষাল মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত কোচ আমোরা বা কুড়িয়া মোড়া গ্রামে জগজ্জীবনের বাসভূমি ছিল। কবি দিনাজপুরের রাজা প্রাণনাথের সমসাময়িক ছিলেন।''[২৪] কবি জগজ্জীবন তাঁর কাব্যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন এভাবে—

''চৌধুরী রূপ রায় সর্বদেশে গুণগায়
জয়ানন্দ দ্বিজের নন্দন।
তারপুত্র ঘনশ্যাম তার পুত্র অনুরাম
বিরচিল জগৎ জীবন।।
ঘোষাল ব্রাহ্মণ রাঢ়ী কোচ আমোরাত বাড়ী
প্রাণনাথ নরপতি দেশে।
বন্দিয়া মনসা পায় জগৎজীবন গায়
পুরাণ সমাপ্ত তার শেষে।।''

আবার কোথাও কবি জগজ্জীবন তাঁর ব্যক্তি পরিচয়ে জানিয়েছেন—

ব্রাহ্মণ ঘোষাল খ্যাতি কুচিয়া মোড়ে বসতি

প্রাণ মহামহী পতির দেশে।

জগতজীবন গায় বন্দিয়া মনসার পায়

কবি দুর্গাচন্দ্র পতির আদেশে।।

উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্যের কবি হিসেবে প্রচারিত ও ততোধিক প্রতিষ্ঠিত জগজ্জীবন ঘোষাল অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার একমাত্র মনসামঙ্গলের কবি। গায়ক কবি জগজ্জীবনের আদি বাসস্থান ছিল অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার 'কুচিয়ামাড়ী' গ্রামে। আশুতোষ ভট্টাচার্যের প্রদত্ত তথ্য অনুসারে জানা যায় যে, তাঁরা (কবি) বর্তমানে গঙ্গারামপুর থানার সীমান্ত অঞ্চলে উদয়পাঁচগা গ্রাম প্রবাসী। ভণিতায় উল্লিখিত 'কবি দুর্গাচন্দ্র পতির আদেশে' বলতে সম্ভবত কবির স্বগ্রাম অধিবাসী কোন কবিয়ালের কথা বলতে চেয়েছেন, যাঁর নির্দেশে তিনি স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত মনসাগীত রচনা করেছেন।[২৫]

মুখ্যত বহু ভাষা, বহু ধর্ম ও নানা সংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের সুসংগঠিত বন্ধনের মধ্য দিয়ে উত্তরবঙ্গের অবিভক্ত দিনাজপুর জেলা সভ্যতা ও সংস্কৃতির সুসমৃদ্ধ ভূখণ্ডে পরিণত হয়েছিল। এর বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে দেখা যায় দিগন্ত প্রসারিত ফসলের মাঠ, অসংখ্য নদী-উপনদী, খাল-বিল, পশু-পাখি, সবুজে ভরা অজস্র গাছপালা, রূপালি বালুচরে ঘেরা নয়ন জুড়ানো মায়াবী রূপ। বর্ষচক্রের আবর্তনে ষড়ঋতুর সঙ্গে তালমিলিয়ে প্রকৃতি সজ্জিত হয় নানা সাজে। এই নিবারণ রূপমাধুর্য এবং সুজলা সুফলা ভূমি জীবনরসে সিক্ত করে তোলে জেলার মাটি ও মানুষকে। আবার এখানকার গ্রামীণ সংস্কৃতিতে লক্ষ্য করা যায় শ্রমনির্ভর জীবন ধারা। তাই স্বাভাবিকভাবে এই জীবনরসের টান তাদের (অধিবাসীদের) নাট্যরস-রসিক করে তোলে। দিনাজপুর জেলার সংস্কৃতির সিংহভাগ জুড়ে কবিগান, যাত্রাগান (কৃষ্ণযাত্রা), কথকতা, পাঁচালী গান প্রভৃতি জেলার সুজলামাটির রসসিক্ত লোকজগান। সেই সঙ্গে অবিভক্ত দিনাজপুরের (সাদিপুরের) 'রামবনবাস' পালায় গাইনের (হাকারের) বন্দনা গানে প্রকৃতপক্ষে লোকনাট্যের যথার্থ চরিত্রটি ফুটে উঠেছে। আবার এই অঞ্চলের 'গায়ের গারাম' এবং 'দশ ভাইর চরণ' নাট্যপালা দুটি লোকনাট্যের আঙ্গিকধর্মকে ধ্রুপদী মাত্রা দিয়েছে। এছাড়াও এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত 'হালুয়া-হালুয়ানি' ব্রতকেন্দ্রিক নাট্যপলার একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। 'বন্ধুপুছা' বা 'পুন্ধুআলা' অপর আর একটি নাট্যপালায় মানবপ্রীতির ভাবধারা বর্তমান। এই জেলার বিভিন্ন প্রান্তে সুমিতাযোগী, 'মায়াবন্ধকী', 'নয়ানশোরী', 'মোচ্ছব', 'বর্মোশোরী বা (ব্রহ্মশ্বরী), 'ঢাকোসরী' বা 'ঢাকোশোরী' ও 'সংসার গোষ্ঠীর' প্রভৃতি নাটপালা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল এবং এই নাটপালাগুলি অভিনয়ের মধ্য দিয়ে সর্ব্বোচ্চ লোকরঞ্জক পালা হিসেবে সুনাম অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিল।

বাংলার শহুরে সংস্কৃতির ধারায় লক্ষ্য করা যায় যে, প্রসেনিয়াম ভিত্তিক নাট্যচর্চা, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও পুরাতনীগান ছিল অন্যতম মাধ্যম। বিশেষ করে প্রসেনিয়াম ভিত্তিক নাট্যচর্চাতে দিনাজপুর জেলা ছিল স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। একথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় যে, ভাষা ও সংস্কৃতি মানুষের মূলবন্ধন-আত্মপরিচয়ের প্রাথমিক শর্ত। বাঙালি জাতির পরিচয় তার ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যেই নিহিত। সেই ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চার মূলধারায় জেলা ও অঞ্চলভিত্তিক কিছু স্বতন্ত্র ধারা এসে মিশে যায়, তাকে পরিপুষ্ট করে। এর ফলে মূলধারাই সমৃদ্ধ হয়। তাই বৃহত্তর বা অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার মফস্বল কেন্দ্রিক নাট্যচর্চার ধারা ঠিক তেমনিভাবে বাংলা নাট্যচর্চার মূলধারায় (প্রসেনিয়াম ভিত্তিক নাট্যচর্চা) যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল ও সমৃদ্ধ করে তুলেছিল।

আমরা জানি যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির আগমনে আধুনিক থিয়েটারের যে ধারার সূচনা বাংলায় হয়েছিল, সেই ধারা অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার উপর স্বাভাবিকভাবেই প্রভাব বিস্তার করেছিল। অর্থাৎ ইংরেজরা যখন এদেশ (বাংলাদেশ) অধিকার করে তখন তাদের শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারা বেয়ে আধুনিক বিনোদনের দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রসেনিয়াম থিয়েটারের আমদানী হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে ইংরেজ সাহেবরা কলকাতায় বাণিজ্য প্রসার ও শাসন ক্ষমতা দখল করে নিজেদের আমোদ-প্রমোদের জন্য 'ওল্ড প্লে হাউস' (১৭৫৩ খ্রি:) থিয়েটার হল খুলে নাট্যাভিনয় শুরু করলেন। এই ধারা বেয়ে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে উনিশ শতকের প্রায় শেষ পর্যন্ত অনেকগুলি রঙ্গালয় গড়ে উঠেছিল, যার মঞ্চব্যবস্থা থেকে আঙ্গিকগত সবকিছুই ছিল বিদেশী। বাঙালিদের কিছু ধনী জমিদার ও বেনিয়া ছাড়া বৃহত্তর অংশ বিদেশী থিয়েটার থেকে দূরে সরে নিজেদের লোকজ সংস্কৃতি— যাত্রা, পাঁচালী, কবিগান, ঢপ, কীর্তন কথকতা, তর্জা, ঝুমুর প্রভৃতি বিনোদনের রসাস্বাদনে মগ্ন ছিলেন। বাঙালি নাট্যশালা ও বাংলা ভাষায় নাটকাভিনয় তখনও শুরু হয়নি। এই অবস্থায় বাংলার নাট্যক্ষেত্রে হেরাসিম স্টেপনোভিচ লেবেডেফ আবির্ভূত হয়ে ইংরেজ নাট্যশালার দূরবস্থা দেখে কলকাতার চীনা বাজারের কাছে ২৫ নং ডোমতলা লেনে বেঙ্গলী থিয়েটার (১৭৯৫ খ্রি:) স্থাপন করে নাট্যাভিনয়ের প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত এই মঞ্চে লেবেডেফ প্রথম বাংলা ভাষায় নাট্যাভিনয় করে বাংলাদেশের নাট্যমঞ্চ ও বাংলা নাট্যাভিনয়ের পথ-প্রদর্শক ও প্রেরণার উৎস হয়ে রইলেন। তাঁর প্রদর্শিত নাট্যভিনয়ের ধারা বেয়ে বাংলার বিভিন্ন স্থানে থিয়েটার ভিত্তিক নাট্যচর্চা অবিরাম গতিতে শুরু হয়। এই থিয়েটার ভিত্তিক নাট্যচর্চার ধারা অবিভক্ত দিনাজপুরকে প্রভাবিত করে আন্দোলিত করে তুলেছিল।

এই দিনাজপুর শহরে প্রসেনিয়ামমূলক ইউরোপীয় ধরনের নাট্যচর্চার সূচনা ঊনবিংশ

শতকের প্রথমার্ধে। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের কেন্দ্র কলকাতা থেকে এই জেলাতে ইউরোপীয় সামাজিক সংস্কৃতি প্রথমে পৌঁছেছিল কোম্পানীর ব্রিটিশ অফিসারদের মাধ্যমে। এলাকার অর্থনৈতিক কর্তৃত্বকারী জমিদার শ্রেণী স্থানীয় ব্রিটিশ প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিবিড়ভাবে ঘনিষ্ট হওয়ায় তাঁদের উপর ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রভাব পড়ে সর্বাগ্রে।

উনিশ শতকের তিন-এর দশক থেকেই লক্ষ্য করা যায় যে, বিদেশি থিয়েটারের অনুকরণে ধনী ও অভিজাত বাঙালি বিশেষত জমিদাররা নিজেদের প্রাসাদে মঞ্চ নির্মাণ করে নাট্যাভিনয় শুরু করেছিলেন। যেহেতু সেই সময়কালে বাংলায় প্রসেনিয়ামভিত্তিক নাট্যচর্চার প্রাণকেন্দ্র ছিল কলকাতা, তাই কলকাতার ইংরেজ সাহেবদের প্রতিষ্ঠিত ইংরেজি প্রসেনিয়াম থিয়েটারের অভিনয় দেখে আকৃষ্ট হয় বাঙালিরা। এছাড়াও তৎকালীন স্কুল কলেজে ইংরেজি নাটকের পাঠ ও অভিনয়ে অংশগ্রহণ এবং অভিনয় দেখার মধ্য দিয়ে নব্য শিক্ষিত তরুণ বাঙালিরা ইংরেজি থিয়েটার ও নাটকের প্রতি মনোনিবেশ করে। অর্থাৎ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালির ইংরেজি নাটক পড়ে, থিয়েটারের প্রতি উৎসাহ জন্মায় ঠিক তেমনিভাবে তৎকালে প্রচলিত যাত্রাগানের বিকৃত রূপ দেখে ঘৃণা ও বিরক্তবোধও করেছিল। তাই একথা বলা যায় যে, বাংলাদেশে প্রচলিত লোকনাট্য যাত্রা থেকে বিরত হয়ে বিদেশী থিয়েটার থেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে বাঙালি রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ এবং থিয়েটারে নাট্যাভিনয়ে উৎসাহিত হয়েছিল। বিশেষ করে কলকাতার অভিজাত ধনী বাঙালিরাই এই বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন।

মোটকথা, তৎকালীন ধনী বাঙালির শখ-শৌখিনতার মধ্য দিয়ে নিজস্ব উদ্যোগে অভিনয় শুরু হয়েছিল। এই ধরার প্রথম প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর। তিনি নারিকেল ডাঙ্গার বাগানবাড়িতে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে ২৮ ডিসেম্বর 'হিন্দু থিয়েটার'-এর দ্বারোদ্ঘাটন করে নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই রঙ্গমঞ্চ ছিল বাঙালি প্রতিষ্ঠিত প্রথম রঙ্গমঞ্চ। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের এক বৎসর পর শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসু ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বসতবাড়িতে (বর্তমানে শ্যামবাজারের ট্রাম ডিপো অবস্থিত) বিলিতি কায়দায় যে রঙ্গমঞ্চটি স্থাপন করেন, তাতেই দেখা যায় সর্বপ্রথম বাঙালির দ্বারা বাংলা নাটক বাংলা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল।

নবীনচন্দ্র বসুর পর নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক পরিচালিত একটি শখের নাট্যশালায় বেশ সাফল্যের সঙ্গে কিছু নাটকের অভিনয় হয়েছিল। অর্থাৎ রাজা, মহারাজা, জমিদার, সম্ভ্রান্ত ধনী গৃহস্থরা এককভাবে রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করে এই নাট্য-আন্দোলনের ধারাকে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জীয়ন্ত করে রেখেছিলেন। ধনাঢ্য বাঙালিদের বিশেষত রাজা, মহারাজা ও জমিদার শ্রেণির দ্বারা

সখ-সৌখিনতার মধ্য দিয়ে নিজস্ব রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করে স্বাধীন চিন্তা-ভাবনা ও খেয়ালখুশি মাফিক নাট্যাভিনয়ের ধারা সমগ্র বাংলার বুকে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তার প্রবল ভাবাবেগ অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার রাজবাড়িকে নাট্যচর্চার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে তুলতে দেখা গিয়েছিল।

কলকাতার বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু থিয়েটার গড়ে ওঠে শৌখিন প্রচেষ্টায়। এর প্রভাব পড়ে অনেক মফঃস্বল শহরেও। তাই উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের দিকে যে সব জেলা-শহরে নাট্যাভিনয়ের উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়, তার ধারা উনিশ শতকের শেষ লগ্নে দিনাজপুর জেলাতেও যথেষ্ঠ প্রভাব ফেলেছিল। দিনাজপুর জেলার মহারাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সক্রিয় সহযোগিতায় দেখা যায় যে, সবেমাত্র আধুনিক বিনোদনের আগমনের পূর্বে দিনাজপুর সদর তথা শহরের উত্তর-পূর্ব উপকণ্ঠে অবস্থিত দিনাজপুর রাজবাড়ি ছিল একমাত্র বিনোদন কেন্দ্র। এই রাজবাড়িতে দিনরাত রাজকীয় ঠাটে আনন্দ উৎসব চলত অর্থাৎ বিভিন্ন পূজা-পার্বণ, তিথিপর্ব বিশেষ করে বিবাহ উপলক্ষে সামন্তিক ঠাটে মহাসমারোহে উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হত। এই উৎসব-অনুষ্ঠানের প্রধান বিনোদন ছিল কবিগান, যাত্রাগান ও নটঙ্গীর নাচ বা বাঈজী নৃত্য। কিন্তু রাজবাড়ির এই মহোৎসবে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না, একমাত্র আমন্ত্রিত বিশেষ ব্যক্তিরাই সেই বিনোদন উপভোগ করতে পেরেছিলেন। দিনাজপুরের রাজাদের আয়োজিত রাজকীয় সামন্তিক ঠাটে উৎসব-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি যুগোপযোগী ও সংস্কৃতিমনস্ক বিনোদনের রসাস্বাদনে সর্বাগ্রে এগিয়ে এসেছিলেন মহারাজা গিরিজানাথ রায়। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে মহারাজা গিরিজানাথ রায় দিনাজপুর জেলার দায়িত্বভার লাভ করেন এবং তিনি ছিলেন শিল্পমোদী নাট্যপ্রাণ, সংগীতপ্রিয় ও উদার পৃষ্ঠপোষক। তাই লক্ষ্য করা যে, ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর যখন 'জয়দ্রথ' নামে একটি নাটক দিনাজপুর শহরে প্রথম অভিনীত হয় ক্ষেত্রীপাড়া মৌজায় অবস্থিত রথের মাঠে— অস্থায়ী মঞ্চে এবং এই নাটকটিকে কেন্দ্র করে দিনাজপুরে শহরে নাট্যাভিনয়ের সূত্রপাত হয়, তখন দিনাজপুরের মহারাজা গিরিজানাথ রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় 'কোহিনুর থিয়েটার' (১৮৭৯ খ্রি.) নামে সৌখিন নাট্যসংস্থা রাজবাড়িতে স্থাপিত হয়। এই কোহিনুর মঞ্চের নাট্যাভিনয় মূলত রাজকীয় ঠাটে ভরপুর ছিল। আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তৎকালীন বিনোদনের মূল ছিল কেবলমাত্র রাজবাড়ির অধিবাসীদেরই উপভোগ্য সম্পদ। তাই এই নাট্য সংস্থায় সাধারণ মানুষের প্রবেশের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তারপর দিনাজপুর জেলায় বিত্তবানদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তায় সৌখিন নাট্যচর্চার দৃষ্টান্তস্বরূপ ভূপালপুরের একটি প্রাইভেট থিয়েটারের উদ্ভব হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব কুমার রায় জানিয়েছেন— ''কলকাতার মত বিত্তবানদের আঙিনায় প্রাইভেট্ থিয়েটারও ছিল। অন্ততঃ দুটির উল্লেখ তো করাই

যায় এই প্রাইভেট থিয়েটারের নিদর্শন স্বরূপ। দিনাজপুরের রাজবাড়িতে কোহিনুর থিয়েটার এবং ভূপালপুরে ভূপাল চৌধুরীর বাড়ির থিয়েটার।"[২৬]

দিনাজপুরের প্রথম সংবাদ ও সাহিত্য পত্র মাসিক 'দিনাজপুর পত্রিকা'র (১৮৮৫ খ্রি. প্রকাশিত) সূত্রে জানা যায় যে, উক্ত নাট্যাভিনয়ের পর জনপ্রিয় ও মঞ্চসফল নাটকটির নাম ছিল 'হরিশ্চন্দ্র' এবং এই নাট্যাভিনয়ের প্রথম ও প্রধান উদ্যোক্তা ও অভিনেতা ছিলেন দিনাজপুর জেলার নাট্যাভিনয়ের জনক ও অগ্রদূত শিল্পী হরিচরণ সেন। দিনাজপুর শহরে নাটক নিয়ে দ্বিতীয় সংগঠিত উদ্যোগ ছিল 'ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটার কোম্পানী'। তবে এই নাট্যসংস্থাও দিনাজপুরের সাধারণ জনগণের ইচ্ছা ও অভিব্যক্তি হিসাবে গড়ে ওঠেনি। ব্রিটিশ শাসনে রাজা-জমিদারকুলের রাজভক্তির এক প্রদর্শন হিসাবে এবং জেলা প্রশাসনের উচ্চ মহলের ইংরেজ সাহেবদের পরোক্ষ নির্দেশে এক সাময়িক উদ্দেশ্য সাধনে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে সৃষ্টি হয়েছিল দিনাজপুরের দ্বিতীয় নাট্যসংস্থা 'ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটার কোম্পানী'। অর্থাৎ ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ ছিল মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালের হীরক জয়ন্তী উৎসব বর্ষ। এই বর্ষপূর্তিকে স্মরণীয় করে রাখতে নবগঠিত নাট্য সংস্থাটির নাম রাখা হয় 'ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটার কোম্পানী'। মূলত সৌখিন নাট্যসংস্থা রূপে থিয়েটার কোম্পানীর আত্মপ্রকাশ ঘটে। কিন্তু সংস্থাটি খুব নিয়মিত না হলেও একেবারে অনিয়মিত ছিল না। থিয়েটার কোম্পানীর নাট্যাভিনয়গুলিও দিনাজপুর শহরে স্থায়ী নাট্যশালা নির্মিত না হওয়া পর্যন্ত রথের মাঠে অস্থায়ীভাবে নির্মিত মঞ্চে অভিনীত হতো। কালীতলা মহল্লায় সেন বংশীয় জমিদার ঘরের সন্তান হরিচরণ সেনই ছিলেন দিনাজপুরের নাট্য আন্দোলনের অগ্রদূত, আদি নাট্যশিল্পী, নাট্যসংগঠক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার।

প্রকৃতপক্ষে নাটকের ক্ষেত্রে রাজা-জমিদারদের আর্থিক আনুকূল্য আরও কিছুকাল দিনাজপুর শহরে অব্যাহত থাকার কালেই শহরের প্রকৃত নাট্যামোদী ও অভিনেতারা সক্রিয় উদ্যোগ নিতে শুরু করেন একটি স্থায়ী মঞ্চ প্রতিষ্ঠার জন্য। এর ফলে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুরের ক্ষেত্রীপাড়ায় 'ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটার হল' নামে এক স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ নির্মিত হয় এবং দিনাজপুর 'ডায়মণ্ড জুবিলী ড্রামাটিক ক্লাবে'র অবলুপ্তির ফলে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয় 'দিনাজপুর নাট্যসমিতি'। ২১শে জুন ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে জেলা কালেক্টর মি. হারউড এই হলের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দিনাজপুরের মহারাজা গিরিজানাথ সহ শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও উপস্থিত ছিলেন। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাট্যাভিনয় দিয়ে দিনাজপুর নাট্যসমিতির যাত্রা শুরু হয়।

দিনাজপুর শহরে রঙ্গালয় শুরুর পর্বে দুই মহকুমা যথা ঠাকুর গাঁ ও বালুরঘাটের নাটকের

জগতের সূচনা রাজা-জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতার থেকে বরং ব্রিটিশ সরকারের আমলা কুলের উদ্যোগে ও সহযোগিতার দ্বারা শুরু হয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় সংস্থার প্রতিষ্ঠা এবং প্রথমদিকের কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে। ঠাকুর গাঁ মহকুমায় প্রসেনিয়াম ভিত্তিক নাট্যচর্চার জন্ম হয় ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে (মতান্তরে ১৯১১ খ্রি:) ব্রিটিশ তথা ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে নির্মিত 'জর্জ' করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব'কে কেন্দ্র করে। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে ১০ই ফেব্রুয়ারি গিরিশ ঘোষের 'জনা' নাটক দিয়ে শুরু হয়েছিল এই প্রতিষ্ঠানের নাটক মঞ্চস্থ করা। সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে স্থায়ী থিয়েটার হল নির্মাণ হয় সম্রাট পঞ্চম জর্জের স্বর্গীয় পিতা সপ্তম এডওয়ার্ডের স্মরণে এবং নব নির্মিত হলটির নামকরণ হয় 'এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল হল'। এই নাট্যচর্চার সূত্র ধরেই বালুরঘাট মহকুমায় ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম নাট্যসংস্থা 'বালুরঘাট থ্রিয়েটিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন' গঠিত হয়েছিল। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে সংস্থাটির নাম 'দা এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল ড্রামাটিক ক্লাব' করা হয় এবং ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই নাম বজায় ছিল। এরপর ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট বৃটিশ রাজত্বের অবসানের ফলে ভারতের স্বাধীনতা লাভ হয় এবং নাট্যশালার নতুন সংবিধান অনুসারে পূর্বনাম বাদ দিয়ে 'বালুরঘাট নাট্যমন্দির' নাম রাখা হয়। মোটকথা, জেলার তিনটি প্রশাসনিক কেন্দ্রের নাট্যসংস্থার সূচনা হয়েছিল ভারতের ব্রিটিশ সম্রাট বা সম্রাজ্ঞীদের তথা ইংল্যণ্ডের রাজা-রাণীদের সিংহাসনে আরোহন বা অবরোহনের কোনো বিশেষ বর্ষপূর্তিকে শিরোপা করে।

পরিশেষে এ কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় যে, পাশ্চাত্য ধারার অনুকরণে প্রসেনিয়াম ভিত্তিক নাট্যচর্চার ফলস্বরূপ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কলকাতায় যখন নাট্যাভিনয় শুরু হয় তখন ক্রমে ক্রমে জেলা শহরগুলিও বিশেষ করে অবিভক্ত দিনাজপুর জেলাও তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে দিনাজপুর সদর, দুই মহকুমা শহর, বিভিন্ন গ্রামে অথবা জমিদার বাড়িতে অস্থায়ী মঞ্চ নির্মাণ করে শুরু হয়েছিল নাট্যাভিনয় চর্চা। কলকাতায় যখন ক্লাসিক থিয়েটারের স্বর্ণযুগ চলছিল তখন দিনাজপুরে নাট্যাভিনয়ের সবেমাত্র যাত্রা শুরু হয়েছিল সম্পূর্ণভাবে এ্যামেচার শিল্পীদের দ্বারা। বস্তুত দিনাজপুরে নাট্যাভিনয়ের সূত্রপাত হয় নাট্যজ্ঞানহীন ও অভিনয়ে অভিজ্ঞতাহীন শিল্পীদের মাধ্যমে। মোটকথা যাত্রা-ঢঙের শিল্পী হয়েও দেশীয় বিনোদনের জড়তা ও একঘেয়েমির পাশ কেটে তাদের মধ্যে নাট্যাভিনয় করার একটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা ও শিল্পী হওয়ার প্রচণ্ড উচ্চাকাঙ্খা ছিল প্রবল। এর ফলে দিনাজপুর জেলায় নাট্যাভিনয় তথা নাট্যচর্চায় অন্যান্য স্থানের তুলনায় যথেষ্ট অগ্রগতি লক্ষ করা যায়। বৃহত্তর বা অবিভক্ত দিনাজপুর জেলায় নাট্যাভিনয়ের শুরুর পর্বে এমন মানসিক প্রবণতা ছিল বলেই এ জেলায় নাট্যচর্চার প্রসার লাভ করেছিল এবং ক্রমান্বয়ে গড়ে উঠেছিল স্থায়ী নাট্যশালা, নিয়মিত নাট্যগোষ্ঠী ও আগ্রহী, উৎসাহী, নাট্যামোদী জনসাধারণ তথা মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত দর্শককুলও।

প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে দিনাজপুর জেলার নাট্যচর্চার অবস্থান (বৃহত্তর বা অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার নাট্যচর্চা ১৮৭৯-১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ)

''দিনাজপুরের মাটি, নাট্যবোধে খাঁটি।''

— প্রবাদ

আবার—

''চাল চিড়া গুড়
নাটকে ভরপুর
এই নিয়ে দিনাজপুর।''

বৃহত্তর বা অবিভক্ত দিনাজপুর জেলাকে নিয়ে রচিত এই প্রবাদটি কোথাও এইরূপে—

''নাটকে ভরপুর
চট চিনি পাট গুড়
এরই নাম দিনাজপুর।''

— প্রবাদ

মোটের উপর একথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায়, চাল-চিনি-গুড়ের সঙ্গে বৃহত্তর বা অবজিভক্ত দিনাজপুর জেলার খ্যাতি ছিল নাটকেও। তাই দিনাজপুর জেলার নাটককে কেন্দ্র করে রচিত যে প্রবাদগুলি পাওয়া যায় তাকে আশ্রয় করে স্বাভাবিক ভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, দিনাজপুরে সুদূর অতীতকাল থেকে নাট্যচর্চার যে প্রবহমান ধারা বিরাজ করছিল, সেই ঐতিহ্যমণ্ডিত নাট্যচর্চার ধারা আজও বর্তমান। তাই বৃহত্তর বা অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার নাট্যচর্চার ধারা ভিন্ন কোন ঘটনা নয়, বরং ঐতিহাসিক সম্পর্কে বাংলা নাট্য সাহিত্যধারার সঙ্গে একই সূত্রে অবিচ্ছিন্ন ও গ্রথিত। সমগ্র বাংলার প্রেক্ষিতে প্রত্যন্ত অঞ্চল (মফস্বল) বৃহত্তর তথা অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার নাট্যচর্চা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলার নাট্যচর্চার মূল প্রাণকেন্দ্র কলকাতা কিন্তু একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, কোন প্রাণকেন্দ্র কখনই এককভাবে সক্রিয় থাকতে পারে না। কেন্দ্রের অস্তিত্ব স্বীকার করলে তার পশ্চাৎ প্রদেশের অর্থাৎ প্রত্যন্ত মফস্বল অঞ্চলের অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী রূপে স্বীকৃত হয়। এই পশ্চাৎ প্রদেশের বা প্রত্যন্ত অঞ্চলের সরবরাহের উপরই নির্ভর করে কেন্দ্রের সমৃদ্ধি। তাই কেন্দ্র ও পশ্চাৎ প্রদেশের (প্রত্যন্ত অঞ্চল) মধ্যে কোনটি গৌণ কিংবা মূখ্য তা বিচার্য বিষয় নয়। একটি ছাড়া অন্যটি অস্তিত্ব বিহীন হয়ে পড়তে বাধ্য। এই কারণেই সমগ্র বাংলার নাট্যচর্চার গতি প্রকৃতি নির্ধারণের জন্য কেবল কলকাতা শহর নয়, বরং অন্যান্য জেলা শহরের নাট্যচর্চার উপর আলোকপাত ভীষণভাবে প্রয়োজন ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব ও নাট্যকর্মী শ্রদ্ধেয় কুমার রায় যথার্থ

বলেছেন— ''আমাদের সংস্কৃতির মূলকেন্দ্র কলকাতা। ... সেই সঙ্গে কলকাতাকে অস্বীকার না করেও যে নাট্যধারা মফস্বল বাংলায় প্রাণ পেয়েছে তারও স্বীকৃতি প্রয়োজন। অনুসন্ধান প্রয়োজন। ... কলকাতার থিয়েটারের সব লক্ষণগুলি নিয়েই, বিবর্ত্তনের সব চড়াই উৎরাই বেয়েই এ থিয়েটারগুলি চলে এসেছে। স্বীকার করি, কলকাতার পাবলিক থিয়েটারে যে বইগুলি হ'ত তা এ মঞ্চগুলিতেও হত, স্বীকার করি, সেই সব নাটককেই অবলম্বন করে এখানকার নাট্যানুশীলন অব্যাহত ছিল। স্বীকার করি ওখানকার গ্রামের মানুষ, তার সংস্কৃতির প্রকাশস্থল এগুলি ছিল না। কিন্তু এই নাট্যশিল্পের প্রতি ঐকান্তিককতার অভাব ঘটেনি। সেই ঐকান্তিকতাই দিনাজপুরকে দিয়েছে একেরপর এক অভিনেতার দল। একটা বিশেষ যুগেই তা ফুরিয়ে যায়নি। একটা ধারা বিবর্তিত হয়েছে। ... এটা সম্ভব হয়েছে থিয়েটার কেবলমাত্র কলকাতার অনুকরণ করে বাঁচবার চেষ্টা করেনি বা বেঁচে থাকতে চায়নি কেবলমাত্র সখ মেটাবার জন্য। যদি নাট্যশিল্পকে এই থিয়েটারগুলি চর্চার ক্ষেত্র করে না তুলতেন তা হলে এ ধারা অব্যাহত থাকত না বলেই বিশ্বাস।''[২৭] মোটকথা কলকাতার নাট্যচর্চার সব লক্ষণগুলি নিয়ে ও সেই সঙ্গে বিবর্তনের মধ্যদিয়ে এই নাট্যচর্চার গতি প্রবহমান ধারা বেয়ে চলে এসেছে অবিভক্ত দিনাজপুর জেলায়। অর্থাৎ বাঙালীর যে নাট্যঐতিহ্য ধারা সুদূর অতীতকাল থেকে প্রবাহিত হয়েছিল তার ধারক ও বাহকরূপে প্রকৃতই যোগ্য ও অসামান্য উত্তরসূরী ছিল দিনাজপুর জেলা। এই বিষয়ে জেলার বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক গোপাল লাহা বলেছেন— ''বাঙালীর সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে জানতে হলে বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য ও নিজস্বতায় অভিনব তার জেলাগুলিকে ভালো করে জানতে হবে। বাঙালী যে আত্মানুসন্ধান শুরু করেছে, সে অনুসন্ধান কাজে জেলাকে বিশেষ করে জানার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।''[২৮] বাংলার ঐতিহ্যমণ্ডিত নাট্যচর্চায় সমৃদ্ধ জেলা ছিল অখণ্ড দিনাজপুর জেলা। তাই সমগ্র বাংলার ঐতিহ্যমণ্ডিত নাট্যচর্চার পরিপ্রেক্ষিতে বৃহত্তর বা অখণ্ড দিনাজপুর জেলার নাট্যচর্চার ধারাকে গভীরভাবে অনুসন্ধানমূলক দৃষ্টি ও প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের দ্বারা বিশ্লেষণ করার মধ্যদিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, সুদূর অতীতকালে নানারকম প্রতিকূলতার বাতাবরণ অতিক্রম করে নাটকের ঐতিহ্যের বীজ বপন করে দিনাজপুর জেলা বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুণে সমৃদ্ধ হয়ে নজির বিহীন অবদান সৃষ্টি করেছিল এবং তার ফলে বাংলা নাট্যজগতে চিরস্থায়ী আসন অলংকৃত করতে সমর্থ হয়েছিল, তা বিশেষভাবে আমাদের জানা প্রয়োজন ও তার সামগ্রিক মূল্যায়ন একান্ত প্রয়োজন।

বৃহত্তর বা অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার নাট্যচর্চার আলোচনা করবার শুরুতেই একথা অবশ্যই প্রাসঙ্গিক যে, লোকনাট্যচর্চা বাদ দিয়ে মূলত অবিভক্ত দিনাজপুর জেলায় প্রবাহিত প্রসেনিয়ামমূলক

নাট্যচর্চার (নাট্যরচনা ও নাট্যাভিনয়) ধারা শুরু থেকে কিরূপ অবস্থান ও গতি প্রকৃতির মধ্যদিয়ে অতিবাহিত হয়েছিল এবং সে ধারার দ্বারা প্রবাহিত হয়ে প্রসেনিয়ামূলক নাট্যচর্চা আজও সার্থক ও ঐতিহ্যমণ্ডিতরূপে দিনাজপুরে বিরাজমান। জেলার সেই প্রবহমান নাট্যচর্চার ধারায় অবস্থান ও গতিপ্রকৃতি তুলে ধরা বিশেষ প্রয়োজন। বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার প্রসেনিয়ামমূলক নাট্যচর্চায় প্রবেশ করার শুরুতে প্রসেনিয়াম থিয়েটার বাংলা নাট্যজগতে কিভাবে আবির্ভূত হয়ে প্রভাব বিস্তার করেছিল তা আমাদের বিশেষভাবে জানার প্রয়োজন বলে মনে করি। প্রখ্যাত নাট্যতত্ত্ববিদ্ ড. অজিতকুমার ঘোষ তাঁর 'নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যমঞ্চ' গ্রন্থে প্রসেনিয়াম থিয়েটারের উদ্ভব সম্বন্ধে বলেছেন— ''সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ায় ইতালীতে এই প্রসেনিয়াম থিয়েটারের উদ্ভব হয়েছিল। তারপর ইয়োরোপে এবং ইয়োরোপের প্রভাবে স্থাপিত পৃথিবীর অন্যান্য দেশে থিয়েটারে এই প্রসেনিয়ামের ব্যবহার হয়েছে।''[২৯] তাঁর এই মন্তব্যের সূত্র ধরে বলা যায় যে, কলকাতায় প্রথম দিককার ইংরেজ বণিক সম্প্রদায় এবং ঔপনিবেশিক শাসকদের মাধ্যমে প্রায় দু'শ বছর আগে ইংল্যাণ্ড থেকে থিয়েটারের আবির্ভাব ঘটেছিল এই বাংলাদেশে। দুটি ঘটনা এই আবির্ভাবকে সাহায্য করেছিল। প্রথমত, পরম্পরাগত একটি দেশজ লোকরঞ্জনী নাট্যকলার অস্তিত্ব এবং দ্বিতীয়ত, এদেশে নতুন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব। এই শ্রেণীর উদ্ভবের ফলে ইংরাজি নাট্যসাহিত্যের প্রতি আগ্রহ দেখা দিল, যা বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের ফলশ্রুতি বলা যায়। এসবের ফলেই তিনদিক ঘেরা একটা উঁচু আয়ত ক্ষেত্রের মধ্যে নাট্যানুষ্ঠানের ইচ্ছা বাঙালীর মনের মধ্যে বাসা বাঁধল, ...।[৩০]

আমরা জানি যে, গ্রিক দেশে গ্রিক রঙ্গমঞ্চের যে জায়গাটাতে দেবতা ডায়নিসাসের আরাধনার পর নাটকের অভিনয় হত, তাকে বলা হত Skene এবং এই Skene-এর সামনের অংশে গোলাকৃতি জায়গায় থাকত Orchestra, এরপর রোমান যুগে থিয়েটারে অভিনয়ের সুবিধার্থে Skene-এর সামনে খানিকটা জায়গা বাড়িয়ে নেওয়া হল প্ল্যাটফর্ম-এর মতো করে। অর্থাৎ Orchestra ও Skene-এর মাঝখানে এই বাড়তি অংশটুকু জোড়া হয়েছিল। তাই Skene-এর সামনে (Pro) এই অংশ জোড়া দেওয়ার ফলস্বরূপ এর নাম হয় Proskenion। পরবর্তীকালে সামনের Orchestra' র গোলাকৃতি জায়গার বদলে অর্ধবৃত্তাকারভাবে তার অংশটি Skene-এর সামনে জুড়ে দেওয়ার ফলে লক্ষ করা যায় যে, সেই অংশটি Arch (ধনুক)-এর আকারে Skene-এর সামনে অংশে যুক্ত হয়। এই কারণে অনেকে একে Arch Proskenion বলে। থিয়েটারের এই গ্রিক শব্দ 'Skene' ইংল্যাণ্ডে এসে ইংরেজি ভাষায় হয়ে যায় Scene অর্থাৎ গ্রীক 'K' এর জায়গায় হল ইংরেজি 'c'। এর ফলে ইংরেজিতে নাম হয় Proscenium। তাই বলা যায় যে, গ্রিক থেকে রোমান

Proskenion শব্দটি বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ইংরেজিতে হয়েছিল Proscenium। সেই সূত্রে এই ধরনের মঞ্চে যে থিয়েটার হয় তাকেই Prosecenium Theatre বলা হয় এবং আজও মঞ্চের পর্দার বাইরে সামনের যে Arch আকৃতির অংশটি রয়েছে তাকে 'আর্চ প্রসেনিয়াম' বলে। নীচে চিত্রের মাধ্যমে বিষয়টি দেখানো হল—

গ্রীক- SKENE - রোমান SKENE - SKENE - ইংল্যণ্ড SCENE

Pro-skene Proskenion Proscenium

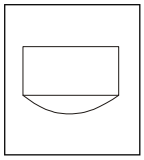

Proscenium Theatre

এই 'প্রসেনিয়াম থিয়েটার' সম্বন্ধে অধ্যাপক দর্শন চৌধুরী 'বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস' গ্রন্থে জানিয়েছেন— ''খ্রিস্ট-পূর্বকাল থেকে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগোতে এগোতে মধ্যযুগের ইউরোপে প্রসেনিয়াম থিয়েটার নির্দিষ্ট রূপ পেতে থাকে। ইউরোপের দেশগুলি, বিশেষত ইংরেজ এবং ফরাসিরা ব্যবসা-বাণিজ্য ও উপনিবেশ স্থাপনের জন্য পৃথিবীর যেসব দেশে গিয়ে বসবাস শুরু করেছে, সেখানেই তাদের দেশের প্রসেনিয়াম থিয়েটার নিয়ে গেছে। সেই সব দেশের নিজস্ব নাট্যাভিনয় পদ্ধতি থাকা সত্ত্বেও যেখানে প্রসেনিয়াম থিয়েটার চালু হয়ে আদৃত হয়েছে।''[৩১] অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকে লক্ষ করা যায় যে, ইংল্যাণ্ডে চলমান প্রসেনিয়াম থিয়েটারের ধারাকে ইংরেজরা ভারতবর্ষ তথা বাংলায় নিয়ে আসার ফলে ঐ মডেলে থিয়েটার তৈরি হয়েছিল কলকাতায় তাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহে। এই মঞ্চের তিনদিক ঘেরা, সামনের দিক খোলা। সেখানে কার্টেন বা পর্দা থাকে। এই পর্দা সরে গেলেই মঞ্চের ভেতরটা দেখা যায়। মঞ্চের দুই ধারে অনেকগুলো 'উইংস' যাকে, সেইগুলো দিয়ে অভিনেতা— অভিনেত্রীরা মঞ্চে প্রবেশ প্রস্থান করে। পিছনের পর্দায় যে দৃশ্য আঁকা থাকে তাকে বলা হয় দৃশ্যপট এবং সেই দৃশ্যপটের সামনের অংশে অভিনয় চলে। অর্থাৎ প্রসেনিয়াম হল চার দেওয়াল বিশিষ্ট মঞ্চের সম্মুখবর্তী শিরোবেষ্টনী যার সঙ্গে যবনিকা সংলগ্ন থাকে। এই প্রসেনিয়ামই মঞ্চের সঙ্গে অভিনেতাদের ব্যবধান সৃষ্টি করে এবং এই প্রসেনিয়ামের ফলে মঞ্চমায়া সৃষ্টির কলাকৌশলগুলি দর্শকদের কাছ থেকে অপ্রকাশ্য রেখে তাদের চিত্তে ভাবরস উদ্রেক করা সহজ হয়। সুতরাং প্রসেনিয়াম যেমন ব্যবধান রচনা করে তেমনি আবার কিঞ্চিৎ দূরত্ব বজায় রাখার ফলে দর্শকদের কৌতূহল ও মানসিক সংযুক্তিবোধ জাগিয়ে রাখতে পারে। মোটকথা প্রসেনিয়াম বলতে বোঝান হয়েছে ইউরোপীয় কৌশলে নির্মিত ঘোরাটোপের মঞ্চকে যা ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলা তথা কলকাতায় সর্বপ্রথম প্রচলিত হয়। সুতরাং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আগমনে আধুনিক থিয়েটারের অর্থাৎ

প্রসেনিয়াম থিয়েটারের যে-ধারার সূচনা বাংলা তথা কলকাতায় হয়েছিল, সেই ধারা অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার উপর স্বাভাবিকভাবেই প্রভাব বিস্তার করে।

বাংলা নাটকের জন্মভূমি কলকাতার পরে স্বাভাবিকভাবে লক্ষ করা যায় যে, অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন জেলায় ক্রমান্বয়ে এই নাট্যাভিনয় বা নাট্যচর্চা শুরু হয়েছিল। তাই কলকাতার পরে সাধারণ নাট্যশালা পর্যায়ক্রমে স্থাপিত হতে দেখা যায় বরিশালে (১৮৫৬ খ্রি:) যশোরে (১৮৫৬ খ্রি:) তারপরে ঢাকায় ও ময়মনসিংহ জেলায় (১৮৭২ খ্রি:), রংপুর (১৮৯১ খ্রি:)। এর পরবর্তী পর্যায়ে যে সকল স্থানের নাম প্রাথমিক থিয়েটার তথা নাট্যচর্চার সঙ্গে জড়িত তার মধ্যে প্রথম ও উল্লেখযোগ্য ছিল বৃহত্তর বা অবিভক্ত দিনাজপুর জেলা তথা দিনাজপুর সদর। অর্থাৎ সাধারণ নাট্যশালা স্থাপনের মধ্য দিয়ে স্বাভাবিকভাবে অবিভক্ত দিনাজপুর জেলা ঐতিহ্যমণ্ডিত নাট্যচর্চায় যুক্ত হয়ে পড়েছিল। অন্যান্য স্থানের মতো দিনাজপুরের প্রাচীন রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস ভিন্ন কোনো ঘটনা নয় বরং ঐতিহাসিক সম্পর্কে অন্যান্য স্থানের সঙ্গে একই সূত্রে অবিচ্ছিন্ন ও সম্পর্কযুক্ত। এক কথায় বলা যায়, অবিভক্ত বাংলার শিল্প, সংস্কৃতি ও নাট্যচর্চার জগতে অন্যতম এক পীঠস্থান ছিল অখণ্ড দিনাজপুর জেলা।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করায় স্যার সিভিল র‍্যাডক্লিফের সীমানা বিভাজন নীতি অনুযায়ী অখণ্ড বা বৃহত্তর দিনাজপুর জেলাকে দ্বিখণ্ডিত করা হলে দুটি দিনাজপুরের উদ্ভব হয়— পূর্ব দিনাজপুর ও পশ্চিম দিনাজপুর। ভারত বিভাজনের পরিণাম স্বরূপ অখণ্ড দিনাজপুর জেলার সাবেক ৩০টি থানার মধ্যে ৯টি সম্পন্ন এবং ১টি অংশ বিশেষ থানা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পশ্চিম দিনাজপুর জেলা গড়ে ওঠে। আর বাকী ২০টি থানার সম্পন্ন অংশ এবং হিলির অংশে বিশেষ পূর্ব পাকিস্তানের অধীনভুক্ত হয়ে পূর্ব দিনাজপুর জেলা গঠিত হয়। এই পূর্বদিনাজপুর জেলাকে কেন্দ্র করে প্রাক্‌স্বাধীনতা পর্বের নাট্যচর্চার ধারা আবর্তিত হয়েছে।

বাংলার নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে লক্ষ করা যায় যে, গিরিশ যুগে (১৮৮০-১৯২০ খ্রি:) অবিভক্ত বাংলার বিশেষত উত্তরবাংলার যে কয়েকটি জেলায় প্রথম অভিনয়চর্চা শুরু হয় অবিভক্ত দিনাজপুর জেলা ছিল তার মধ্যে অন্যতম ও উল্লেখযোগ্য। যতদূর জানা যায় যে, ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে কলকাতার সঙ্গে সুদূর উত্তরবাংলার যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল অনেকটাই দুর্গম। তাছাড়া দিনাজপুর জেলার সমাজ-ব্যবস্থা ছিল সামন্ততান্ত্রিক পশ্চাদপতায় আচ্ছন্ন। এই রকম পরিস্থিতিতে দিনাজপুর শহরে নাটকাভিনয়ের সূচনা ছিল অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের নিয়মাবলীর একধরনের ব্যতিক্রম। শুধু তাই নয়, দেখা যায় যে, এসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও

জেলার সদর, তদানীন্তন মহকুমাদ্বয়— ঠাকুর গাঁ ও বালুরঘাট সহ গ্রামীণ জমিদারিগুলিতে নাট্যাভিনয়ের প্রসার ঘটেছিল ক্রমে ক্রমে। প্রতিভা ও দক্ষতা সম্পন্ন নাট্য নক্ষত্রমণ্ডলীর ধারাবাহিক আবির্ভাব ও অভিনয় সার্থক কিছু সংখ্যক নাট্যকার ও নাট্য পরিচালকের উপস্থিতি, নাট্যপ্রেমী দর্শকমণ্ডলী ও তাদের নাট্যতৃষ্ণা নন্দিত করেছে দিনাজপুর জেলার নাট্যজগৎকে। অর্থাৎ দিনাজপুরের নাট্যচর্চার অবস্থান ও গতিপ্রকৃতির আলোকপাত করতে হলে স্বাভাবিকভাবেই প্রসঙ্গক্রমে অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার সদর ও দুই মহকুমা শহর-ঠাকুর গাঁ ও বালুরঘাটের নাট্যাভিনয় বা নাট্যচর্চার আলোচনা স্বাভাবিকভাবে এসে পড়ে। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক মেহরাব আলী তাঁর 'দিনাজপুরের ইতিহাস সমগ্র (৫ম খণ্ড) গ্রন্থে যথার্থ বলেছেন— ''দিনাজপুরের শহরে নাট্যাভিনয়ের সূচনা হয় ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে জয়দ্রথ নাটকের অভিনয় দিয়ে। ১৮৮৫ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটার কোম্পানী গঠিত হয়। ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটার হল নির্মিত হয় ১৯০৪ সালে। ১৯১৩ সালে নির্মিত হয় দিনাজপুর নাট্যসমিতি। ১৯৪৭এর দেশ বিভাগের প্রাক্কাল পর্যন্ত উপরোক্ত থিয়েটার হল দুটিকেই জড়িত করে অত্র শহরের নাট্যচর্চার তৎপরতা ছিল কেন্দ্রীভূত।''[৩২] মোটকথা দিনাজপুর সদরে অবস্থিত এই রঙ্গমঞ্চ দুটি ও মহকুমাদ্বয় যথা— ঠাকুর গাঁ ও বালুরঘাট শহরে উদ্ভূত রঙ্গমঞ্চগুলি এবং জেলায় স্থায়ী মঞ্চ নির্মাণের পূর্বেও বিভিন্ন গ্রামে ও তৎসহ জমিদার বাড়িতে অস্থায়ী মঞ্চের নাট্যাভিনয়কে কেন্দ্র করে দেশ বিভাগের প্রাক্ কাল বা প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের দিনাজপুরের নাট্যচর্চা শুরু হয়ে মূল ধারায় প্রবেশ করেছিল তার ধারা আজও বর্তমান। বাংলার শহুরে সংস্কৃতির ধারায় লক্ষণীয় বিষয় এই যে, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, পুরাতনীগান ও প্রসেনিয়াম ভিত্তিক নাট্যচর্চা ছিল অন্যতম মাধ্যম। অবিভক্ত দিনাজপুর জেলা ছিল বিশেষ করে এই প্রসেনিয়ামভিত্তিক নাট্যচর্চায় স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল।

এই ধারার প্রতিফলন স্বাভাবিক ছন্দে অখণ্ড দিনাজপুরের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাই লক্ষ করা যায় যে, দিনাজপুরে নাট্যমঞ্চ স্থাপন ও বিকাশের সামাজিক পরিকাঠামো সৃষ্টি হচ্ছিল নগরায়ন ও মধ্যবিত্ত সমাজের গঠন ও বিস্তারের প্রক্রিয়ায়। সুপ্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক গ্রামীণ কৃষি সমাজের 'পাবলিক এনটারটেনমেন্ট' বা গণবিনোদন যথা— যাত্রাগান, কবিগান, পাঁচালি, কীর্তন, কথকতা ইত্যাদি জেলার বিভিন্ন এলাকাতে পরম্পরাগত পালাগানের আকারে যে স্থানীয় বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি সহ বহাল ছিল, তা থেকে সামাজিক বিবর্তনের আধুনিক প্রক্রিয়ায় শহুরে নাট্যবিনোদন গড়ে উঠেছিল। নতুন ধরনের শহুরে বিনোদনকে সৃষ্টি ও পুষ্ট করার জন্য অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি দিনাজপুর শহরের প্রান্তে সাবলীলভাবে এসে পৌঁছে যায়।

ধনাঢ্য বাঙালিদের বিশেষত রাজা, মহারাজা ও জমিদার শ্রেণীর দ্বারা সখ-সৌখিনতার

মধ্য দিয়ে নিজস্ব উদ্যোগে রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করে স্বাধীন চিন্তাভাবনা ও খেয়ালখুশি মাফিক নাট্যাভিনয়ের ধারা সমগ্র বাংলার বুকে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তার প্রবল ভাবাবেগ অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার রাজবাড়িকেও নাট্যচর্চার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহ জুগিয়ে তুলতে দেখা গিয়েছিল। এই বিষয়ে দিনাজপুরের বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব ও নাট্যকর্মী কুমার রায় যথার্থ বলেছেন— ''ব্রিটিশ শাসনামলে, অবিভক্ত বাংলায় প্রসেনিয়াম ভিত্তিক নাট্যচর্চার প্রাণকেন্দ্র ছিল কলকাতা। ১৮৩১ সালে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বসতবাটিতে অবস্থিত হিন্দু থিয়েটার এবং ১৮৩৩ (ভিন্ন মতে ১৮৩৫) সালে নবীনচন্দ্র বসুর বসতবাটিতে অবস্থিত নাট্যশালার মাধ্যমে জমিদার শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় যে প্রাইভেট থিয়েটারের ধারা বাংলায় প্রচলিত হয়, তার ঢেউ দিনাজপুরকে আন্দোলিত করে উনিশ শতকের শেষ প্রান্তে। এ সময় দিনাজপুর রাজবাড়িতে 'কোহিনুর থিয়েটার' নির্মিত হয়।''[৩৩] বাংলায় জমিদার শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় যে প্রাইভেট থিয়েটারের ধারা প্রচলিত হয়, তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে উনিশ শতকের শেষার্ধে অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার রাজা, মহারাজা ও জমিদার শ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতা ও সক্রিয় সহযোগিতায় নিজস্ব উদ্যোগে প্রাইভেট থিয়েটার চর্চা শুরু হয়েছিল। মোটকথা দিনাজপুর অঞ্চলের নাট্যচর্চা রাজা জমিদারদের প্রাধান্যপুষ্ট হয়ে উনিশ শতকের শেষ দিক থেকেই সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে এ অঞ্চলে অনেক নাট্যসংস্থা সাংগঠনিক ভিত্তি লাভ করে। তার বাস্তব নিদর্শন হিসেবে দেখা যায় যে, সবেমাত্র আধুনিক বিনোদনের আগমনকালের পূর্বে দিনাজপুর সদর তথা শহরের উত্তরপূর্ব উপকণ্ঠে অবস্থিত দিনাজপুর রাজবাড়ি ছিল একমাত্র বিনোদন কেন্দ্র। সেই সময় রাজবাড়ি দিনরাত রাজকীয় ঠাটে আনন্দ-উৎসবে ভরপুর থাকত। অর্থাৎ বিভিন্ন রকমের পূজা-পার্বণ তিথিপর্ব এমনকি কোন বিবাহ উপলক্ষে এই রাজবাড়িতে সামন্তিক ঠাটে মহাসমারোহে উৎসব অনুষ্ঠান হতো, যার প্রধান বিনোদনস্বরূপ থাকত কবিগান, যাত্রাগান ও নটঙ্গীর নাচ বা বাঈজী নৃত্য। আমরা পূর্বে অবগত হয়েছি যে, রাজবাড়ির এই মহোৎসবে শহরবাসীর তথা জনসাধারণের প্রবেশ করার অধিকার ছিল না। এমনকি সেই সব বিনোদনের রস কেউ উপভোগ করতে পারত না। শুধুমাত্র রাজবাড়ির আমন্ত্রিত বিশেষ ব্যক্তিবর্গরাই সেইসব বিনোদন উপভোগ করতে পারতেন।

১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে মহারাজা গিরিজানাথ রায় দিনাজপুর জেলার দায়িত্বভার গ্রহণ করার ফলে লক্ষ করা যায় যে, দিনাজপুর রাজবাড়ির উদ্যোগে আয়োজিত রাজকীয় সামন্তিক ঠাটে উৎসব-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি যুগোপযোগী ও সংস্কৃতিমনস্ক বিনোদনের রসাস্বদনে সর্বাগ্রে এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি স্বয়ং ছিলেন একজন উচ্চস্তরের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বিশারদ ও গুণী সমঝদার। তাই তাঁর উদ্যোগে দিনাজপুর রাজবাড়ির জলসাঘরে উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসরের পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন

শহর ও দরবার থেকে মশহুর কলাবত ও কলাবতীগণ রাজার অতিথি হয়ে আসতেন। বিশেষ করে মহানুভব মহারাজা গিরিজানাথ উন্নত শিল্পমোদী, নাট্যপ্রাণ বা নাট্যামোদী, সংগীতপ্রিয় ও উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলেই রাজবাড়ির মধ্যে নাটমন্দির, কোহিনুর মঞ্চ, জলসাঘর প্রভৃতি নির্মিত হতে দেখা যায়। মোটকথা যুগের প্রভাব অনুসারে তিনি ছিলেন ক্লাসিক শিল্পের গুণগ্রাহী। তাই ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর দিনাজপুর শহরে ক্ষেত্রীপাড়া মৌজায় অবস্থিত রথের মাঠে অস্থায়ী মঞ্চে 'জয়দ্রথ' অভিনয়ের দ্বারা প্রথম নাট্যাভিনয়ের যখন সূত্রপাত হয় তখন রাজা গিরিজানাথ নিজস্ব উদ্যোগে ও অদম্য উৎসাহে নিজের রাজবাড়িতে ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে কোহিনুর থিয়েটার নামে এক সৌখিন নাট্যসংস্থা গড়ে তুলেছিলেন। সমগ্র উত্তরবাংলার একমাত্র বাঙালি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, দিনাজপুরের গুপ্ত এস্টেটের মালিক ও বালুবাড়িতে আবাস পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন এই মঞ্চ স্থাপন ও নাট্য প্রযোজনার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা। এই রাজবাড়ির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এছাড়াও তিনি ব্রিটিশ সরকারের বড় বাঙালি আমলা ছিলেন। তিনি নিজেও নাটক করতেন। তবে এই কোহিনুর রঙ্গমঞ্চে নাট্যাভিনয় ছিল রাজকীয় আড়ম্বরে ভরপুর। সেই সঙ্গে এই সব বিনোদনের রসাস্বাদন ছিল কেবলমাত্র রাজবাড়ির অধিবাসীদেরই উপভোগ্য সম্পদ। এমনকি তৎকালীন বিনোদনের উপকরণই ছিল ধনী তথা বড়লোকদের 'নর্মসখি'। তাই এই নাট্যসংস্থার নাট্যাভিনয়ে সাধারণ মানুষের প্রবেশের অধিকার ছিল না। এই প্রসঙ্গে জেলার বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক সত্যরঞ্জন দাস যথার্থ বলেছেন— ''দিনাজপুরের মহারাজার রাজপ্রাসাদের স্থায়ী মঞ্চে নাটক, গান-বাজনা প্রভৃতি আনন্দানুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। দিনাজপুর শহরের অভিনেতারা পূর্বাপর রাজবাড়ির এই মঞ্চে মহারাজাও সপারিষদ আমন্ত্রিত হয়ে অভিনয় দেখতে আসতেন।''[৩৪] আবার দিনাজপুর রাজবাড়ির এই 'কোহিনুর থিয়েটার'কে কেন্দ্র করে যে প্রাইভেট থিয়েটার চর্চা জেলায় শুরু হয়েছিল, তার সম্বন্ধে বিশেষ নাট্যব্যক্তিত্ব শুভাশীষ গুপ্ত জানিয়েছেন— ''১৮৭২ সালে কলকাতায় পেশাদার মঞ্চাভিনয় শুরুর মাত্র ৭ বছর পর, ১৮৭৯ সালে দিনাজপুর শহরে নাটক শুরু হয়েছিল দিনাজপুর রাজবাড়িতে— 'কোহিনুর থিয়েটার কোম্পানী' নামে এক সৌখিন সংস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। সংস্থাটির অস্তিত্ব স্বল্পকালীন হলেও এই ঘটনা ছিল ঐতিহাসিক। কেননা অবিভক্ত বাংলায় খুব কম জেলাতেই নাটক শুরু হয়েছিল এইকালে।''[৩৫] এই 'কোহিনুর থিয়েটার' চলকালীন অবস্থায় দিনাজপুরের ভূপালপুরে সৌখিন নাট্যচর্চার মাধ্যমে আর একটি প্রাইভেট থিয়েটার সংস্থা গড়ে উঠেছিল। দিনাজপুরের বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব কুমার রায় এই বিষয়ে জানিয়েছেন— ''বাবু কালচারের প্রকাশ স্থল হিসেবে থিয়েটারের জন্ম এখানে হয়নি। যদিও বিত্তবানদের সহায়তা ছিল। এবং কলকাতার মত বিত্তবানদের আঙিনায় প্রাইভেট থিয়েটারও ছিল। অন্ততঃ দুটির উল্লেখ তো করাই যায় এই

প্রাইভেট্ থিয়েটারের নিদর্শন স্বরূপ। দিনাজপুরের রাজবাড়িতে কোহিনুর থিয়েটার এবং ভূপালপুরে ভূপাল চৌধুরীর বাড়ীর থিয়েটার।"[৩৬]

এই 'কোহিনুর থিয়েটার' অতি অল্পকাল স্থায়ী ছিল। তবে এই নাট্যসংস্থা বন্ধ হওয়ার প্রকৃত কারণ জানা না গেলেও একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, দিনাজপুরের নগরায়ন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট মধ্যবিত্তদের বসত থেকে দূরে এবং বিচ্ছিন্ন একাকিত্বময় রাজবাড়িতে অবস্থিত রাতের থিয়েটারে সাধারণ দর্শকদের যাতায়াত ছিল বড় সমস্যার। তখনও দিনাজপুরে যোগাযোগের জন্য ঘোড়ার গাড়ির পাবলিক ট্রান্সপোর্ট চালু হয়নি। তবে এই নাট্যসংস্থা উঠে যাওয়ার অনতিকালের মধ্যে দ্বিতীয় উদ্যোগ শুরু হয়েছিল।

বাংলাদেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজ্যশাসনের সূচনালগ্নে সৃষ্ট আদি জেলাশহরগুলির অন্যতম পুরাতন শহর ছিল দিনাজপুর— যা অবিভক্ত বাংলার শিল্প, সংস্কৃতি ও প্রসেনিয়াম নাট্যচর্চার উল্লেখযোগ্য পীঠস্থান। এই সম্বন্ধে জেলার বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব ও নাট্যকর্মী কুমার রায় বলেছেন— ''থিয়েটার সম্পর্কে সচেতনতার নিদর্শন এক দিনাজপুর শহরেই দুটি নাট্যগৃহ। নাট্যসমিতি আর ডায়মণ্ড জুবিলী হল। নিয়মিত থিয়েটারের আসর বসত এখানে। ডায়মণ্ড জুবিলী হল অবশ্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু নাট্যসমিতি, ঠাকুর গাঁ-এর করোনেশন থিয়েটার সগৌরবে বেঁচেছিল। তাছাড়া বালুরঘাটে ও রায়গঞ্জে স্থায়ী মঞ্চও এ জেলার নাট্যপ্রীতির স্বাক্ষর বহন করছে।"[৩৮]

আমরা পূর্বের আলোচনায় দেখেছি যে, প্রাথমিক অবস্থায় সুষ্ঠ সংগঠনের অভাবজনিত কারণে অনেকটা এলেমেলোভাবে দিনাজপুরের নাট্যাভিনয়ের প্রথম অধ্যায় অতিবাহিত হলেও লক্ষ করা যায় যে, শিল্পীদের অদম্য উৎসাহ ও নাট্যামোদী মহলের নিরন্তর প্রচেষ্টায় নাট্যাভিনয়জনিত প্রবহমান উৎসাহ ধারাকে কাজে লাগিয়ে দিনাজপুরে নাট্যাভিনয়োপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তুতির পর্ব শুরু হয়েছিল। তার একটি বাস্তব ফলশ্রুতির নিদর্শন হল অতি অল্পকালের মধ্যেই প্রথম নাট্য সংস্থার ৬ বছর পরেই অর্থাৎ ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর শহরে ক্ষেত্রীপাড়া মহল্লায় নাটক নিয়ে দ্বিতীয় সংগঠিত উদ্যোগ ছিল 'ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটার কোম্পানী'।

এই 'ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটার কোম্পানী'র নাট্য উদ্যোক্তারা হলেন রায়বাহাদুর পূর্ণেন্দু রায় দেববর্মা, দিনাজপুরের মহারাজা বাহাদুর স্যার গিরিজানাথ রায়, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত জমিদার (পরবর্তীকালে অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট) হরিচরণ সেন, দিনাজপুর কালেক্টরির কেরানি ও শহরে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ভূপাল চন্দ্র সেনগুপ্ত, কালেক্টরির কেরানি কৃষ্ণনাথ সেনগুপ্ত, অমূলদেব পাঠক, গিরিজামোহন নিয়োগী, যোগেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, উকিল সুরেশচন্দ্র সেন প্রমুখ। এই নাট্যসংস্থাকে পূর্বে উল্লেখিত 'কোহিনুর থিয়েটার'-এর উত্তরাধিকার বলা যায় না। তবে এই নতুন নাট্যসংস্থা

সাধারণ জনগণের ইচ্ছা ও অভিব্যক্তি হিসাবে কখনই গড়ে ওঠেনি। ব্রিটিশ শাসনে রাজা-জমিদারকুলের ব্রিটিশ রাজভক্তির এক প্রদর্শন হিসাবে এবং জেলা প্রশাসনের উচ্চমহলের ইংরেজ সাহেবদের ইন্ধনে, এক সাময়িক উদ্যোগ সাধনের জন্য ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয়েছিল দিনাজপুরের দ্বিতীয় নাট্যসংস্থা— 'ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটার কোম্পানী'। দিনাজপুরের ইতিহাসে বহু ঘটনার স্মরণীয় ও উল্লেখযোগ্য বছর ছিল ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দেই ইংল্যাণ্ডেশ্বরী তথা ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসন আরোহণের ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষে ভারতে ব্রিটিশ সরকার ছাড়াও দেশীয় রাজা-মহারাজা ধনীব্যক্তি বিশেষত জমিদার, নবাব এছাড়াও কলকাতার রঙ্গমঞ্চসহ সকলে এই 'ডায়মণ্ড জুবিলী' বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সর্বত্র প্রতিপালনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের শেষার্ধে দেখা যায় যে দিনাজপুরের তদানীন্তন কালেক্টর মি. এইচ. বিডন এই উপলক্ষে দিনাজপুরের জমিদার, ব্যবসাদার, ধনাঢ্যব্যক্তিগণ এবং সম্ভ্রান্ত মানুষদের নিয়ে এক কমিটি গঠন করেন— 'হার হাইনেস কুইন ভিক্টোরিয়াজ ডায়মণ্ড জুবিলি করোনেশন সেলিব্রেশন কমিটি'। এতে দিনাজপুরের সফল রাজন্যবর্গ যথা মহারাজা গিরিজানাথ রায়, রায় সাহেব এস্টেটে'র জমিদার, 'গুপ্ত এস্টেটে'র পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত, 'মালদুয়ার এস্টেটে'র রাজা টঙ্কনাথ রায়, কালীতলার জমিদার (পরবর্তীকালে অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট) হরিচরণ সেন ছাড়াও কয়েকজন ধনী বাঙালি, মারোয়াড়ী ব্যবসাদার নিয়ে গঠিত হয়েছিল এই কমিটি। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ও ১৭-ই ফেব্রুয়ারি দিনাজপুর শহরের উকিল, মোক্তার ও কর্মচারীদের বাড়িতে এবং সরকারী সমস্ত দপ্তরগুলির মাথায় ব্রিটিশ পতাকা— 'ইউনিয়ন জ্যাক' উত্তোলন করে উদ্‌যাপিত হয়েছিল উৎসবের ব্যাপক কর্মসূচী। সরকারী ব্যবস্থাপনায় মহাড়ম্বরে সাময়িক কুচকাওয়াজ, ঘোড়দৌড়, খেলাধূলা, 'স্টেশন ক্লাব'-এ বলড্যান্স, বড় মাঠে দরবার অনুষ্ঠান, সারা শহর আলোক সজ্জায় উজ্জ্বলিতকরণ, কয়েদি খালাস, কাঙালী ভোজন ইত্যাদি অনেকগুলি কর্মসূচীর মাধ্যমে সেই মহোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। জেলা স্কুলের মাঠে মঞ্চ বেঁধে স্থানীয় শিল্পীদের দ্বারা মহাসমারোহে দু'রাত্রি নাটক অভিনীত হয়— 'হরিশ্চন্দ্র' ও 'জয়দ্রথ'। এই নাটকে অংশগ্রহণকারী ও উদ্যোক্তারা হীরক জয়ন্তী উৎসব পূর্তিকে স্মরণীয় করে রাখতে নিজেদের গোষ্ঠীর নবগঠিত নাট্যসংস্থার সাময়িক নামকরণ করেছিলেন 'ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটার কোম্পানী'। অবশ্য এই অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর বেশ কয়েক বছর এই নাট্যসংস্থাকে তেমন কোনো ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়নি। তবে ১৮৮৫-১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অভিনীত নাটকগুলি ছিল দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' অবলম্বনে 'জেনানা যুদ্ধ', 'আলিবাবা', 'রামের বনবাস' ও 'নরমেধ যজ্ঞ' প্রভৃতি।

এই 'ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটার কোম্পানী' প্রধানত সৌখিন নাট্যসংস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ

করে। কিন্তু এই নাট্যসংস্থার নাট্যচর্চা ও অন্যান্য কার্যকলাপ নিয়মিত না হলেও একেবারে অনিয়মিত ছিল না। কালীতলা মহল্লায় সেনবংশীয় জমিদারগণের বাসভবনে এই নাট্যসংস্থার প্রথম কর্মকেন্দ্র অবস্থিত ছিল। দিনাজপুর শহরে স্থায়ী নাট্যশালা তৈরি না হওয়া পর্যন্ত এই সংস্থার নাট্যাভিনয়গুলি অভিনীত হতে দেখা যায় জমিদারবাড়ির দক্ষিণে সড়ক সংলগ্ন স্থানে অবস্থিত রথের মাঠের উপর অস্থায়ীভাবে নির্মিত মঞ্চে। এই সেনবংশীয় জমিদার ঘরের সন্তান হরিচরণ সেনই ছিলেন দিনাজপুরের নাট্য আন্দোলনের অগ্রদূত এবং দিনাজপুর পত্রিকার সূত্রে জানা যায় তিনিই (হরিচরণ সেন) আদি নাট্যশিল্পী, নাট্য সংগঠক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার। এমনকি দিনাজপুরের প্রথম নাট্যাভিনয় 'জয়দ্রথ' (১৮৭৯) এর তিনিই ছিলেন রূপকার। দিনাজপুর জেলার প্রথম পর্বের স্বনামধন্য নাট্যকার হরিচরণ সেনের জন্ম হয় ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে এবং তিনি জীবিত ছিলেন ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

পরবর্তীকালে দেখা যায় যে, ব্রিটিশ দখলিকৃত তদানীন্তন দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডেশিয়ার (বর্তমান জিম্বাবোয়ে রাষ্ট্র) বুয়র জাতির সঙ্গে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর দীর্ঘকাল ধরে নাস্তানাবুদ হওয়া যুদ্ধের প্রসঙ্গে এই নাট্য সংস্থা সম্পর্কে একটি রিপোর্ট জানা যায়। বুয়ররা গোরিলা যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন করে ব্রিটিশ সৈন্যদের হঠিয়ে দেন বহু এলাকা থেকে। এই যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে নাট্যাভিনয় করে টিকিট বিক্রয়লব্ধ টাকা তুলে সাহায্য করার জন্য নাটকের কর্মসূচী করা হয় এই নাট্যসংস্থার নামে। এবং এই কর্মসূচী গ্রহণের মূলে প্রধান উদ্যোক্তা ও অভিনেতা হিসাবে ছিলেন হরিচরণ সেন। মাসিক দিনাজপুর পত্রিকার সমকালীন রিপোর্টের সূত্রে জানা যায় যে, প্রকৃত পক্ষে এই সময় থেকেই ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটার কোম্পানী' স্থায়ীভাবে কাজ করতে থাকে, তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই পত্রিকার একটি রিপোর্টে— ''এখানে বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণের যত্নে ও উৎসাহে 'ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটার কোম্পানী' নামে একটি কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে। সেই থিয়েটার কোম্পানী কর্তৃক এখানকার নিত্যবোধিনী সভার বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে ধর্মসভা প্রাঙ্গনে ও দিনাজপুর রাজধানীতে শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাদুর এবং শ্রীল রায় সাহেবের খরচে ও উৎসাহে মেফেকিং শহরে (তদানীন্তন বিদ্রোহী বুয়রদের দখলিকৃত রোডেশিয়ার একটি শহরে) অবরুদ্ধ ইংরেজ সেনাদের উদ্ধার কল্পে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড গৃহের সম্মুখে অভিনয় হইয়া গিয়াছে। প্রথম উদ্যোগে কোম্পানী যেভাবে অভিনয় দেখাইয়াছেন তাহাতে প্রত্যেক অভিনেতারই আমরা প্রশংসা করিতেছি। অভিনেতাদের চরিত্র বিশুদ্ধির দিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আছে। এই সকল স্থানে বিশুদ্ধ আনন্দ উপভোগের উপায় হইয়াছে এজন্য থিয়েটার কর্তৃপক্ষ ও সাহায্যকারী সকলকেই আমরা ধন্যবাদ জানাইতেছি।''[৩৮]

তবে রাজভক্তির প্রদর্শন হলেও এই নাট্যানুষ্ঠান থেকেই দিনাজপুর নাট্যজগতের প্রকৃত

সূত্রপাত ঘটে। ঐতিহাসিক কৃতিত্ব দিনাজপুরের নাট্যজগতের কাছে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৮৫ থেকে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অর্থাৎ প্রথম পর্বে যে অভিনেতারা অভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে হরিচরণ সেনগুপ্ত ছাড়াও ছিলেন দীগেন গাঙ্গুলী, ছোটকুমার, বিনোদ শী, সতীশ বৈরাগী, মুকুন্দ বৈরাগী, যশস্বী হয়েছিলেন জনৈক ললিত ও মনা সেন (ফিমেল পার্ট করতেন), পলকাবাবু প্রমুখ বিশিষ্ট অভিনেতাবৃন্দ।

থিয়েটার কোম্পানীর অনুসরণে সেই সময়ে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে কয়েকটি সৌখিন নাট্যদল গড়ে উঠেছিল, বস্তুত বার্ষিক পূজা-পার্বণ, তিথি পর্ব ও নববর্ষ উপলক্ষে নাট্যাভিনয় করত। এই সময়ে লক্ষ করা যায় নাট্যাভিনয় দেখতে দেখতে স্বাভাবিকভাবে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের অজান্তে একটা শিল্পগ্রাহী রসিক সমাজ গড়ে ওঠে।

সেই সময়ে এই নাট্যসংস্থায় অভিনীত নাটকের সংখ্যা কম ছিল না। দিনাজপুর পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় অভিনীত নাটকগুলির নাম জানতে পারা যায়। যথা— হরিশ্চন্দ্র, জয়দ্রথ, বৃত্তসংহার, নরমেধযজ্ঞ, চন্দ্রশেখর, পাণ্ডব গৌরব, দুর্গেশনন্দিনী, মোগল পাঠান, সীতারাম, অযোধ্যার বেগম, মিশর কুমারী, মেবার পতন, সিংহল বিজয়, প্রফুল্ল, জনা, আবু হোসেন, চৈতন্যলীলা, বুদ্ধচরিত, আলীবাবা, মেঘনাদবধ, দিল্লীশ্বরবা, অহল্যা বাঈ ইত্যাদি পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকগুলির নাম উল্লেখ্য। এই নাটকের মধ্যে কোন কোন নাটক বহুবার এবং একটানা বহুদিন অভিনীত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে দেখা যায় যে, 'ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটার কোম্পানী'তে যে সকল অভিনেতারা হরিচরণ সেনের সঙ্গে সহযোগী ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন দিনাজপুর কালেক্টরীর (পরবর্তীকালে সেরেস্তাদার) ভূপালচন্দ্র সেনগুপ্ত, কালেক্টরীর খাজাঞ্চী (ট্রেজারার) কৃষ্ণনাথ সেনগুপ্ত, অমূল্যদেব পাঠক, গিরিজামোহন নিয়োগী, যোগেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, উকিল সুরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত, শরৎচন্দ্র (থেনু) গুপ্ত প্রমুখ বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব।

অবশেষে নাট্যশিল্পীদের তৎপরতায় বিশেষ করে দিনাজপুরের নাট্যাভিনয়ের অগ্রদূত বিশিষ্ট মঞ্চশিল্পী হরিচরণ সেনের উদ্যোগে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে একটি জনসভায় নাট্যশালা নির্মাণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং প্রস্তাবিত নাট্যশালাটির নামকরণ করা হয় 'ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটার হল' এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক মেহরাব আলী তাঁর 'দিনাজপুরে রঙ্গমঞ্চের একশতাব্দী' গ্রন্থে বলেছেন— ''দুটি রঙ্গমঞ্চকে কেন্দ্র করে প্রধানতঃ দিনাজপুরে নাট্যাভিনয়ের দ্বারা আবর্তিত। 'ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটার হল' (১৮৭৯-১৯৪৫) এবং 'দিনাজপুর নাট্যসমিতি' (১৯১৩) প্রথমটি বিলুপ্ত কিন্তু দ্বিতীয়টি বর্তমানে আছে। দুটি হলই স্ব স্ব যুগের দিনাজপুরের নাট্যভিনয় ছাড়াও অন্যান্য অনেক সাংস্কৃতিক,

রাজনৈতিক ও সামাজিক সভা সম্মেলন করার কেন্দ্রবিন্দু, বিশেষ করে যখন দিনাজপুরে কোন পাবলিক হল ছিল না।"[৩৯] দিনাজপুরের অস্থায়ীমঞ্চে প্রথম নাট্যাভিনয়টি মঞ্চস্থ হওয়ার পর থেকেই লক্ষ করা যায় যে, নাট্যাভিনয়ে স্থায়ী মঞ্চে গঠনের তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। এর ফলে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুরের ক্ষেত্রপাড়া মহল্লায় প্রথম স্থায়ী রঙ্গালয় বা নাট্যমঞ্চ 'ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটার হল' নির্মিত হয়। এই থিয়েটার হল তৈরি হওয়ার ফলে জেলাবাসীর নিয়মিত নাট্যানুষ্ঠানের যে বহুদিনের আকাঙ্খিত দাবি ছিল তা পূরণ হয়।

এই নাট্যশালা তৈরি করার জন্য কাজ শুরু হয় সামাজিক দানের প্রত্যাশাকে মাথায় রেখে। এর ফলে দেখা যায় যে, দিনাজপুরের দ্বিতীয় প্রধান জমিদার রায় সাহেব রাধাগোবিন্দ রায় রথের মাঠে ১৬ শতক জমি প্রদান করেন। (মৌজার নাম ক্ষেত্রীপাড়া, পরগনা-প্রাণনাথপুর, খতিয়ান নং ১১১২, দাগ নং— ২৫২২) এবং মহারাজা গিরিজানাথ রায় মোটা অংকের চাঁদা দান করেন। সেই সঙ্গে উদ্যোক্তা ও সমাজের অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে উপকরণ সংগ্রহ করা হয়। এই নাট্যশালাটি দিনাজপুরের নাট্যজগতের পথিকৃত ও বিশিষ্ট নাট্যশিল্পী হরিচরণ সেনের ঐকান্তিক চেষ্টা ও অনবদ্য পরিশ্রমের মাধ্যমে বছর খানেকের মধ্যেই নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছিল। এই 'ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটার হলে'র শুভ উদ্বোধন হয় বিশেষ আয়োজনসহ সাড়ম্বরে 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে। এই 'ডায়মণ্ড জুবিলী হল'-এর দ্বারোদ্ঘাটন করেছিলেন মাহারাজা গিরিজানাথ রায় বাহাদুর। এই উপলক্ষে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের আগমন ঘটে। যারা সম্মানীয় অতিথি ও বিশেষ আমন্ত্রিত রূপে এসেছিলেন, তারা হলেন— জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. গ্যারট, জেলা জজ মি.গ্রান্ট, ইংরেজ রাজকর্মচারীবৃন্দ, স্থানীয় জমিদার শরদিন্দু নারায়ণ রায়, পূর্ণেন্দু নারায়ণ রায়, রাজপরিবারের সদস্যগণ, অন্যান্য কিছু জমিদারগণ, প্রথম জেলা কংগ্রেস সভাপতি মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, উকিল গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী, আইনজীবি যোগীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী এছাড়াও পরমেশ্বর দাঁ, রাখালদাস সেন, মধুসূদন রায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। মঞ্চ তৈরি হওয়ায় নিয়মিতভাবে উদ্যোক্তা ও অভিনেতাদের মিলিত হওয়া, মহলার ব্যবস্থা এবং নাটক করার পথ সুপ্রশস্ত হয়। বলা যায় পেশাদারি কায়দায় মঞ্চাভিনয়ের পত্তন দিনাজপুর শহরে ঘটে এই মঞ্চ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ 'ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটার হল' স্থাপিত হওয়ার ফলে যেমন জেলার স্থায়ী নাট্যশালার দীর্ঘদিনের কাঙ্খিত অভাব দূরীভূত হয়, ঠিক তেমনিভাবে এই মঞ্চকে কেন্দ্র করে অন্যান্য স্থানের ন্যায় বিশেষ করে কলকাতার মত দিনাজপুরেও সৌখিন নাট্যাভিনয়ের পরিবর্তে পেশাদার নাট্যাভিনয়ের চিন্তাচেতনা শুরু হয়।

১৯০৪-১৯১২ খ্রিস্টাব্দে ('দিনাজপুর ডায়মণ্ড জুবিলী ড্রামাটিক ক্লাব' দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত) দিনাজপুরের নাট্যাভিনয়ের জনক তথা বিশিষ্ট নাট্যশিল্পী হরিচরণ সেন ছাড়াও যে

সমস্ত নাট্যশিল্পীগণ মঞ্চ সফল অভিনেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ট্যাঙ্গর চক্রবর্তী, ভূপালচন্দ্র সেনগুপ্ত (ঐতিহাসিক মেহরাব আলী উপাধি ব্যবহার করেছেন—'চৌধুরী') কৃষ্ণনাথ সেনগুপ্ত, শরৎচন্দ্র (থেনুবাবু) গুপ্ত (১৮৭৬-১৯২৬), জ্যোতিষচন্দ্র গুপ্ত (১৮৮৮-১৯৬৫), অমূল্যদেব পাঠক, গিরিজামোহন নিয়োগী, যোগেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত, সুরেন্দ্রচন্দ্র সেন, মনমোহন ব্যানার্জী ওরফে নেদাবাবু (ইতিহাস লেখক জনাব মেহরাব আলীর মতে নাম—নেদা রায়) স্ত্রী চরিত্রে সতীশ চন্দ্র দাস, পূর্ণেন্দুনারায়ণ রায় প্রমুখ। এই অভিনেতাদের অধিকাংশই ছিলেন ধনাঢ্য বা উচ্চ-মধ্যবিত্ত অংশের মানুষ। দিনাজপুরে নাট্যজগত জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় ও নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল ধনী কিছু উকিল ও ডাক্তার, মূলতঃ উচ্চ-মধ্যবিত্ত, বিশেষ করে জমিদারী সেরেস্তার ও কালেক্টরের উপর মহলের কর্মচারীদের অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়ে। ডায়মণ্ড জুবিলী হলের নাট্যাভিনয় প্রদর্শনীর শুভ উদ্বোধন হয় টিকিট বিক্রয় পদ্ধতির মাধ্যমে। এর ফলে নাট্যানুরাগীদের মধ্যে অবশ্য বিরূপ প্রতিক্রিয়াও দেখা দেয়। তবে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, উন্মুক্ত আকাশের নীচে ধূলি ধূসরিত তৃণাসনের বদলে সামান্য পয়সার বিনিময়ে টিকিট ক্রয় করে বদ্ধ দালান ঘরে গ্যালারীর কাষ্ঠাসনে বসে আরামে নাট্যানুষ্ঠান উপভোগ করাটা কম সৌভাগ্যের বিষয় ছিল না। এই বিষয়ে দিনাজপুর পত্রিকার বিবরণের সূত্রে জানা যায় যে, ডায়মণ্ড জুবিলী হলে অভিনীত প্রথম দিনের টিকিট বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্জিত টাকার পরিমাণ ছিল প্রায় একশত টাকা।

দিনাজপুরের প্রথম স্থায়ী নাট্যশালা 'ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটার হল'-এর সঙ্গে জড়িত থেকে হরিচরণ সেন নাট্যচর্চার ধারাকে প্রাগ্রসরশীল ভূমিকায় দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর উদ্যোগে দিনাজপুরের নাট্যাঙ্গনে সাড়া জাগে। দিনাজপুরের থিয়েটার জগতের পথিকৃত হরিচরণ সেন ছাড়া দিনাজপুরের নাট্যাভিনয় ছিল সম্পূর্ণরূপে কল্পনাতীত। শুধু তাই নয় ঠিক সময়োচিত ভাবেই নবযুগের আহ্বান নিয়ে বিরাট নাট্যপ্রতিভার শক্তিসহ আবির্ভূত হলেন নট ও নাট্যকার হরিচরণ সেন। তাঁর নেতৃত্ব, পরিচালনা ও নবযুগের উদ্দীপনায় দিনাজপুরের নাট্যমঞ্চ প্রানবন্ত হয়ে উঠে। তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, হরিচরণ সেন ছিলেন দিনাজপুরের নাট্যজগতের স্রষ্টা, আদি পিতা। অভিনয় পারদর্শিতা, প্রযোজনা এবং নাট্য সংগঠন গড়ার ক্ষেত্রে তার প্রত্যক্ষ ও উজ্জ্বল ভূমিকার জন্য তিনি হয়ে থাকবেন চিরস্মরণীয়। অর্থাৎ একসময় নাট্যাচার্য গিরিশ ঘোষকে প্রধান কেন্দ্রবিন্দু করে কলকাতার 'স্টার থিয়েটার', 'ন্যাশনাল থিয়েটার প্রভৃতি বিখ্যাত থিয়েটার প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে উঠেছিল। ঠিক তদ্রুপ দিনাজপুরের নাট্যাভিনয়ের শুরু থেকে চার দশক পর্যন্ত নাট্যমঞ্চের সার্থক কাণ্ডারী ছিলেন হরিচরণ সেন। এমনকি তিনি ছিলেন নাট্যাচার্য গিরিশ ঘোষের মতোই ক্লাসিক থিয়েটারের যোগ্য সাধক।

দিনাজপুর নাট্যরঙ্গমঞ্চের অভিনয়োপযোগী নাটকের অভাব দূর করার মানসে নট ও নাট্যকার

হরিচরণ বেশ শক্ত হাতে লেখনী ধরে বেশ ক'খানি নাটক লিখে ফেললেন। যথা—'মায়ের ডাক', 'নকসা', 'অরুন্ধতী', 'দুর্গাবতী' 'সীতারাম', 'অদৃষ্ট', 'লজ্জা' প্রভৃতি। এই নাটকগুলি মূলতঃ ভক্তিবাদ, দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধের রসে সিঞ্চিত ছিল। তাঁর রচিত নাটকগুলি দিনাজপুরের কালীতলার মাঠে সাময়িক নির্মিত মঞ্চে স্থানীয় অন্যান্য সখের দলগুলির রঙ্গমঞ্চে ভীষণ জনপ্রিয়তা ও সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল। তবে তাঁর অভিনীত অধিকাংশ নাটকের সমালোচনা তৎকালীন দিনাজপুর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তা থেকেই জানা যায় যে, হরিচরণের নাটক শিল্পগুণে গুণান্বিত ও জনপ্রিয়তা অর্জনে সমর্থ হয়েছিল।

যতদূর জানা যায়, হরিচরণ সেন বিরচিত 'নক্সা' নাটক এতদঞ্চলের প্রথম ও প্রধান নাটক। বাংলা নাটকের বিকাশের দ্বিতীয় পর্যায়ে লক্ষ করা যায় যখন সমাজ সচেতনতা, দেশাত্মবোধ এবং আর্থ-রাজনৈতিক বাস্তবাতার প্রেক্ষিত অনুসরণ করে নাট্যরচনা শুরু হল, তখন নিপীড়িত-নির্যাতিত, শোষিত ও অধিকার বঞ্চিত দেশবাসীর হৃদয়ে আশার আলো জ্বলে উঠল। এই চেতনার বাস্তব প্রতিফলন দেখা যায় হরিচরণের 'নক্সা' নাটকে। এটি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের রাজনৈতিক পটভূমিতে রচিত হয়েছিল।

এরপর তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক 'অদৃষ্ট' ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তাঁর নিজস্ব প্রযোজনা ছাড়াও এই নাটকটিও স্থানীয় সৌখিন রঙ্গমঞ্চে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। দিনাজপুর পত্রিকার সূত্রে এই সংবাদটি জানা যায় এইভাবে— ''হরিচরণ সেন কৃত কয়েকখানি নাটকের অভিনয় খুবই সুন্দর হইয়াছে। হরিচরণ বাবুর অদৃষ্ট নাটক মুদ্রিত হইবার সংবাদ আমরা পাইয়াছি। তাহার সীতারাম, অরুন্ধুতী ও লজ্জা যন্ত্রস্থ। নতুন প্রণীত অরুন্ধতীর রিহার্সেল চলিতেছে। এই পুস্তকগুলির আভাস ও সমালোচনা আমাদের ভবিষ্যতে প্রবল বাসনা রহিল। সংক্ষেপে এক্ষুণে এই মাত্র বলিতে পারি যে, হরিচরণ বাবুর সাফল্য দিনাজপুরবাসী প্রত্যেকেরই গৌরবের বিষয়।" (মাসিক দিনাজপুর পত্রিকা, ভাদ্র সংখ্যা, ১৩১৩ সাল)

'মায়ের ডাক' নাটকটিরও মঞ্চস্থ হওয়ার সম্বন্ধে একটি মূল্যবান মন্তব্য দিনাজপুর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়— ''রঙ্গমঞ্চে শ্রীযুক্ত হরিচরণ সেনের প্রণীত মায়ের ডাক উপরি উপরি ৪ শনিবারের যত শ্রোতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে মফস্বলে আর কোন নাটকের পক্ষে এ সৌভাগ্য হয় নাই। প্রতি রাত্রিতে থিয়েটার গৃহ শ্রোতায় পূর্ণ হইত। অভিনয়ের পক্ষে নাটকখানি সময়োপযোগী হইয়াছে। গ্রন্থাকারের সহিত অনেক মতের ঐক্য নাও হইতে পারে কিন্তু তিনি যেভাবে চরিত্র বিন্যাস করিয়াছেন তাহাতে চরিত্র মাত্রই বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। রঙ্গমঞ্চে মায়ের ডাক দেখিবার জিনিস হইয়াছে।"[৪০] (মাসিক দিনাজপুর পত্রিকা, ফাল্গুন মাঘ, ১৩১৪ সাল)

এই নাট্যসংস্থার আগ্রহ লক্ষ করা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পৌরাণিক নাটকের প্রতি। এই সময়ে 'ডায়মণ্ড জুবিলী ড্রামাটিক ক্লাবে'-এ যে সব নাটকগুলি অভিনীত হয়েছিল, তার মধ্যে অন্যতম ও উল্লেখযোগ্য ছিল— 'চন্দ্রশেখর', 'পাণ্ডব গৌরব', 'বিল্বমঙ্গল', 'সীতারাম', 'জনা', 'চৈতন্যলীলা', 'বুদ্ধচরিত', 'অহল্যাবাঈ', 'কংসবধ', 'কর্ণার্জ্জুন' ইত্যাদি পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটক। তবে এই কালপর্বের ক্ষেত্রীপাড়া (কালীতলার অংশ) মঞ্চের লক্ষণীয় বিষয় হল গ্যাস লাইটের আলোয় নাটক অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত অধ্যুষিত ব্যক্তিবর্গরাই ছিলেন স্থায়ীমঞ্চের জন্য প্রধান ও স্থায়ী দর্শক।

দিনাজপুরের প্রথম নাট্যশালা 'ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটার হল' সবেমাত্র একদশক স্থায়ীরূপে চলাকালীন অবস্থায় শিল্পগোষ্ঠীর মধ্যে কোন্দলের জেরে বা মতের অমিল ঘটায় তৃতীয় নাট্যগোষ্ঠী ও দিনাজপুরের দ্বিতীয় রঙ্গালয় বা নাট্যশালারূপে ১৯১৩ খ্রিস্টব্দে দিনাজপুর নাট্যসমিতির জন্ম হয়। দিনাজপুর শহরের বাহাদুর বাজার মহল্লায় স্টেশন রোডের পূর্বধারে নাট্যসমিতির ভবন অবস্থিত। এই প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ভার বহন করেন জমিদার রায় রাধাগোবিন্দ রায়চৌধুরী ও নাট্যশালার প্রয়োজনীয় জমি দান করেছিলেন গোলকুঠীর মালিক শিশির প্রসাদ চৌধুরী। 'ডায়মণ্ড জুবিলী হল' থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসা দলের নেতা ভুপাল চৌধুরী এই মঞ্চের একজন দক্ষ অভিনেতা ও মঞ্চ পরিচালনার সামগ্রিক দায়িত্ব পালন করেন। তবে একথা প্রাসঙ্গিক যে, দুটি নাট্যশালাই পাশাপাশি অবস্থিত থেকে সমান উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে নাট্যাভিনয় তথা নাট্যচর্চা চালিয়ে গিয়েছিল। যতদূর জানা যায় ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ২১ শে জুন রবিবার 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে দিনাজপুর নাট্যসমিতির যাত্রা শুরু হয়। এই মঞ্চের দ্বারোদ্ঘাটন করেন তৎকালীন জেলা কালেক্টর মি. হ্যারউইড। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহারাজা গিরিজানাথ রায় ছাড়াও উকিল বরদা গাঙ্গুলী, গুপ্ত এস্টেটের জ্যোতিষচন্দ্র গুপ্ত, ডাক্তার তারকেশ্বর চক্রবর্তী, ডাক্তার যামিনী সেন, গিরিজামোহন নিয়োগী, জমিদার সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, ক্ষিতিশচন্দ্র রায়চৌধুরী, হরিপদ ঘটক, মারহামাত (মারুমিঞা) হোসেন, নিশিকান্ত রায়চৌধুরী, অন্নদাচরণ দত্ত, প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ জেলার গণ্যমান্য ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ।

এই সময়ে দিনাজপুর নাট্যসমিতির একটি স্মরণীয় ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে তাঁর রচিত 'নিষ্কৃতি' ও 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের নাট্যাভিনয়। এই প্রসঙ্গে 'মাসিক দিনাজপুর পত্রিকা'র (সপ্তবিংশতিভাগ ১০ম সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩২৭) সূত্রে জানা যায় যায়— ''শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়- সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'নিষ্কৃতি' ও 'চরিত্রহীন' দুইখানি শ্রীযুক্ত ভূপালচন্দ্র সেন নাটকাকারে লেখেন। স্থানীয় নাট্য সমিতিতে তাঁহার

অভিনয় হইয়াছিল। এই দুই নাটকের অভিনয় দেখাইবার জন্য চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে আমন্ত্রণ করায় ১১ই আষাঢ় প্রত্যুষে দিনাজপুরে আগমন করেন। ১৩ ই আষাঢ় ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটার গৃহে সাহিত্য সভার এক অধিবেশন হয়। তাহাতে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উপস্থিত ছিলেন।"[৪১]

দিনাজপুর নাট্যসমিতির প্রভাবশালী অভিনেতা ভুপাল চৌধুরী অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'নিষ্কৃতি' উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন এবং স্বীয় উপন্যাসের নাট্যরূপ প্রদর্শনের জন্য লেখককে আমন্ত্রণ জানান। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে মফঃস্বল শহরের মঞ্চে নাটক দেখার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং অভিনয় সপ্তাহ উদ্বোধন করার লক্ষ্যে তিনি যথাদিনে দিনাজপুরে আসেন। দিনাজপুর নাট্যসমিতির মঞ্চে ভুপাল চৌধুরীর নিজস্ব প্রযোজনায় নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। তখন আষাঢ় মাসের বর্ষামুখর রাত হলেও লেখকের আগমনের সুবাদে দর্শকাসন ভরে যায় এবং নাটকটির অভিনয়ও হয় অসাধারণ। এই নাট্যাভিনয় দেখে লেখক মুগ্ধ হন তাঁর রচিত উপন্যাসে নাট্যরূপের শিল্পনৈপুণ্যে ও সার্থক মঞ্চরূপ দেখে। তিনি বলেছিলেন— ''দিনাজপুরের শিল্পীরা শুধু অভিনয়ে দক্ষ নন— এঁরা কলমেও সমান সিদ্ধহস্ত।"

শরৎ বাবুকে এই নাট্যাভিনয় ভালো লাগায় তিনি কলকাতা প্রত্যাবর্তন করার নির্ধারিত সূচী বাতিল করে পরের দিনও থেকে যান এবং একই নাট্যাভিনয় দেখেন। এরপর সপ্তাহব্যাপী নাটকটি অভিনীত হয়। দিনাজপুরবাসীর পক্ষ থেকে তৃতীয় দিবসে অমর কথাশিল্পীকে নাগরিক সম্বর্ধনা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটার হলে আয়োজিত অভ্যর্থনা সভায় সভাপতির আসন অলংকৃত করেন তৎকালীন স্বনামধন্য কংগ্রেস নেতা ও দিনাজপুর পত্রিকার সম্পাদক প্রখ্যাত আইনজীবি যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী। উক্ত সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে দিনাজপুরের তরুণ মহারাজা জগদীশনাথ রায় বাহাদুরও উপস্থিত থেকে স্বাগত ভাষণ দান করেন।[৪২] (দিনাজপুর পত্রিকা, আষাঢ় সংখ্যা, ১৯২০ ইং)

আবার দিনাজপুর নাট্যসমিতির মঞ্চে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'চরিত্রহীন' ঔপন্যাসের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ হওয়ার প্রসঙ্গটি বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তাঁর 'নাট্যচর্চায় দিনাজপুর' নিবন্ধে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করে জানিয়েছেন— ''১৯২২ সাল (সালটি ১৯২১ হবে)। শীতের এক সন্ধ্যা। দিনাজপুরের নাট্যসমিতির হল জনাকীর্ণ। দর্শকাসনে অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। অভিনয় হচ্ছে শরৎবাবুর 'চরিত্রহীন'। নাট্যরূপ দিয়েছেন দিনাজপুরেরই ভুপাল সেন। বাংলাদেশে 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের এই প্রথম নাট্যরূপই নয়, প্রথম অভিনয়ও বটে। এই নাটক দেখে শরৎচন্দ্র উৎফুল্ল হয়ে বলেন; 'আপনার দুঃসাহস দেখে আমি অবাক হয়েছি। কলকাতাতেও কেউ 'চরিত্রহীনে'র নাট্যরূপ দিতে সাহসী হয়নি, অভিনয় করা তো দূরের কথা।' অভিনয় শেষে মুগ্ধ

শরৎবাবু পরের দিন অভিনেতাদের সাথে মিলিত হবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। যথাসময়ে দিনাজপুরের পাহাড়পুরের ভুপালবাবুর ভাড়া বাড়িতে নাট্যসমিতির শিল্পীদের সাথে শরৎচন্দ্রের এক বৈঠক হয় সকালবেলা। তৎকালীন দিনাজপুরের মঞ্চের প্রতিভাবান নট গিরিজা নিয়োগীকে লক্ষ করে শরৎবাবু বলেন 'আপনিই তো আমার উপেন করেছেন। আপনার অভিনয় আমার ভাল লেগেছে, তবে একটু দরাজ হলে আরও ভাল হত।' ভূপালবাবুকে বলেন, ''সতীশ কে করেছিল?'' ভূপালবাবু সতীশ পাঠককে দেখিয়ে দেন। শরৎবাবু বলেন, ''এই আমার সতীশ করেছেন, তার উপরে পড়েছে হিন্দু কার্লিং হেয়ার।'' পাশে বসে থাকা প্রফুল্ল রায় মহাশয়কে (১৯০৮-১০ সালে মোহনবাগানের নামকরা খেলোয়াড়) দেখিয়ে বলেন আমার সতীশ হবে এই রকম। এই রকম বড় আঙ্গুল, বড় চেয়াল। প্রশ্ন করেন, 'কিরণময়ীর পাট কে করেছে?' ভূপালবাবু কুলদা দাসকে দেখিয়ে দেন। শরৎবাবু কৌতুক করে বলেন, ''আপনি কি বেছে বেছে সব পার্ট দিয়েছেন। আমার কিরণময়ী হবে একজন যে জল খেলে গলা দিয়ে জল দেখা যাবে।'' ... অভিনয়ের খুঁটিনাটি তাঁর চোখ এড়ায়নি। 'বিহারীর পার্ট কে করেছে? ভূপালবাবু আঙ্গুলে দেখিয়ে দেন শরৎ (তিন বাবু) গুপ্তকে। শরৎবাবু বলেন, ''এই একটা পার্ট আমাকে খুশি করেচে সব দিক দিয়ে। আমি তো অনেক গুরু-চেলা দেখেছি, কিন্তু টানে (গাঁজার) এমন সিদ্ধ আমার চোখে পড়েনি। (সতীশকে গাঁজার কল্কেতে বিহারীর আগুন ধরিয়ে দেবার বিষয়টি)। তুমি এ বিদ্যা কোথা থেকে রপ্ত করলে? ভায়ার নামখানা কি?'' ভূপালবাবু জানালেন শরৎ গুপ্ত। কৌতুকপ্রিয় মানুষ দুটির চোখ আবার নেচে উঠলো। ... দেখলেন মশাই নামে কাম। এরকম নাম ছাড়া টানে সিদ্ধ হওয়া মুশকিল।'' যদিও শরৎবাবু এই অভিনয়ের সমালোচনা করেন তবু অভিনয় যে ভালো হয়েছে তা অকপটে স্বীকারও করেন। যাবার আগে বলে যান— ''আপনাদের অভিনয় দেখে, ভূপালবাবুর সাহস দেখে, আমি সত্যিই খুব খুশি হয়েছি। দিনাজপুরের নাটকের নাম আছে, এজন্যই আবার এসেছিলাম।''[৪৩]

এছাড়াও দিনাজপুরের নাট্যসমিতির প্রথম পর্বের অভিনেতাদের মধ্যে যাঁরা খ্যাতনামা ও যশস্বী হয়েছিলেন শরৎচন্দ্র দাস, ক্ষিতিশচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীশচন্দ্র গুপ্ত, অবিনাশ বাগচী প্রমুখ এবং পার্শ্বচরিত্রের উল্লেখযোগ্য অভিনেতারা হলেন— মহেন্দ্র দাস, মুকুন্দবিহারী দাস, পূর্ণভূষণ সেনগুপ্ত, শচীন ব্যানার্জী, সুবোধ রায়, রেবতীরঞ্জন রায়, মুকুন্দ সেন, মনা চক্রবর্তী, মণি কুণ্ডু প্রমুখ। দিনাজপুর নাট্যসমিতির মঞ্চে শুরুর পর্বে অর্থাৎ ১৯১৩-১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অভিনীত অন্যতম নাটকগুলি হল— জয়দ্রথ, 'প্রফুল্ল', 'মহামায়া', 'ফুল্লরা', 'সীতা', 'সিন্ধু-বিজয়', 'কর্ণার্জ্জুন', 'কিন্নরী', 'দেবালা দেবী', 'আবু হোসেন', 'প্রতাপাদিত্য', ' ভীষ্ম', 'দুর্গাদাস', 'কুব্জ দরজী', 'পরদেশী', 'আলিবাবা', 'সীতার বনবাস', 'প্রহ্লাদ চরিত্র', 'জনা', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'সোনায় সোহাগা', 'রেশমী রুমাল', ' য্যায়সা কি

ত্যায়সা' ইত্যাদি জনপ্রিয় ও মঞ্চসকল পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটক। দিনাজপুর শহরে নাটকের ঐতিহ্যবাহী শিল্পসংস্থা বলতে 'দিনাজপুর নাট্যসমিতি'কেই বোঝায়। এই নাট্যসমিতি একটি অ্যামেচার প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও বিভাগ পূর্বকালে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের জন্ম লগ্ন থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তৎকালীন কলকাতা কেন্দ্রিক কমার্শিয়াল বা প্রফেশনাল থিয়েটারে অভিনীত প্রায় সব উল্লেখযোগ্য নাটকের মঞ্চায়ন করেছে সাফল্যে সঙ্গে। সে সব নাটকের মঞ্চায়নের মান কলকাতার নাটকের চেয়ে কোন অংশেই কম বলা যায় না।[৪৪] এই সব নাটকের অভিনয় নীতিতে ও প্রযোজনায় দলগত অভিনয়ের জায়গায় মুখ্য অভিনেতাকেন্দ্রিক প্রবণতার ফলেই তা ছিল অনেকটা কলকাতার পেশাদার মঞ্চে গিরিশ যুগের কাছাকাছি। অভিনয় রীতিতে লক্ষ করা যায় কম্বুকণ্ঠে বলিষ্ঠ বাচনভঙ্গি, ধীর লয় ও মেলোড্রামা সুলভ অভিব্যক্তি সম্পন্ন। সেই সঙ্গে সাদা উইংস ও চিত্রাঙ্কিত 'ব্যাক ড্রপ' সহযোগে সেট নির্মাণ এবং আলোক প্রক্ষেপনের ক্ষেত্রে 'প্যাট্রোম্যাক্স' লণ্ঠন এর ব্যবহার প্রচলিত ছিল।

দিনাজপুর নাট্যসমিতির নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে বিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে গুণগত পরিবর্তন শুরু হয়। তখন নাটকের পৃষ্টপোষকতার ভূমিকায় জমিদার শ্রেণীর উপস্থিতি ক্রমে ক্রমে লাঘব পায় এবং টিকিট বিক্রি করে নাটকের প্রদর্শনী স্থায়ী রূপ গ্রহণ করে। এর আগে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে টিকিট বিক্রির প্রথা ছিল। নিয়মিতভাবে প্রতি শনিবার অভিনীত নাটক শুরু হয়েছে রাত দশটায় এবং শেষ হয়েছে প্রায় তিনটায়। মোটকথা দিনাজপুর নাট্যসমিতি অর্থনৈতিকভাবে বিত্তবান শ্রেণীর অনুদান থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে ও সেই সঙ্গে দর্শকবৃন্দের উপর নির্ভরশীল হতে শুরু করেছিল। তবে টিকিট বিক্রি করে অর্জিত অর্থ যৎ সামান্য হওয়ায় অপেশাদার অভিনেতাদের পারিশ্রমিক দেওয়া তো সম্ভব হতই না বরং অন্যান্য খাতে ব্যয়কৃত প্রযোজনা খরচের বড় জোর শতকরা ৪০ ভাগ। এর ফলে বিভিন্নভাবে চাঁদা তুলে ঘাটতির পুরো টাকাটাই পরিশোধ করা হতো। অর্থাৎ দিনাজপুর শহরের পরিপূর্ণরূপে পেশাদার থিয়েটার তৈরীর জন্যে যে ব্যাপক চাহিদা ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামো প্রয়োজন তা তখনও গড়ে ওঠেনি।

বিশের দশকে কলকাতার পেশাদার মঞ্চে শিশির কুমার ভাদুড়ীর আবির্ভাবের (১৯২৫-৩৮) প্রায় সমসাময়িককালে দিনাজপুরের নাট্যজগতের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক শিবপ্রসাদ করের আবির্ভাব হয়। নবযুগের আলোকে নাট্যাভিনয়ের জগতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তিনি নিজের পরিচয় দিলেন শিশির কুমার ভাদুড়ীর সার্থক অনুসারী রূপে। তাই দিনাজপুরের নাট্যশিল্পীরা শিবপ্রসাদ করের প্রিয় ডাকনাম রেখেছিলেন 'দিনাজপুরের শিশির ভাদুড়ী'। মোটকথা বাংলা নাট্যজগতে শিশির কুমার ভাদুড়ীর আগমন ঘটেছিল পুরাতনকে পেছনে বিদায় দিয়ে নবনাট্য যুগ নিয়ে তদ্রুপ দিনাজপুরের রঙ্গমঞ্চে নবযুগের তথা ক্লাসিক থিয়েটারের সঙ্গে সঙ্গে প্রতীকধর্মী বা সামাজিক নাটকের

চর্চাকে যথেষ্ট জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন ও শিল্প কৌশলে বাস্তবতার আনয়ন করে শিবপ্রসাদ কর দিনাজপুর থিয়েটারের প্রদীপ্ত সূর্যরূপে অভিহিত হয়েছিলেন। মোটকথা শিবপ্রসাদ কর ছিলেন দিনাজপুর নাট্যসমিতির বড় অভিনেতা, মঞ্চকর্মী নাট্যকার ও সর্বোপরি একটি প্রতিষ্ঠানের মতো।

শিবপ্রসাদ কর ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের পর নারী ভূমিকায় অভিনয় শুরু করেন। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে 'চাঁদবিবি' নাটকে নারী চরিত্রে অর্থাৎ মূলনায়িকা চাঁদবিবির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে প্রথম হাতে খড়ি লাভের তিন বছর পর তরুণ শিল্পী শিবপ্রসাদের দ্বিতীয় নাট্যাভিনয় ছিল 'মোঘল পাঠান' নাটকে আর একটি নারী ভূমিকায় অভিনয়। এই নাটকেও তাঁর অংশ ছিল কমলার ভূমিকায়। এই দুই নাটকে তাঁর অভিনয় কৌশল দর্শককুলকে মন্ত্রমুগ্ধ করার ফলে এই সময় থেকেই তাঁর মঞ্চ জীবনের যে সুদীর্ঘ যাত্রা শুরু হয়েছিল তা বিরামহীনভাবে এগিয়ে চলে। তবে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কলকাতায় নাট্যচর্চার জগত থেকে বহুদূরে মফঃস্বল জনপদে তথা নাট্যসাধনায় তিল তিল করে নিজেকে উৎসর্গ করে গেছেন এমন মঞ্চসাধক গুণীজনদের অন্যতম শিল্পী ও প্রযোজক ছিলেন শিবপ্রসাদ কর। এমনকি তিনি দিনাজপুরের নাট্যভিনয়ের জনক হরিচরণ সেনের পর দিনাজপুরের রঙ্গমঞ্চের কাণ্ডারী তথা কর্ণধারের আসন অলংকৃত করেছিলেন তাঁর সম্বন্ধে জেলার প্রখ্যাত নাট্যকার মন্মথ রায় যথার্থ বলেছেন— ''দিনাজপুরের রঙ্গমঞ্চের শেষ কীর্তিস্তম্ভ ছিলেন শিবপ্রসাদ কর। শুধু অভিনেতা রূপে নয়, নাট্যকার রূপেও। তাঁর রচিত পৌরাণিক নাটক 'স্বর্ণলঙ্কা' বাদেও তাঁর রচিত অন্যতম উল্লেখযোগ্য নাটকের নাম ছিল প্রতিষ্ঠা। তিনি কিছুকাল দিনাজপুর পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন।''[৪৫] দিনাজপুর নাট্যসমিতির হীরক জয়ন্তী স্মরণিকা, ১৯৭৪)

অসাধারণ পর্যায়ের বহু নিবেদিত প্রাণ নাট্যকর্মী সৃষ্টিতে দিনাজপুর নাট্য সমিতির কৃতিত্ব ছিল অপরিসীম। এই নাট্যসমিতির ১৯২৫-১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রধান চরিত্রাভিনেতা হিসেবে শুরু হয়েছিল শিবপ্রসাদ করের নাট্যজীবন এবং তিনি সব ধরনের চরিত্র ও অভিনয়ের অসাধারণ নৈপুণ্য ও দক্ষতা প্রদর্শন করেন। তাঁর পাশাপাশি অন্যান্য সার্থক মঞ্চসফল অভিনেতারা হলেন শ্রীশচন্দ্র (টুনু) গুপ্ত, সুধীর চন্দ্র রায়, কালিয়াকান্ত রায়, ক্ষিতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, নারায়ণ বন্ধু সরকার, রমাপতি বাবু, হিরন্ময় বাবু, বিভূতি চাঁদ প্রমুখ। বিশের দশকের মাঝখানে অংশ গ্রহণ করেন জিতেন মজুমদার, সতীশচন্দ্র (থোকা) গুপ্ত, রমেশ দত্ত, প্রভাত দাশগুপ্ত (ফটিক), আমিনুর রহমান (বুলুভাই), রাজেন (সুশীল) তরফদার, শ্রীকুমার রায়, মণি সেন, তুলসীচাঁদ, ধীরেন্দ্র (ধীরু) নারায়ণ ঘোষ, গুরুদাস তালুকদার, কেষ্ট নন্দী, রতন মাস্টার, রাধিকা আইচ, সত্যপদ রায় প্রমুখ। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে মাঝামাঝিতে নাট্যসমিতির মঞ্চে যোগ দেন মনু দাশগুপ্ত, বিমল দাশগুপ্ত, সুলতান সরকার, অরনেন্দু নন্দী, বিন্দোলের জমিদার কামিক্ষ্যা চ্যাটার্জী, হিরন্ময় ভট্টাচার্য, সুশীল সেন, মন্মথ দত্ত, অমিয় সেন

প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝিতে মঞ্চে নারী শিল্পীর পদচারণা শুরু হলেও ষাটের দশকে তাদের অধিকার সুনিশ্চিত হয়। এই সময়ের সুপ্রশংসিত অভিনেত্রী ছিলেন মতী নন্দী।

নাট্যসমিতির মঞ্চে এসময়ে (১৯২৫-১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ) যে সব পৌরাণিক নাটক অভিনীত হয়েছে সেগুলি হল— 'হরিশ্চন্দ্র', 'কর্ণার্জুন', 'ফুল্লরা', 'বৃত্তাসুর', 'সীতা', 'শ্রীকৃষ্ণ', 'উত্তরা', 'শ্রীদুর্গা', 'চাঁদ সদাগর' এবং শিবপ্রসাদ রচিত 'রাবণ' (পরে নামকরণ হয় 'স্বর্ণলংকা') প্রভৃতি। এরপর এ সংস্থার মঞ্চে ঐতিহাসিক নাটকগুলি অভিনীত হতে থাকে। যথা— 'রাণা' প্রতাপাদিত্য', 'কেদার রায়', 'আলমগীর', 'সিরাজউদ্দৌলা', 'সাজাহান', 'রাজানন্দকুমার', 'সুলতান', 'পলাশীর পরে', 'মিশর কুমারী', 'দেবী চৌধুরাণী', 'রণজিৎ সিং', 'হায়দার আলি', 'টিপু সুলতান' ইত্যাদি। দিনাজপুর নাট্যসমিতির মঞ্চে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে থেকে ১৯৪০-৪২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে শুরু হয় সামাজিক নাটক। তবে লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটক থেকে সামাজিক নাটকে প্রবেশের ক্ষেত্রে এক গুণগত পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে প্রধানত একটি কেন্দ্রিয় চরিত্রের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু দিনাজপুর নাট্যসমিতিতে এই সময় যে সব সামাজিক নাটক মঞ্চস্থ হয় সেগুলির বিষয়বস্তু পুরোটা আধুনিক না হলেও গঠন প্রকৃতির দিক থেকে প্রধানত 'টীমওয়ার্ক ভিত্তিক' ছিল। সামাজিক ধারার নাটকে, দেখা যায় নায়কের পাশাপাশি অন্যান্য পার্শ্বচরিত্রগুলির সমবেত সংহত ও সহযোগী অভিনয়ের সর্বাধিক প্রাধান্য অর্থাৎ মুখ্য অভিনেতা কেন্দ্রিক প্রবণতার জায়গায় দলগত অভিনয়ের গুরুত্ব বেড়ে যায়। এই সময়ে দিনাজপুর মঞ্চে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ শুরু হয়। এর ফলে দিনাজপুর নাট্যসমিতির মঞ্চস্থ সামাজিক নাটকগুলিতে অভিনেতাদের বিকাশের সুযোগ বৃদ্ধি পায় বা যোগ্য পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। এমনকি দেশভাগের পর এই অভিনেতারা অন্যত্র গিয়ে সংশ্লিষ্ট নাট্যজগতে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। দিনাজপুর নাট্যসমিতির মঞ্চে এই সময়ে অভিনীত সামাজিক নাটকগুলির মধ্যে অন্যতম হল— দিনাজপুরের বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রবোধ মজুমদার রচিত 'শুভযাত্রা' এছাড়াও 'রামের সুমতি', 'মেঘমুক্তি', 'বৈকুণ্ঠের উইল', 'পালের পদধ্বনি', 'দুই পুরুষ', 'কালিন্দী', 'পথের শেষে', 'বিষবৃক্ষ', 'পতিব্রতা', 'পরদেশী', 'চন্দ্রশেখর', 'পি ডব্লু ডি', 'রীতিমত নাটক', 'কঙ্কাবতীর ঘাট', 'ব্যাপিকা বিদায়' ইত্যাদি।

নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ীর হাতে মফস্বল শহরে বিদ্যমান নাট্যদলগুলো নতুন আঙ্গিকের অভিনয় কৌশলের তালিম নেওয়ার সুবাদে লক্ষ করা যায় যে, উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে দিনাজপুর জেলার উদ্যোগে এসে তিনি দিনাজপুর নাট্যসমিতির মঞ্চে 'সীতা'র অভিনয় দেখাবেন স্থির ছিল।

কিন্তু তাঁর শারীরিক অসুস্থতা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ বশত সেই উদ্যোগ পণ্ড হয়ে যায়। (১৯৩২ সনের মাসিক দিনাজপুর পত্রিকা) এই ঘটনার পরপরেই 'দিনাজপুর নাট্যসমিতি'র উদ্যোক্তারা ১৯৪১-৪২ খ্রিস্টাব্দের কোন একসময়ে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁরই রচিত 'দুই পুরুষ' নাটকের অভিনয় দেখার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। এবং তারাশংকর আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। তৎকালীন কলকাতার পেশাদার নাট্যমঞ্চের বিশাল নামজাদা অভিনেতারা (ছবি বিশ্বাস) এই নাটকে অংশ নিয়েছিলেন। বহুভাবে চিন্তাভাবনা করে অভিনয়ের কাঠামো দাঁড় করিয়ে এই নাটকের প্রধান চরিত্র নটু বিহারীর নাম ভূমিকায় স্বয়ং শিবপ্রসাদ অংশ গ্রহণ করেন। যদিও তিনি নারীচরিত্রের ভূমিকায় বেশীরভাগ নাটকে অভিনয় করেছেন। তাই পুরুষ চরিত্রের ভূমিকায় এটিই ছিল তাঁর প্রথম পদক্ষেপ। অবশেষে প্রতীক্ষিত অভিনয়ের দিনটি সমাগত হয় এবং অসম্ভব কৌতূহল নিয়ে নাটকটি দেখেন বাংলা সাহিত্যের অমর কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। অসাধারণ অভিনয় হয়। কিন্তু অভিনয় দেখে লেখক খুশি হতে পারেন নি। বিশেষ করে শিবপ্রসাদের অভিনয় তাঁর পছন্দ হয়নি। প্রথম রাত্রির অভিনয় নিয়ে তারাশঙ্করের মতানৈক্য দেখা দেওয়ায় তরুণ নাট্যশিল্পী শিবপ্রসাদ কর ছাড়ার পাত্র নন। তিনি কথাশিল্পীকে অনুরোধ করেন পরের দিন নাটকটির অভিনয় দেখার জন্য এবং তারাশঙ্কর রাজী হন। তখন দিনাজপুরের রঙ্গমঞ্চের দক্ষ যাদুকর মঞ্চশিল্পী রীতিমতো সজাগ ও সচেতন ভাবে মহড়া দিয়ে নটু বিহারীর নতুন একটি চরিত্র চিত্রণ করে নিজেকে তৈরি করে নিয়েছিলেন। তাই দ্বিতীয় দিনের পুনরাভিনয় দেখে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বিস্ময়ে অবিভূত হলেন এই ভেবে যে, একই নাটকে, একই মঞ্চে, একই চরিত্রে একই নাট্যশিল্পীর পক্ষে বিভিন্নরূপে উদ্ভিন্ন হওয়ায়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নিজের নাটকের দিনাজপুরের নাট্যসমিতির মতো মফস্বল শহরের রঙ্গমঞ্চে সার্থক মঞ্চায়ন দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গর্বের সঙ্গে জানিয়েছেন— ''দিনাজপুরের নাট্যমঞ্চের কোন তুলনা নেই বাংলার ইতিহাসে, আমার লেখা নাটকের এমন অপূর্ব অনবদ্য মঞ্চায়ন শুধু দিনাজপুরের মঞ্চেই সম্ভব অন্য কোথাও নেই। আমি যা' নই, আমার নাটকে যা' নাই— নাটকীয় চরিত্রের সেই অনাবিষ্কৃত অসাধারণত্বের সত্ত্বা আমি যেন আজ খুঁজে পেলাম। দিনাজপুরের মঞ্চে নিজের লেখা নাটক দেখতে এসে। শিল্পীর চোখে প্রকৃত নিজকে দেখতে পেয়ে আজ ধন্য হলাম আমি। দিনাজপুরের শিল্পীরা আমার নমস্য।''[৪৬] এই প্রসঙ্গে এই নাটক অভিনয়ের একজন প্রত্যক্ষদর্শী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তাঁর 'নাট্যচর্চায় দিনাজপুর' (পশ্চিম দিনাজপুর বার্তা, ১৩৯০) নিবন্ধে জানিয়েছেন— ''... দেশভাগের কিছু আগে সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় দিনাজপুরে আসেন। ... অভিনীত হয় তারাশঙ্করের 'দুই পুরুষ'। সুশোভনের ভূমিকায় সতীশচন্দ্র গুপ্ত'র অভিনয় দেখে তারাশঙ্কর অভিভূত হয়ে বলেন, 'সুশোভনের ভূমিকা আবার দেখবো।' নাটক শেষে স্টেজে

উঠে আনন্দে তিনি সতীশচন্দ্র গুপ্তকে আলিঙ্গন করেন। স্টেজেই নটু বিহারীর ভূমিকার (শিবপ্রসাদ কর অভিনীত) সামান্য সমালোচনাও করেন তিনি। এই উৎসবে প্রত্যেক দর্শককে একটি করে সুদৃশ্য কাগজের জাপানী হাত পাখা উপহার দেওয়া হয়। ... " আবার লেখিকা নীলা কর তাঁর 'কাছের মানুষ নট ও নাট্যকার শিবপ্রসাদ কর' শীর্ষক নিবন্ধে 'দুই পুরুষ' নাটকের অভিনয় প্রসঙ্গে শিবপ্রসাদ করের অভিনয়ের উক্ত প্রসঙ্গ উল্লেখ করার পর লিখেছেন— ''তবে সুশোভনের ভূমিকায় সতীশচন্দ গুপ্ত'র অভিনয়ের অনেকটাই প্রশংসা করে তারাশঙ্কর বলেছিলেন, কলকাতার মঞ্চে সুনীল (জহর গাঙ্গুলী'র ডাকনাম ছিল সুনীল) সঠিক অভিনয় করলেও এখানে বসে ভাবলাম এভাবেও তো 'সুশোভন' চরিত্রে অভিনয় করা যায়।"[৪৭]

মোটকথা সেই সময় দিনাজপুরের নাট্যজগতে একক চরিত্রকেন্দ্রিক নাটক ও অভিনয় প্রথার অবসান হয়ে দলগত অভিনয়ের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রের সাথে পার্শ্বচরিত্রের অভিনয়ের গুরুত্বও লক্ষ করা যায়।

ত্রিশের দশকে লক্ষ করা যায় বাংলা সাহিত্য ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব দিনাজপুর তথা সমগ্র বাংলাদেশের নাট্যচর্চা বিশ্লেষণের জন্য অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমটি ছিল সচেতনতা বোধ, দ্বিতীয়টি হল কল্লোল যুগের প্রভাব। এই সময়ে দিনাজপুরের সাংস্কৃতিক জগতে সদ্য প্রতিষ্ঠিত 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘে'র দিনাজপুর শাখা পরোক্ষভাবে অভিঘাত হানে ও প্রভাব বিস্তার করে। দিনাজপুর কালীতলায় ভারতীয় গণনাট্য সংঘের শাখা নির্মিত হয়। এই গণনাট্য সংঘ নারীদের সর্বপ্রথম নাট্যমঞ্চে তুলে এনেছিলেন, যা দিনাজপুরের প্রাতিষ্ঠানিক নাট্যজগতের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ১৯৪৪খ্রিস্টাব্দে ২৪ অক্টোবর মাঠে মঞ্চ বেঁধে বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটক অনুষ্ঠিত হয়। এর পাশাপাশি দিনাজপুর শাখা 'ফ্যাসি বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ' তখন শহর ও গ্রামাঞ্চলেও ব্যাপকভাবে গণসঙ্গীতের প্রচার শুরু করে। অপরদিকে কল্লোল যুগের নবীন সাহিত্যিকদের নতুন জীবন জিজ্ঞাসার প্রতিফলন ঘটতে দেখা যায় মন্মথ রায়ের নাটকে। মন্মথ রায় ছিলেন কল্লোল পত্রিকার একজন লেখক এবং তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হওয়ার সুবাদে নাটক সৃষ্টির জগতে প্রচলিত সামাজিক রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং নিষিদ্ধ ও নিন্দিত জীবনের প্রতি প্রবল আগ্রহ ও সহানুভূতি প্রকাশ করে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করলেন। তাই একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থেকেছে কলকাতার পেশাদার রঙ্গমঞ্চ, সেই প্রেক্ষিতে দিনাজপুরের উদীয়মান নাট্যকার মন্মথ রায় এবং গণনাট্য সংঘের নাটক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নাট্যকার মন্মথ রায়ের লেখা 'মুক্তির ডাক' (১৯২৩) নাটকটি তৎকালীন নাট্যসমালোচকগণ মূল্যায়ন করে প্রকৃত অর্থে প্রথম সার্থক একাঙ্কিক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

তাঁর রচিত 'কারাগার' (১৯৩০) নাটকটি তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ নাটক বলে ঘোষিত হয়। সেই সময়ের বাংলা নাট্যজগতে গিরিশ ঘোষ যেখানে পৌরাণিক কাহিনী আক্ষরিক অর্থে তুলে ধরেছেন অথচ মন্মথ রায় সেখানে পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করে সমকালীন সমাজের বিরুদ্ধে উদার মানবতাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। দিনাজপুরের তথা বাংলার প্রখ্যাত নাট্যকার মন্মথ রায় সেই সময়ে দিনাজপুর নাট্যসমাজের সঙ্গে যুক্ত থেকে তাঁর রচিত নাটকের মঞ্চায়ন ও অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করে দিনাজপুরের নাট্যজগতকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে মতিয়ার রহমান সরকার বলেছেন— ''বিভাগ পূর্বকালে দিনাজপুর নাট্যসমিতির সাথে তাঁর যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। তার রচিত বহু নাটক অভিনীত হয়েছে দিনাজপুর নাট্যসমিতির মঞ্চে। বহু নাটকে তিনি উপস্থিত থেকেছেন দর্শকের সারিতে এবং যতদূর জেনেছি নাট্যসমিতির মঞ্চে দু'একবার তিনি অভিনয়েও অংশ নিয়েছেন।''[৪৮]

সেই সময়কালে দিনাজপুর নাট্যসমিতির মঞ্চে মন্মথ রায়ের রচিত 'সাবিত্রী', 'চাঁদ সওদাগর', 'কারাগার', 'সতী' ও 'খনা' নাটক এবং শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যরূপ 'বৈকুণ্ঠের উইল', 'রামের সুমিতি', 'মহেশ' ইত্যাদি মঞ্চস্থ হয়। দিনাজপুরের নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হল বিভাগ পূর্ব যুগ পর্যন্ত (প্রাক্-স্বাধীনতা) বিভিন্ন পর্যায়ে সংগঠনের মাধ্যমে তা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। অজস্র নিপুণ অভিনেতা সৃষ্টি শিল্পী ও দর্শকের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন, দর্শকদের উদ্বুদ্ধ করে তোলা, নিয়মিতভাবে নাট্যানুষ্ঠান এবং নাটক ও নাট্যাঙ্গনকে সমকালীন যন্ত্রণাকাতর জীবন ঘনিষ্ঠতায় সম্পৃক্ত করার মধ্য দিয়ে বহুমুখী প্রচেষ্টা ও নানা উদ্যোগ গ্রহণ করে নাট্যসমিতি দিনাজপুরের নাট্যচর্চায় ঐতিহাসিক ও যুগোপযোগী দায়িত্ব পালন করে প্রাক্-স্বাধীন যুগপ্রবাহের গণ্ডী অতিক্রম করে সাম্প্রতিককালেও স্বমহিমায় বিরাজমান।

অবিভক্ত দিনাজপুর জেলা সদরের নাট্যচর্চার পাশাপাশি মহকুমা ঠাকুর গাঁয় সেই চর্চার রেশ লক্ষ করা যায়। বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার প্রথম মহকুমা হিসাবে ঠাকুর গাঁ মহকুমার সৃষ্টি হয় বৃটিশ সরকার কর্তৃক জেলা প্রশাসনের সুবিধার্থে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে মহকুমা পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার সুবাদে। যতদূর জানা যায় ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে ঠাকুর গাঁ মহকুমা প্রথম গঠিত হলেও ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে তা লুপ্ত হয় এবং ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে ঠাকুর গাঁ মহকুমা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। ঠাকুর গাঁ-এর সৌখিন নাট্যগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল জমিদার শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই শুধুমাত্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের দ্বারা। বিশেষ করে ব্রিটিশ সরকারের আমলা কুলের দ্বারা সৃষ্ট হয়। বিংশ শতকের প্রথমার্ধে যুগের প্রভাবে প্রভান্বিত হয়ে ঠাকুর গাঁ শহরে আধুনিক বিনোদন চর্চার থিয়েটারের সূত্রপাত হয়। অর্থাৎ ১৯১০ (মতান্তরে ১৯১১) খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জের

রাজ্যাভিষেকের স্মৃতি স্বরূপ ঠাকুর গাঁ শহরে প্রথম যে বিনোদনমূলক ক্লাবটি গঠিত হয় তার নাম 'জর্জ করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব' এবং সেই সঙ্গে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় সম্রাট পঞ্চম জর্জের স্বর্গীয় পিতা সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের স্মৃতির স্মরণে এই সংস্থার স্থায়ী থিয়েটার হল নির্মিত হওয়ায় নবনির্মিত হলটির নামকরণ হয় 'এডোয়ার্ড মেমোরিয়াল হল'। সদ্যগঠিত নাট্যসমিতির পরিচালনার জন্য একটি পরিচালন কমিটি গঠন করা হয়, যার সভাপতি হন সরকারি উচ্চপদস্থ আমলা অর্থাৎ এই মহকুমার প্রশাসনিক প্রধান আধিকারিক ভবানীচরণ সেনগুপ্ত ও সম্পাদক হলেন দ্বিতীয় আধিকারিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এই সমিতির প্রথম পরিচালনা পরিষদের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন উকিল ত্রৈলোক্য বাগচী, রায়সাহেব উকিল বঙ্কুবিহারী সরকার, উকিল রায় সাহেব গিরিন্দ্রচন্দ্র গুহচৌধুরী, উকিল মহেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, উকিল সতীশচন্দ্র গুহঠাকুরতা, মোক্তার রাজকিশোর দে ধারা, মোক্তার হরিশ্চন্দ্র মুখার্জী প্রমুখ। তদানীন্তন দিনাজপুরের ব্রিটিশ কালেক্টর মি. ওয়াডেল আনুষ্ঠানিক ভাবে ভবনটির শুভ উদ্বোধন করেন। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক কেদারনাথের প্রযোজনায় গিরিশ ঘোষের 'জনা' নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে প্রথম নাট্যাভিনয়ের সূত্রপাত হয়। প্রথম অভিনীত নাটকে অংশগ্রহণকারী মঞ্চসফল ও দক্ষ অভিনেতারা হলেন— মহেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, রাজকিশোর দে ধারা, হরিপদ চৌধুরী, কুলদা ব্যানার্জী, গণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, প্রযোজক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। এটি ছিল ঠাকুর গাঁ শহরে অভিনীত প্রথম নাট্যাভিনয়। এবং এই নাটকে অংশগ্রহণকারী অভিনেতারাই ছিলেন ঠাকুর গাঁ রঙ্গমঞ্চের আদি শিল্পী। এই সংস্থার দ্বিতীয় প্রযোজিত নাটক ছিল 'প্রিয়ম্বদা'। নাটকটি রচনা করেন সেই সময়ের প্রখ্যাত নট ও নাট্যকার মহেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। তিনি নিজে একজন বিশিষ্ট নাট্য-অভিনেতাও ছিলেন। এরপর মঞ্চস্থ হয় যথাক্রমে— 'বিল্বমঙ্গল', 'রঘুবীর' ও 'রণবীর' প্রভৃতি পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটক। ঠাকুর গাঁ এর 'জর্জ কোরোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব'-এর নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে ১৯১০ থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিশেষ কোন গুণগত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়নি। এই ড্রামাটিক ক্লাবের অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের একচ্ছত্র প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। এই সংস্থার যে সব নাটক উদ্বোধন পর্ব থেকে শুরু হয়ে পরবর্তীকালে অবিচ্ছিন্ন ধারায় এই মঞ্চে জ্ঞানপ্রিয়তা ও দর্শকবৃন্দের মনোরঞ্জনের তাগিদে একাধিকবার অভিনীত হয় তার মধ্যে ছিল— 'রিজিয়া', 'হরিশ্চন্দ্র', 'আলীবাবা', 'সাজাহান', 'কিন্নরী', 'নিমাই সন্ন্যাস', 'প্রফুল্ল', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'সুদামা', 'শিবরাত্রি', 'সীতা', 'সিরাজদ্দৌলা', 'রাবণ' (স্বর্ণলঙ্কা), 'সাবিত্রী', 'কারাগার', 'পলাশী', 'পারাপার', 'মন্ত্রশক্তি', 'খনা', 'আলমগীর', 'বাংলার মসনদ', 'রীতিমত নাটক', 'মাটির ঘর', 'সোনার বাংলা', 'বেজায় রজড়', 'পি ডব্লিউ ডি', 'রিহার্সেল', 'পরপারে', 'দুইসতীন' প্রভৃতি।

এই নাট্যসংস্থার প্রথম পর্বে প্রযোজক হিসাবে পরিচালক ও অভিনেতা যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তাঁরা হলেন— কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত রায়, হীরালাল সেন, নকুলচন্দ্র গুপ্ত, নলিনীকান্ত পালিত, শচীন্দ্রনাথ গুহঠাকুরতা, অমিয় সেন, নির্মলচন্দ্র পাল, নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরিদাস গুহঠাকুরতা প্রমুখ। এছাড়াও এই রঙ্গমঞ্চের সার্বিক উন্নতি ও অবিচ্ছন্ন গতিতে নাট্যাভিনয়কে অগ্রগতির পথ প্রদর্শনের কাজে প্রচুর নিবেদিত কর্মী ও কর্মকর্তা আপ্রাণতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার ঠাকুর গাঁ মহকুমায় প্রসেনিয়াম ভিত্তিক নাট্যচর্চার জন্ম হয় সৌখিন নাট্যগোষ্ঠীর মাধ্যমে। প্রথমদিকে টিকিট বিক্রয়ের বদলে প্রবেশপত্র ইস্যুর দ্বারা নাটক প্রদর্শনের ব্যবস্থা হলেও পরবর্তীকালে যখন টিকিট বিক্রির ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় তখন লক্ষ করা যায় ঠাকুর গাঁ শহরেও সৌখিন থিয়েটার পেশাদার থিয়েটারে পরিণত হয়েছে। তবে দিনাজপুর থিয়েটারের মতো ঠাকুর গাঁ থিয়েটারের শিল্পীগণও এ্যামেচার হিসাবে থেকে যায়। এর মূল কারণ হিসাবে বলা যায় টিকিট বিক্রয়ের ফলে অর্জিত টাকার নাটক মঞ্চস্থ করার প্রয়োজনীয় খরচা দিয়ে পোষাত না। এর ফলে এই থিয়েটারের ব্যবসায়িক ক্ষেত্র কোনদিনই গড়ে ওঠেনি। তাই আর্থিক যোগান আসতো সরকারি কর্মকর্তাদের অনুদান ও পৃষ্ঠপোষক তথা সদস্যবৃন্দের চাঁদা থেকে। তবে দেখা যায় ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে নাট্যশিল্পীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে এই নাট্যসংস্থা বিভক্ত হয়ে পড়েও নতুন একটি নাট্যসংস্থা 'ফ্রেণ্ডস অ্যাসেসিয়েশন ক্লাব' এর জন্ম হয়। এই নতুন নাট্যসংস্থার সংগঠন গড়ার নেতৃত্বে ছিলেন স্থানীয় বারের মহুরী সম্প্রদায়। এই 'ফ্রেণ্ডস অ্যাসোসিয়েশন ক্লাব' এর উদ্যোগে মাত্র কয়েকটি নাটক অভিনীত হয়েছিল। যথা—'অযোধ্যায় বেগম', 'মোঘল সিংহাসন', 'সাবিত্রী', 'হা মা কা' ইত্যাদি। ঠাকুর গাঁ মঞ্চের প্রধান পুরুষ হরিদাস গুহঠাকুরতার (গোসাই দা) নাটকে হাতে খড়ি হয় এই নাট্য সংস্থায় এবং পরবর্তীকালে প্রাক্-স্বাধীনতাকাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন ঠাকুর গাঁর নাট্যজগতের সুদক্ষ প্রযোজক, পরিচালক ও শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। ঠাকুর গাঁর নাট্যচর্চায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে হরিদাস গুহঠাকুরতার নাম। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে একটা সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফ্রেণ্ডস অ্যাসেসিয়েশন ক্লাব অবলুপ্তি হয় এবং জর্জ করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবের সঙ্গে একযোগে নাট্যচর্চা শুরু করে। জর্জ করোনেশন থিয়েটারের নবগঠিত কমিটির সভাপতি হলেন বিশিষ্ট ব্যক্তি ড. তারানাথ রায়চৌধুরী এবং সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত হলেন প্রখ্যাত নাট্যাভিনেতা নির্মল গুহঠাকুরতা।

মহকুমা ঠাকুর গাঁ শহরের নাট্যাভিনয় ও নাট্যমঞ্চের অনন্য গৌরবের কথা এই যে, স্বানামধন্যা অভিনেত্রী পদ্মশ্রী তৃপ্তি মিত্রের হাতে খড়ি হয় করোনেশন হলের নাট্যমঞ্চে। তৎকালীন সময়ে মঞ্চে মেয়েদের আবির্ভাবের অনেক বাকী ছিল। অর্থাৎ নাট্যাভিনয়ে নারী চরিত্রের ভূমিকায় নারী শিল্পীদের আবির্ভাব ছিল বিপজ্জনক। তৎসত্ত্বেও শৈশবে পিতার সঙ্গে করোনেশন হলে নাটক

প্রদর্শনের ফলে তাঁর নাট্যভিনয়ের প্রতি আকর্ষণ জাগে এবং ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে এই মঞ্চে 'সুদামা' নাটকের শিশু কৃষ্ণ চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করে প্রশংসিত হন। এরপর করোনেশন মঞ্চের বেশ কিছু নাটকে অসাধারণ অভিনয় করে সুনাম অর্জন করেন ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। জানা যায় ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে ঠাকুর গাঁ ছেড়ে কলকাতায় এসে নাট্যচর্চার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার সুবাদে কলকাতা হয় তাঁর কর্মস্থল এবং বিখ্যাত নট ও নাট্যকার শম্ভু মিত্রের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়ে তার সর্বজন পরিচিত নাম হয় তৃপ্তি মিত্র। তাঁর নিজের কথা তুলে ধরা হল— ''বহুদিন পর কলকাতার একটা ভিন্ন অবস্থার মধ্যে, দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় একটা ভিন্ন মিশরের জন্য অভিনয় শুরু করা— গণনাট্য সংঘে যোগ দেয়া—অভিনেত্রী হওয়া গেল (দিনাজপুর নাট্যসমিতির হীরক জয়ন্তী স্মরণিকা, ১৯৭৪)।" তাই একথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় যে, দিনাজপুরের নাট্যাঙ্গনে নাট্যচর্চা, অভিনয় জীবন শুরু করে তৃপ্তি মিত্র উভয় বাংলার এবং দেশের বাইরে অভিনয় জগতে একটি স্বনামধন্যা প্রতিষ্ঠিতা ও যশস্বী অভিনেত্রীর পরিচয় লাভ করেছিলেন। তাই তৃপ্তি মিত্রের সম্বন্ধে 'থিয়েটার পত্রিকা'য় বলা হয়েছে—''আমাদের জন্য বিশেষ একটা গর্ব যে, তৃপ্তি মিত্র জন্মেছিলেন আমাদের দেশের ঠাকুর গাঁয়ে ১৯২৫ এ। কৈশর কেটেছে তাঁর এখানে (থিয়েটার ১৯৮৯)। নাট্যাভিনয়ে তিনি ছিলেন অসামান্য শিল্পী-নাট্যজগতের একটি প্রতিষ্ঠান। এই উপমহাদেশের গণ্ডী ছড়িয়ে তাঁর অভিনয় খ্যাতি ইউরোপ, আমেরিকা দেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯৮৯-এর ২৮ শে মে কলিকাতায় তাঁর জীবনাবসান হয়।"[৪৯] (থিয়েটার পত্রিকা, ১৯৮৯ সংখ্যা) এছাড়াও এই ঠাকুর গাঁ মঞ্চে দিনাজপুরের তথা বাংলার শ্রেষ্ঠ নট ও নাট্যকার মন্মথ রায় তাঁর রচিত 'সাবিত্রী' নাটকে পিতার চরিত্রে অভিনয় করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। সেই সঙ্গে জানা যায় তিনি এই মঞ্চে তাঁর 'খনা' নাটকেও অভিনয় করেছিলেন। মন্মথ রায়ের পাশাপাশি লক্ষ করা যায় নাট্যসমিতির কর্ণধার, বিশিষ্ট নট ও নাট্যকার শিবপ্রসাদ কর এই মঞ্চে বেশ কয়েকটি নাটক অভিনয় করেন। এর মধ্যে শিবপ্রসাদের নিজের রচিত 'স্বর্ণলঙ্কা' (রাবণ) নাটকটি অভিনয় ঠাকুর গাঁ মঞ্চে ভীষণ জাঁকজমকভাবে ও আড়ম্বরের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল বলে জানা যায়।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশ বিভাগের ফলে ঠাকুর গাঁর নাট্যাঙ্গন অচল ও শ্লথ হয়ে পড়ে। এই দুঃসময়ে ঠাকুর গাঁর নাট্যসংগঠন আবার পুনর্জীবিত হয়ে ওঠে কিছু নিবেদিত নাট্যমোদী শিল্পীর অদম্য উদ্যোগ ও উৎসাহে। এই সময় পূর্বপাকিস্তানে জর্জ করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাবের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'কায়েদে আজম মেমোরিয়াল হল এণ্ড ড্রামাটিক ক্লাব'। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই সংস্থার পুনরায় নাম বদল করে রাখা হয় 'ঠাকুর গাঁ ড্রামাটিক ক্লাব'। তবে রাজনৈতিক উত্থানপতনের কবলে পড়ে এই নাট্যসংস্থার নাম বদলালেও ঠাকুর গাঁর বিশিষ্ট নাট্যশিল্পী

ও নাট্যপ্রিয় ব্যক্তিদের সমন্বয়ে 'ঠাকুর গাঁ ড্রামাটিক ক্লাব' কঠোর পরিশ্রম ও সাধনার মাধ্যমে নাট্যচর্চার প্রবহমানতাকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে দিয়েছেন।

ব্রিটিশ শাসনামলে বৃহত্তর বা অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার একটি অন্যতম ও গুরুত্বপূর্ণ মহকুমা হল বালুরঘাট। যতদূর জানা যায় বালুরঘাট ১৮০৭-১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে পতিরাম থানার অধীনে ছিল। দিনাজপুর জেলার শতবর্ষে ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে চক্‌ভবানী এলাকাতে মুন্সেফী চৌকি স্থাপনের ফলে ব্রিটিশ সরকারের নথিপত্রে বালুরঘাটের নাম পাওয়া যায়। জেলা প্রশাসনের সুবিধার জন্য ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের ৩১ অক্টোবর বালুরঘাট মহকুমায় পরিণত হয়। জেলার বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক শ্রীকালীকর মহাশয় বালুরঘাটের 'দধীচি' পত্রিকার উত্তরাধিকার বালুরঘাট সংখ্যায় 'পুরনো সেই দিনের কথা এবং বালুরঘাট' প্রবন্ধে বালুরঘাটে মহকুমা সদর হিসাবে প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গে লিখেছেন— ''... বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের অন্যতম শরিক রণেন্দ্রমোহন ঠাকুরের বিশাল জমিদারী পিরালী কাছারি ও জেলার বিখ্যাত মেলার জন্য মহকুমা শহর হিসাবে পতিরামের দাবি সরকারের কাছে অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল। ... জমিদার রণেন ঠাকুর কোনক্রমে ওই জায়গা দিতে রাজি হলেন না। ... অন্যদিকে বালুরঘাটে মহকুমা করার জন্য বেশ কিছু উদ্যোগী ব্যক্তিত্ব এগিয়ে আসেন। ... দুই জমিদার রাজেন্দ্র সান্যাল ও বাহাদুর সিং জমি দিতে রাজি হলেন। ... মহকুমা শহরের জন্য সরকারকে দেওয়া হবে যে জমি তা দেখে (জেলা কালেক্টার) সন্তুষ্ট হন এবং বালুঘাটকেই মহকুমা সদর শহর বলে ঘোষণা করেন। ...'' এই সময় ফুলবাড়ি থেকে মুন্সেফী উঠে যাওয়ায় ফুলবাড়ি থানা বালুরঘাট মহকুমার অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রথম যে ৮ টি থানা নিয়ে এই মহকুমা গড়ে উঠেছিল সেগুলি হল— বালুরঘাট, কুমারগঞ্জ, ফুলবাড়ি, গঙ্গারামপুর, তপন, ধামৈর হাট, পোর্শা ও পত্নীতলা।[৫০] মোটকথা ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে সরকার স্থানীয় কিছু জমিদার ও জোতদার শ্রেণির মানুষের দাবিতে এখানে মামলা মোকদ্দমা করার জন্য একটি মুন্সেফী চৌকি স্থাপনের ফলে প্রশাসনিক কাজকর্ম নির্বাহের জন্য অন্যান্য জায়গা থেকে বহু ভাগ্যান্বেষী, বিশিষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ বালুরঘাটে আসেন। গ্রাম নির্ভর মফস্বল শহর বালুরঘাটের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিকাঠামো এবং শিল্প-সংস্কৃতি চর্চার সূচনায় বহিরাগত মানুষগুলির অবদান ছিল অবশ্যই অনস্বীকার্য। এরপর ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে অখ্যাত বালুরঘাট মহকুমা শহর হিসেবে ঘোষিত হয়ে জেলা সদর হওয়ার সুবাদে রাজশাহী, দিনাজপুর, বগুড়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জায়গা থেকে অনেক মানুষ এখানে এসে এই শহরের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সুস্থ্য সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। বালুরঘাট মহকুমার নাটকের জগতের সূচনা তথা নাট্যচর্চার শুরু রাজা জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতা নয় বরং সাধারণে মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিশেষ করে উকিল, মোক্তার,

মহুরি ও তৎকালীন সরকারের প্রশাসনিক আমলারা ও কর্মচারীবৃন্দের দ্বারা। বিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্বে বালুরঘাটে অস্থায়ী মঞ্চে 'বিল্বমঙ্গল' ও 'বেহুলা লখীন্দর' নাটক অভিনয়ের মধ্যদিয়ে নিয়মিত নাট্যচর্চা শুরু হতে দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে জেলার বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক সন্তোষ নন্দী 'দধীচি' পত্রিকার উত্তরাধিকার বালুরঘাট সংখ্যায় 'পাদ প্রদীপের আলোয় নাটকের কয়েক দশক' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন— ''বালুরঘাটে নাটক অভিনয়ের সূচনা হয়েছিল প্রয়াত উকিল সতীন্দ্রনাথ বসুর পিতার বহির্বাটিতে আল্‌গা স্টেজে অভিনীত 'বিল্বমঙ্গল' নাটকের মধ্য দিয়ে। নাট্যমন্দিরের যশস্বী অভিনেতা প্রয়াত জীবু রায়ের পিতা প্রয়াত মতিলাল রায়ের মূল উদ্যোগে। নাটকটি চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। জনসমাগমও হয়েছিল প্রচুর। এই সব বিংশ শতাব্দীর শুরুর সময়ের ঘটনা।... ১৯০২ সালে এখানে আল্‌গা স্টেজে 'বেহুলা লখীন্দর' নাটক অভিনীত হয়েছিল এবং এতে বেহুলার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন রাধাচরণ ভট্টাচার্য।''[৫১] তাই লক্ষ করা যায় বালুরঘাট মহকুমা শহরে উপনীত হওয়ায় সেকালের বিনোদনের গণ্ডী পেরিয়ে পাশ্চাত্য নাট্যাভিনয়চর্চার উদ্দেশ্যে উকিল শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর রায়, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ সান্যাল, শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ, শ্রীযুক্ত মতিলাল মুখোপাধ্যায়, উকিল শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত অধিকারী প্রমুখ সমাজসেবী সংস্কৃতিমনস্ক ও নাট্যামোদী ব্যক্তিবর্গ স্টেজ বেঁধে নাটক করার প্রয়াসী হন। এছাড়াও এই মহতী উদ্যোগে তৎকালীন মহকুমা হাকিমও এগিয়ে এসেছিলেন। মোটকথা সকলে সমবেত হয়ে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে 'বালুরঘাট থিয়েট্রিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন' নামে প্রথম শিল্প সংস্কৃতি চর্চামূলক একটি নাট্যসংস্থা (সমিতি) গঠন করলেন। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শ্রী রাধাচরণ ভট্টাচার্য, সহকারী সম্পাদক শ্রী উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ম্যানেজার শ্রীশশাঙ্ক শেখর রায়, স্টেজ ম্যানেজার শ্রী চিন্তাহরণ মুখোপাধ্যায়, সহকারী স্টেজ ম্যানেজার বিভূতিভূষণ সান্যাল, মোশন মাস্টার শ্রী আশুতোষ ঘোষ, বিজনেস ম্যানেজার শ্রী ব্রজেন্দ্র বসু ও সভ্য শ্রী নলিনীকান্ত বাগচী, শ্রী চিন্তাহরণ মুখার্জী, রামযাদব চক্রবর্তী, যোগেন্দ্র সিংহ, রমেশচন্দ্র তরফদার, যদুনাথ ঘোষ, বিজয় সাহা, ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, মতিলাল মুখোপাধ্যায়, সত্যচরণ দাস, সুরেশ সেন, যতীন্দ্র মিস্ত্রি, দুর্গনাথ দাস, রামলাল মিত্র, সুরেন্দ্র বাগচী, নলিনীকান্ত অধিকারী, নলিনীকান্ত চক্রবর্তী, প্রসন্নকুমার নিয়োগী, যোগেশচন্দ্র রায়, ভবানীমোহন কর, রামরতন দাসবৈরাগী (জটা বৈরাগী) প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে কেন্দ্র করে এই সংস্থার প্রথম কার্য সম্পাদক কমিটি গঠিত হয়েছিল। এবং সভাপতি ছিলেন পদাধিকার বলে মহকুমা শাসক। এই সংস্থার প্রথম নাটক 'হরিরাজ' ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারি অভিনীত হয়। যতদূর জানা যায়, ভারত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের করোনেশন তথা রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে উৎসবের জন্য সংগৃহিত চাঁদার উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে 'দ্য এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল ড্রামাটিক ক্লাব' তৈরি হওয়ায় ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে 'থিয়েট্রিক্যাল

অ্যাসোসিয়েশনে'র নাম পরিবর্তন করে 'দ্য এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল ড্রামাটিক ক্লাব' রাখা হয়। এক্ষেত্রে অনেকটা ঠাকুর গাঁর স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের রীতির অনুসরণে লক্ষ করা যায় ব্রিটিশ তথা ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জের অভিষেক বর্ষে তাঁর প্রয়াত পিতা সপ্তম এডওয়ার্ডের স্মৃতি রক্ষার্থে প্রতিষ্ঠিত হয় এই নাট্যসংস্থা। এই প্রসঙ্গে জেলার বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও নাট্যকর্মী কালী কর 'দধীচি' পত্রিকার 'উত্তরাধিকার বালুরঘাট' সংখ্যায় তাঁর 'পুরনো সেই দিনের কথা এবং বালুরঘাট' নিবন্ধে বলেছেন— ''নাটকের শহর বালুরঘাটে সম্ভবত প্রথম নাটক মঞ্চায়নে অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন মতিলাল রায় ও সুরেন বাগচী। দু-চারজন সঙ্গীসাথী নিয়ে এঁরা কংগ্রেস পাড়ার রামেন্দ্রনাথ বসুর বাড়ির সামনে স্টেজ করে 'বিল্বমঙ্গল' নাটক মঞ্চস্থ করেন। ... সময়ের তালে তালে জন্ম নিল থিয়েট্রিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন। সপ্তম এডোয়ার্ডের করোনেশন উপলক্ষে তোলা উদ্ধৃত টাকা দিয়েই তাঁর স্মৃতিতে থিয়েট্রিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের নাম হল এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল ক্লাব। উত্তরবঙ্গের প্রচীনতম নাট্যচর্চার তীর্থক্ষেত্র বালুরঘাটে নাট্যমন্দিরের এই হল জন্ম ইতিহাস।''[৫২] ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের প্রথম মহাযুদ্ধে সরকারী নির্দেশে War Fund নামে একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সভাপতি হিসাবে মহকুমা প্রশাসনিক প্রধান আবুল মোজাফ্ফর আহমেদের নেতৃত্বে এবং স্থানীয় সমাজসেবী উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্যকে সম্পাদক করে ব্রিটিশ সরকারের জন্য টাকা সংগ্রহের কাজ সহ এই নাট্যসংস্থার মঞ্চ নির্মানের কাজে প্রধান ভূমিকা পালন করে। এরপর যুদ্ধ শেষে জেলা কালেকটর মি. অর. ব্রুমফিল্ড ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে 'দ্য এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল ড্রামাটিক ক্লাব'-এর হলের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। বিভাগ পূর্বকাল পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত নাট্যশালাটির এই নামই ছিল। তবে পরবর্তীকালে দেশ (বাংলা) বিভাগ হয়ে স্বাধীনতা অর্জনের ফলে অবিভক্ত বা বৃহত্তর দিনাজপুরের পশ্চিমাংশ ভারতভুক্ত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়। আসলে স্বাধীনতা লাভের কারণে নাট্যশালাটির নাম পরিবর্তনেরও প্রশ্ন দেখা দেওয়ায় ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১১ই আগস্ট নাট্যশালার সংবিধান সংশোধন করে বালুরঘাট নাট্যমন্দির নামকরণ করা হয়। জেলার নাট্যকার মন্মথ রায় স্থায়ী নাট্যশালা রূপে 'বালুরঘাট নাট্যমন্দির' সৃষ্টির প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে তিনি নিজেও যে ছাত্রাবস্থা থেকে যুক্ত ছিলেন তা তাঁর স্মৃতিকথায় তিনি ব্যক্ত করেছেন এইভাবে— ''বালুরঘাটে একটা স্থায়ী নাট্যশালা গড়ে তোলার জন্যে এঁরা সবাই উঠে পড়ে লাগলেন। সরকারী হাসপাতালের উত্তর দিকে একখণ্ড জমি এরজন্য সংগৃহীত হল। খুব কাছেই ছিল ইঁটখোলা। সেখান থেকে ইঁট বয়ে এনে তা থিয়েটারের জমিতে ফেলার কাজে আমরা পাড়ার ছেলের দল মেতে উঠলাম এবং আজ আমার এ বয়সেও পরম গর্ব যে, ওখানে পরে যে স্থায়ী নাট্যশালাটি গড়ে উঠলো তার ভিত-এ আমার বয়ে আনা ইঁট আর তার মেহনৎ আছে, এবং এটাও আমার পরম আনন্দ যে, জনসাধারণের সম্পত্তি ঐ স্থায়ী নাট্যশালাটি

প্রথমে, 'এডোয়ার্ড মেরোরিয়াল ড্রামাটিক ক্লাব' এবং পরে দেশ স্বাধীন হবার পর 'নাট্যমন্দির' নামে আজও সগৌরবে বর্তমান।"[৫৩]

মোটকথা স্বাধীনতা লাভের পর ''এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল ড্রামাটিক ক্লাব' বদলে গিয়ে বর্তমানে বালুরঘাট নাট্যমন্দির নামে রূপান্তরিত হয়। 'বালুরঘাট নাট্যমন্দির' প্রতিষ্ঠার বিষয়ে এই নাট্যশালার সম্পাদক ও বিশিষ্ট নাট্যকর্মী নরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'সেকাল থেকে একাল' নাট্যচর্চা: পশ্চিম দিনাজপুর— বালুরঘাট নাট্যমন্দির' প্রবন্ধে বলেছেন— ''সমিতি তৈয়ারী হলো। অভিনেতারাও প্রস্তুত, কিন্তু নাটক মঞ্চস্থ করবার প্রেক্ষাগৃহ ও মহল্লা দেবার স্থানের অভাব সকলকেই ব্যাকুলিত করে তুললো। ১৯১০ সালে মহকুমা হাকিম হয়ে এলেন ঁসুরেশচন্দ্র সেন। ... নাট্যমন্দির তৈরারী মানসে এক বিঘা জমি সমিতিকে দান করলেন শশাঙ্ক রায়। ইং ১৯১৩ সালের ২৭শে ডিসেম্বর নাট্যমন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হলো। ১৯১১ সাল থেকে তদানীন্তন বালুরঘাটবাসীর একান্ত উৎসাহ, উদ্দীপনা, অধ্যবসায় ও সমবেত প্রচেষ্টায় অর্থসংগৃহীত হলো এবং নাট্যমন্দির ধীরে ধীরে নির্মিত হলো। শোনা যায় ছাত্রবৃন্দ উপরোক্ত ইটভাটা থেকে ইট বহন করে নাট্যমন্দিরের মাঠে দিয়ে আসতো প্রত্যহ স্কুল ছুটির পর। ইং ১৯১৪ সালের ২৪শে মার্চ নাট্যমন্দির (স্টেজ ও প্রেক্ষাগৃহ) তৈয়ারীর জন্য প্রথম প্রস্তাব পাশ করা হয়। ইং ১৯২০ সালের ১৭ই মে তারিখে নাট্যমন্দির (প্রেক্ষাগৃহ সহ) তৈয়ারী সম্পূর্ণ হয়েছিল।"[৫৪]

বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের প্রথম হীরক জয়ন্তী (১৯৭৩) উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকা সূত্রে জানা যায় যে, এই নাট্যশালার প্রথম পর্যায়ের অর্থাৎ ১৯০৯-১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যাঁরা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন তাঁরা হলেন— শ্রীরাধাচরণ ভট্টাচার্য, শ্রীপ্রতাপচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীললিতচন্দ্র, শ্রীমন্মথ রায়, শ্রী সুরেন্দ্রনাথ সিংহ, শ্রীনরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজীবু রায়, শ্রীজীতেন্দ্রনাথ সমাজদার ও শ্রীসনৎকুমার সেন প্রমুখ।

বালুরঘাট নাট্যমন্দিরে শুরু থেকে অর্থাৎ ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের প্রথমার্ধ থেকে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই মঞ্চে সমকালীন প্রচলিত ধারা অনুসরণ করে প্রথাগত পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক উল্লেখযোগ্য পূর্ণাঙ্গ নাট্য-প্রযোজনাগুলি হল— 'হরিরাজ', 'সাবিত্রী', 'পাণ্ডবগৌরব', 'বলিদান', 'প্রহ্লাদ চরিত্র', 'সাবিত্রী সত্যবান', 'দেবলাদেবী', 'দেবাসুর', 'কংসবধ', 'বঙ্গের রাঠোর', 'রঘুবীর' প্রভৃতি। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে জেলার স্বনামধন্য নাট্যকর্মী তথা নাট্যমন্দিরের প্রথম পর্বের বিশিষ্ট সম্পাদক নরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'সেকাল থেকে একাল: নাট্যচর্চা : পশ্চিম দিনাজপুর— বালুর নাট্যমন্দির' শীর্ষক প্রবন্ধে বাস্তব চিত্র তুলে ধরে বলেছেন— ''নাট্যমন্দিরের প্রথম বিশ বৎসরের ঘটনাবলী আলোচনা করলে প্রথম নজর আসে তদানীন্তন নাটক কিভাবে অভিনীত হত। বেশিরভাগ নাটকই

ছিল পঞ্চাঙ্ক। প্রতি নাটক হত অন্ততঃ ৫ থেকে ৬ ঘন্টা সময়ের প্রয়োজন হত— এবং তদানীন্তন দর্শকগণ দীর্ঘস্থায়ী নাটকই পছন্দ করতেন। ... নাট্যমন্দির সৃষ্টির প্রথম বিশ বৎসরের মধ্যে যে সমস্ত নাটকের কথা মনে পড়ছে তার মধ্যে মনমোহন বাবুর 'রিজিয়া', নিশিকান্ত বাবুর 'বঙ্গেবর্গী', ক্ষীরোদ চন্দ্রের 'নরনারায়ণ' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।" সেই সঙ্গে প্রথম পর্বের অভিনয় রীতির সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন—''নাটক আরম্ভ হবার পূর্বে প্রথমে Concert বাজ্‌তো অন্ততঃ ১৫ মিনিট, তারপর ঘন্টা বাজলে ড্রপসিন উঠলে সাধারণত: dancing boys দের দিয়ে একটা উদ্বোধনী সঙ্গীত হতো। তারপরের দৃশ্যে নাটক আরম্ভ হতো।... ক্রমে ক্রমে নাচগানের ব্যাপারটা উঠে গেছে এবং একেবারে নেই বললেই হয়।" এরপর তিনি উল্লেখ করেছেন— ''তারপর এল দ্বিতীয় বিশ বৎসর অর্থাৎ আমাদের যুগ। প্রথমেই পেলাম অপরেশ চন্দ্রের ''কর্ণার্জুন''। কলকাতায় গিয়ে নাটক দেখে আসা হলো। নটসূর্য্য অহীন্দ্র চৌধুরীর অর্জুন, শ্রদ্ধেয় তিনকড়ি চক্রবর্তীর কর্ণ, শ্রদ্ধাস্পদ নরেশ মিত্র মহদয়ের শকুনি দেখে এসে ও দৃশ্যপটাদি দেখে বুঝলাম ''কর্ণার্জুন'' নাটক বালুরঘাট নাট্যমন্দিরে অসম্ভব যতক্ষণ না রঙ্গমঞ্চ অন্ধকার করা যায়। নানাভাবে চেষ্টা হতে লাগল তারপর ঠিক হলো দুই wings -এ বাক্স বসিয়ে তার মাঝে হ্যাজাক লাইট দিয়ে play করা। প্রয়োজনে বাক্স বন্ধ করে দিলেই অন্ধকার। অন্ধকারে মাঝে মাঝে টর্চ ব্যবহার আলো ও আঁধারের ব্যবস্থা করা। কিছুদিন চলল কিন্তু সম্পূর্ণ কৃতকার্য হওয়া গেল না। ... তাই পূর্বেকার author -দের লেখা নাটক অনেকেই বাদ দিলেন। এরপর এল শ্রী শচীন সেনের যুগ। বন্ধুবর শ্রী নৃপেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য কলকাতা থেকে এসে বললেন ''তটনীর বিচার'' নাটক খুবই ভাল, জমজমাট। অভিনয় করে ও দেখে সকলেই আনন্দ পাবেন কিন্তু রঙ্গমঞ্চ সম্পূর্ণ অন্ধকার করে দৃশ্য পরিবর্তন না করতে পারলে মঞ্চ সফল সম্ভব নয়। যেহেতু একটি দৃশ্যের শেষ কথার রেশ টেনে পরবর্তী দৃশ্য আরম্ভ হবে। নানাভাবে চেষ্টা চললো— dark shifting করবার জন্য নানাভাবে মহড়াও চললো। ... সকলের সমবেত চেষ্টায় বইখানি মঞ্চস্থ হলো— বলাবাহুল্য আমি ঐ নাটকে ড. সেনের রোলে অবতীর্ণ হয়েছিলাম। নাটক দেখে সকলেই মুগ্ধ হলেন এবং প্রশংসাও করলেন। ব্যক্তিগত ভাবে আমি তৃপ্ত হলাম না। দেখলাম নরনারায়ণের দীর্ঘ অমিত্রাক্ষর ছন্দ চমৎকার হলেও সবাই যেন ভয়ে এগোচ্ছে না। এমনকি ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দ যেমন 'কর্ণার্জুনে' লেখা তাও যেন তেমন সকলে আদর করছে না। মূলকারণ নিজেদের অক্ষমতা— এটা কেউ প্রকাশ করছে না। তাই ওধরনের বই বাদ পড়ে গেল। তারপর 'সিরাজদ্দৌলা' মঞ্চস্থ হলো। এরপর সকলেই পরিবর্তন চাইল। এসে গেল বিধায়ক ভট্টাচার্য্যের লেখা— 'বিশ বৎসর আগে', 'মাটির ঘর' প্রভৃতি। বেশ কিছুদিন নাট্যজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করল—কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে না। এটা ১৯৩০ থেকে ১৯৫০ সালের ভিতরের অবস্থা।"

তারপর এই সময়কালে স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে সারাদেশ উদ্বেলিত। তখন নাট্যমন্দিরে মঞ্চে অভিনীত নাটক সম্বন্ধে তাঁর মূল্যবান মন্তব্য হল— ''দ্বিতীয় বিশ বৎসরের মাঝখানে এলো স্বদেশী আন্দোলন। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নানা বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও আমরা দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে শ্রদ্ধেয় মন্মথ রায় (টুকুদা)-র 'কারাগার', 'দেবাসুর', 'মীরকাশিম' এবং অন্যান্য লেখকের 'পথভ্রষ্ট', 'থামাও রক্তপাত' প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ করেছিলাম। মোটকথা কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালোভাবে গড়ে না ওঠলেও মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনে কষ্টসাধ্য কলকাতায় যাতায়াতের সুবাদে কলকাতার নাটকের কিছু প্রভাব এই জেলার নাটকেও পড়তে শুরু করে। এর ফলে কলকাতার মঞ্চের সফল ও জনপ্রিয় নাটক বালুরঘাট নাট্যমন্দির মঞ্চ সফলতার সঙ্গে অভিনীত হতে দেখা যায়।[৫৫] ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে নরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করার ফলে এখানকার নাট্যচর্চায় প্রবল জোয়ার আসে। তখন নাট্যমন্দিরের জরাজীর্ণ অবস্থা দূর করার জন্য বালুরঘাট সিনেমা হলের জন্য ভাড়া দেওয়ার শর্তে নির্দিষ্ট হয়। অর্থাৎ কল্যাণী টকিজের মালিক শ্রীরণজিৎ বসু মহাশয়কে দীর্ঘমেয়াদী lease দেওয়া হয়। বছরে ১৪ দিন নাট্যাভিনয়ের জন্য হলটি ব্যবহার করা যেতো। চল্লিশের দশকের শেষার্ধ পর্যন্ত নাটক দেখার জন্য কোন দর্শনী লাগত না। মূলতঃ নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে জড়িত অভিনেতা ও পৃষ্ঠপোষকবৃন্দের আর্থিক সহযোগিতায় নাটক মঞ্চস্থের ব্যয় ভার নির্বাহ করা হতো। এই সময়ে দর্শক ছিলেন উকিল-মোক্তার, উচ্চপদাধিকারী, সরকারী চাকরিজীবি, শিক্ষক-শিক্ষিকা, সম্ভ্রান্ত পরিবারের কিছু মানুষ ও পরবর্তী সময়ে কলেজে পাঠ রত কিছু বয়স্ক ছাত্রছাত্রী আর কিছু ফুটবল প্রেমী ও খেলোয়াড়। এদের অনেকের উৎসাহ ও প্রেরণায় লক্ষ করা যায় পাড়ায় পাড়ায় অস্থায়ী মঞ্চ বেঁধে নাট্যাভিনয় শুরু হয়। তখন নাট্যমন্দিরে কি অস্থায়ী মঞ্চে গ্রীনরুমের পর্দার পাশে প্রম্পটারের ভূমিকা খুবই মুখ্য ছিল। সেই সঙ্গে হ্যাজাকের সামনে রঙিন কাগজ এদিক সেদিক ফেলে মঞ্চে আলোকসম্পাতের কাজ চলত। এই সময় নাট্যমন্দিরে নাট্যচর্চায় দ্রুতগতি বেড়ে যায়। তখন দেখা যায় নরেশচন্দ্রের অসংখ নাট্য প্রযোজনায় নাট্যমন্দির বেশ উত্তাল। এর ফলে নাট্যমন্দিরের সম্পাদক নরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের যুগটি ছিল বালুরঘাট নাট্যমন্দিরে প্রযোজনায় নাট্যাভিনয়ে কিংবদন্তির যুগ। এছাড়াও মন্মথ রায়ের নেতৃত্বে এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল ড্রামাটিক হলে অনেক জনপ্রিয় নাটকের অভিনয় হয় এবং সে সব নাটকের অভিনয়েও তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। যথা— অপরেশ মুখোপাধ্যায়ের 'কর্ণার্জুন', ক্ষীরোদ প্রসাদের 'উলুপি', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান', রবীন্দ্রমোহন মৈত্রের 'মানময়ী গার্লস স্কুল' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটক।

এই সময়কালে যে সমস্ত নাট্যব্যক্তিত্ব বালুরঘাট মঞ্চের মঞ্চসফল অভিনেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা

লাভ করেছিলেন তাঁরা হলেন— রামযাদব চক্রবর্তী, আশুতোষ ঘোষ, চিন্তাহরণ মুখার্জী, গোবিন্দ গাঙ্গুলী, নরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ফণী মুখোপাধ্যায়, শান্তিরঞ্জন গুহ, ডা: ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, জীবু রায়, তুলসী চন্দ, হারান চন্দ্র সিংহ প্রমুখ নাট্যব্যক্তিত্ব বালুরঘাট নাট্যমন্দিরকে উজ্জ্বল করেছেন। পঞ্চাশের দশকের পূর্ব থেকেই এই নাট্যসংস্থায় নারী চরিত্রের ভূমিকায় পুরুষেরাই অভিনয় করতেন। স্ত্রী ভূমিকায় স্মরণীয় অভিনেতা ছিলেন দুর্গাদাসবাবু। বালুরঘাটের নাট্যচর্চায় যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়েছিলেন তাঁদের সম্বন্ধে নাট্যকার মন্মথ রায় তাঁর স্মৃতি কথায় বলেছেন— ''বালুরঘাটে তদানীন্তন যুবক এবং মধ্যবয়স্কদের মধ্যে থিয়েটার প্রীতিটা জোরালো হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এঁদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন দক্ষ অভিনেতা আশুতোষ ঘোষ, চিন্তাহরণ মুখার্জী, ক্লারিওনেট বাদক মতিলাল মুখার্জী এবং সংগঠক রূপে একজন কনট্রাক্টর শশাঙ্ক শেখর রায়। অন্যান্য উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন উকিল রাধাচরণ ভট্টাচার্য, মোক্তার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উকিলের মহুরি সুরেন্দ্রনাথ সেন, পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে ছিলেন ওখানকার শ্রেষ্ঠ উকিল নলিনীকান্ত অধিকারী, নাট্যকার মন্মথ রায়ের পিতা দেবেন্দ্রগতি রায় ও অন্যান্য বহু সভ্রান্ত ব্যক্তি।'' নাট্যমন্দিরের প্রথম পর্বেই ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নাট্যপরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য, নরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ফণী মুখোপাধ্যায়, মন্মথ রায় প্রমুখ।

নাট্যকার মন্মথ রায়ের মাধ্যমে বালুরঘাটের প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের রঙ্গমঞ্চের সাথে বিশেষ করে 'দিনাজপুর নাট্যসমিতির' ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায় এবং দিনাজপুর নাট্যসমিতির শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও নাট্যকার শিবপ্রসাদ কর প্রাক্- স্বাধীনতাকালে বালুরঘাট নাট্যমঞ্চের নাটকে অভিনয় করে গেছেন। তার নাট্যজীবনের যৌবন পর্বের এক বিশেষ সময়ে দুই বছরের জন্য বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন যখন এই নাট্যশালাটি চুড়ান্ত দূরবস্থার তথা বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যে পড়েছিল। এই অবস্থায় তিনি খুব শক্তহাতে সাংগঠনিক দক্ষতার জোরে নাট্যমন্দিরের সুস্থ ও সাবলীল পরিবেশ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। যতদূর জানা যায় ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে নাট্যকার মন্মথ রায় অধুনা বালুরঘাট নাট্যমন্দিরে সদস্য হন এবং সেই সঙ্গে বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের চতুর্থ সাধারণ সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে নাট্যকার মন্মথ রায় তাঁর স্মৃতিকথায় জানিয়েছিলেন— ''একসময় আমার বাবা এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ছিলেন বলে মনে পড়ছে, যদিও তিনি অভিনেতা ছিলেন না। আমার পরবর্তী জীবনে আমিও এর সম্পাদক ছিলাম বেশ কিছু দিন।''[৫৭]

'বালুরঘাট নাট্যমন্দির'ই ছিল দেশ বিভাগ পর্যন্ত তথা প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের বালুরঘাট মহকুমা নাট্যচর্চার একমাত্র পীঠস্থান— যাকে কেন্দ্র করে তৎকালীন নাট্যাভিনয় তথা নাট্যচর্চা প্রাণবন্ত হয়ে বৃহত্তর বা অবিভক্ত দিনাজপুর জেলা ও কলোনিয়াল রাজধানী কলকাতায় পরিব্যাপ্ত হয়ে

সমগ্র বাংলায় বিস্তার ও বিকাশ লাভ করেছিল। তাই দৃঢ় কণ্ঠে বলা যায় যে, সমগ্র উত্তরবঙ্গের নাট্যচর্চা ও নাট্য আন্দোলনে বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের অবদান উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয়।

আমরা জানি যে, উনিশ শতকের শেষার্ধে দিনাজপুর জেলা শহরে প্রথম আধুনিক থিয়েটারের সূচনা হয়ে তা ক্রমাগত চর্চার মাধ্যমে উন্নত পর্যায়ে পৌঁছেছিল। তাই বিশ শতকের দুই-এর দশকের দিকে লক্ষ করা যায়, দিনাজপুর জেলা সদর, দুটি মহকুমা যথা ঠাকুর গাঁ ও বালুরঘাট শহরে আধুনিক থিয়েটার চর্চার ধারা বা প্রসেনিয়াম ভিত্তিক নাট্যাভিনয় তথা নাট্যচর্চা প্রধান বিনোদনে পরিণত হয়েছিল। এবং এর পাশাপাশি এই শতকের দুই এর দশকের কোন এক সময় থেকে এই নাট্যচর্চার উৎসাহ ও জোয়ার গ্রামাঞ্চলের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাই বড় গঞ্জ বা গ্রামগুলিতে (বর্ধিষ্ণু জনপদ) শুরু হয়েছিল পাড়ার নাটক। বিশেষ করে জেলার কোন কোন থানা শহরে ও কিছু গ্রামে। এমনকি এই জেলার প্রত্যন্ত গ্রামগঞ্জেও নাটক মঞ্চস্থ করা ছিল এখানকার মানুষের নেশা।

বিংশ শতাব্দীর তিনের দশকের আগে গ্রামাঞ্চলের বিনোদনের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় যে, সৌখিন নাট্যাভিনয় তথা নাট্যচর্চার চেয়ে গ্রামবাসীদের বিনোদনের পুরোভাগে ছিল কবিগান, যাত্রাগান ও পালাগান প্রভৃতি সাংস্কৃতিক বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান। তবে যতদূর জানা যায়, এই তিনের দশকের শেষের দিক থেকে নাটকের অভিনয়ের তৎপরতা শুরু হতে দেখা যায় অধুনা দিনাজপুর জেলার কিছু থানা শহরে ও গ্রামে সেই সঙ্গে বিভাগপূর্ব জেলার কালিয়াগঞ্জ, রায়গঞ্জ প্রভৃতি থানায় এবং বালুরঘাট মহকুমার পার্শ্বস্থ বোয়ালদাড় গ্রামে এই শতকের তিনের দশকের প্রথম থেকেই নাটকাভিনয় শুরু হয় বলে জানা যায়।

বিংশ শতাব্দীর দুই-এর দশকে লক্ষ করা যায় যে, স্থায়ীনাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠার পূর্বে দিনাজপুর শহর ও জেলার বিভিন্ন গ্রামীণ জমিদারিগুলিতে ক্ষেত্র বিশেষে তিথিপর্ব উপলক্ষে মূলত দুর্গোৎসবের সময় মঞ্চবেঁধে নাটক মঞ্চস্থ করা শুরু হয়। যে সমস্ত গ্রামীণ বড় জমিদারের জমিদারীতে এই নাট্যাভিনয়ের উদ্যোগ দেখা গিয়েছিল সেগুলি হল—

ক. মালদুয়ার এস্টেট : ঠাকুর গাঁ, দিনাজপুর। দিনাজপুর শহর থেকে রুইয়ার লাইনে ঠাকুর গাঁ মহকুমাতে পীরগঞ্জ রেল স্টেশনে নেমে গরুর গাড়িতে মাইল পাঁচ-ছয় দূরে মালদুয়ার অবস্থিত। এই স্থানের উপর দিয়ে কুলিক নদী প্রবাহিত হয়েছে। জমিদার ছিলেন রাজা টঙ্কনাথ রায়। এই জমিদারের কর্মচারীদের পাকা ক্লাবঘর ছিল। এমনকি এখানে রবীন্দ্রজয়ন্তীও ১৯৪০-এর দশকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হত।

খ. হরিপুর এস্টেট : হরিপুর, দিনাজপুর। রায়গঞ্জ স্টেশনে নেমে গরুর গাড়িতে বিন্দোল হয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এখানকার জমিদার ছিলেন কুমার বিশ্বনেন্দু রায়চৌধুরী।

গ. চূড়ামন এস্টেট : চূড়ামন, দিনাজপুর। রায়গঞ্জ রেল স্টেশনে নেমে দক্ষিণ দিক বরাবর গরুর গাড়িতে করে যথাক্রমে দূর্গাপুর ছাড়িয়ে ১০-১২ মাইল পথ যেতে হত। এই জমিদারির সদর পরবর্তীতে দূর্গাপুরে স্থানান্তরিত হয়। এখানকার জমিদার ছিলেন ঘনশ্যাম চৌধুরী ও ভূপাল চৌধুরী।

ঘ. বাইন এস্টেট : বাইন, দিনাজপুর। রাজগঞ্জের পরের রেল স্টেশন কাচনাতে নেমে গরুর গাড়িতে করে যেতে হত নাগর নদীর ধারে বাইন এস্টেটে। এখানকার জমিদার ছিলেন ক্ষিতিশচন্দ্র রায়চৌধুরী।

এছাড়াও যে সমস্ত গ্রামীণ মাঝারি জমিদারের জমিদারিতে নাট্যাভিনয়ের তৎপরতা লক্ষ করা গিয়েছিল, সেগুলির মধ্যে ছিল—

ক. কর এস্টেট : গনেশতলা, দিনাজপুর। এখানকার জমিদার ছিলেন গোষ্ঠবিহারী কর ও শিবপ্রসাদ কর।

খ. মারনাই এস্টেট : মারনাই, দিনাজপুর। রায়গঞ্জ স্টেশনে নেমে গরুর গাড়িতে ১৫-১৬ মাইল দূরে মারনাই। এখানকার জমিদার ছিলেন মহেন্দ্রনারায়ণ পালচৌধুরী।

গ. গিরি-গোঁসাই এস্টেট : রায়গঞ্জ, দিনাজপুর। রায়গঞ্জ শহরের কুলিক নদীর ধারে বন্দর পাড়াতে গিরি গোঁসাই এস্টেট অবস্থিত। এই এস্টেটের জমিদার ছিলেন রঘুনন্দন গিরি গোঁসাই ও জানকি গিরি গোঁসাই।

ঘ. চ্যাটার্জী এস্টেট : বিন্দোল, রায়গঞ্জ, দিনাজপুর। রায়গঞ্জ স্টেশনে নেমে উত্তরদিকে ডিস্ট্রিকট বোর্ডের রাস্তায় গরুর গাড়িতে করে যেতে হত।

যতদূর জানা যায় এই জমিদারি এস্টেটগুলির মধ্যে কয়েকটি ব্রিটিশ সরকারকে ঠিকমত রাজস্ব না দেওয়ার কারণে ১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশকে জেলা কালেক্টরের অধিগৃহীত ছিল। তখন এই প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে কোট অব ওয়ার্ডস বলা হত। যেমন— মালদুয়ার কোট অব ওয়ার্ডস, বাইন কোর্ট অব ওয়ার্ডস ইত্যাদি। তবে এই সব এস্টেটের জমিদাররা নিজস্ব উদ্যোগে স্বীয় অঞ্চলে নাটকাভিনয়ের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, এছাড়াও কোনো কোনো জমিদাররা নিজেরাই নাটকে অংশগ্রহণ করতেন আবার কখনও অন্যত্র গিয়েও নাটক করতেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, গিরি-গোঁসাই এস্টেটের যতীন গোঁসাই ও তাঁর জ্যেষ্ঠ সন্তান কল্যাণ (মানু) গোঁসাই, বিন্দোল এস্টেটের জমিদার কামিক্ষ্যা চ্যাটার্জী, কর এস্টেটের শিবপ্রসাদ করও কয়েকবার নাটক করেছেন মালদুয়ারে। তাছাড়া এই সব কোট অব ওয়ার্ডসে ও দিনাজপুর কালেক্টরের কোর্ট অব ওয়ার্ডস-এ পোস্টিং কর্মচারীরাও নাটক করতেন এবং অন্যত্র নাটক করতে যেতেন। যেমন— সতীশচন্দ্র গুপ্ত,

প্রফুল্ল ভট্টাচার্য, অসিত (পাঁচকড়ি) সেনগুপ্ত প্রমুখ। জমিদারি সেরেস্তার কর্মচারীদের মধ্যে রায়গঞ্জের ড. জগদীশ সেনগুপ্ত এবং দিনাজপুরের বিমল দাশগুপ্ত, ধীরু ঘোষ, মনু দাশগুপ্ত, সুতান সরকার, রাজু রায়, শুঁটু রায়, ফটিক দাশগুপ্ত প্রমুখ। এই নাট্য-উদ্যোগগুলি পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এবং দর্শকরা ছিলেন প্রধানত সাধারণ দরিদ্র প্রজাকুল ও চাষি সম্প্রদায়ভুক্ত। যদিও এঁরা ছিলেন মূলত যাত্রার দর্শক। এইসব নাট্যানুষ্ঠানে স্থানীয় জমিদারদের স্বকীয় ব্যবস্থাপনায় লক্ষ করা যায় গ্রামাঞ্চলে বিনোদনের অভাবজনিত কারণে বহু সংখ্যক মানুষের সমাগম হত যা সেই সময়ে শহরের নাট্যানুষ্ঠানের পক্ষে অভাবনীয় ছিল।

অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার সদর মহকুমার (১৮৬৬ খ্রি:) অধীনে রায়গঞ্জ ছিল একটি থানা ও চৌকিমাত্র। তাই বিভাগ পূর্ব যুগ থেকেই এই থানা ছিল উন্নত। যতদূর জানা যায়, দিনাজপুরের রাজা প্রাণনাথ রায়ের (১৬৮২-১৭২২খ্রি:) রায়গঞ্জের বন্দর এলাকায় তাঁদের জমিদারির কাছারি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই রাজকাছারি ছিল প্রথম পাকাবাড়ি। তাই রায়গঞ্জ এলাকা ছিল দিনাজপুর বাজার জমিদারির অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ শাসনপর্বে গভর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিশ ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় পুলিশ-প্রশাসনিক ব্যবস্থা স্থাপনের সঙ্গে প্রথম থানা গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করেন। ১৭৯৪-৯৫ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর জেলাতে প্রথম যে ২২টি থানার উদ্ভব হয়, তাতে রায়গঞ্জের নাম ছিল না। হেমতাবাদ থানার অন্তর্ভুক্ত ছিল রায়গঞ্জ। পরবর্তীকালে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে বৃহত্তর বা অবিভক্ত দিনাজপুরে ৩০টি থানা গঠনের ফলে দেখা যায় যে রায়গঞ্জ এক স্বতন্ত্র থানারূপে আবির্ভূত হয়। অর্থাৎ ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে লর্ড রিপন দিনাজপুর জেলার ক্ষুদ্রতর শাসনতান্ত্রিক এলাকা সম্প্রসারণ করার কথা গভীরভাবে বিবেচনা করে আইন শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাজনিত কারণবশত বড়ো বড়ো থানাগুলিকে ভেঙে নতুন নতুন থানা বা নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এর ফলেই লক্ষ করা যায় ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে হেমতাবাদ থানার ২৪৪ বর্গমাইল এলাকা থেকে ১৭১ বর্গমাইল এলাকা বিভাজন করে রায়গঞ্জ থানা গঠিত হয়। এই থানার আসল গ্রামের সংখ্যা ছিল ২৪২টি বলে জানা যায়। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী স্বাধীনতাপূর্ব রায়গঞ্জ থানার মোট জনসংখ্যা ছিল ৬৫ হাজার ৫ শত ৫৩ জন মাত্র। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে রায়গঞ্জের রেজিস্ট্রারি অফিস প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম রেজিস্ট্রার এবং অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন জানকি গিরিগোঁসাই। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে রায়গঞ্জ মুন্সেফি আদালত গঠিত হয়। এই মুন্সেফী আদালতটি পরবর্তীকালে মোহনবাটি এলাকায় উঠে আসে।

রায়গঞ্জে যখন মুন্সেফী চৌকিমাত্র ছিল তখন সেখানে মোট জনসংখ্যা ছিল প্রায় হাজার দুয়েক। শিক্ষিতের সংখ্যা ছিল নগন্য। সংস্কৃতিপ্রিয় তথা নাটক বা সংগীতের অনুরাগীর সংখ্যা

অঙ্গুলিমেয়। তাসত্ত্বেও এই পটভূমিতে কিছু নাট্যপ্রেমী বা নাট্যামোদী গুণীজনে নানা রকম প্রতিকূলতাকে জয় করে নাটকের ঐতিহ্যের বীজ বপন করতে পেরেছিলেন। তার ফলেই রায়গঞ্জে ঐতিহ্যবাহী নাট্যচর্চার সূত্রপাত হয় ও সুদূর প্রসারী লাভ করে। এই থানা শহরে সাধারণ নাট্যশালা স্থাপিত হওয়ার আগেই সৌখিন নাট্যাভিনয় হওয়ার নিদর্শন পাওয়া যায় টিকিট বিক্রি না করেও। এখানকার স্থানীয় জমিদার ও গিরি গোঁসাই এস্টেটের নাট্যজ্যোতিষ্ক ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ নট যতীন্দ্রনাথ গোস্বামী (যিনি যতীন গোঁসাই নামে সর্বাধিক পরিচিত) মহাশয়ের উদ্যোগে ১৯১৬ বা ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে স্বীয় বন্দরস্থিত বাসভবনের প্রাঙ্গনে মঞ্চ বেঁধে (আজকাল যাকে মুক্তাঙ্গন মঞ্চ বলা হয়) আমন্ত্রিত অতিথিদের সম্মুখে 'বিজয়া' নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে প্রথম নাটকের সূচনা হয়। এরপর লক্ষ করা যায় এখানে জমিদার যতীন গোস্বামীর উৎসাহ ও আনুকূল্যে ২/৩টি অভিনয়ের পর তদানীন্তন দিনাজপুর মহারাজার কাছারির বাড়ির প্রাঙ্গনে অস্থায়ী মঞ্চ বেঁধে কয়েকটি নাটক অভিনীত হয় ১৯১৮-১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় এখানেও দর্শকদের কাছ থেকে প্রবেশ মূল্য নেওয়ার রেওয়াজ শুরু হয়নি।১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর মহারাজার দাতব্য চিকিৎসালয়ের চিকিৎসক ডাক্তার বিভূতি অধিকারীর ভাই শশী অধিকারীর জমিতে (বর্তমান রায়গঞ্জ উচ্চমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় যেখানে অবস্থিত) নাটক হয়েছে এক পাটগুদামে। টিনের চাল দেওয়া এই উঁচু লম্বা গুদাম ঘরটিতে প্রথম মঞ্চ স্থাপিত হয় তার একদিকে কাঠের চৌকি সাজিয়ে মেঝের বাকি অংশে ছিল ফরাস পেতে দর্শকদের বসার আসন এবং ডে লাইট জ্বালিয়ে আলোর ব্যবস্থা হয়।

এই মঞ্চের দ্বারোদ্ঘাটন হয় বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে এবং নিয়মিত অভিনয়ের বন্দোবস্ত হয়। তবে তিন চার মাস মহলা দিয়ে নতুন বই খোলা হতো এবং প্রতিটি বই তিন-চার রাত অভিনীত হত। তবে মহলা হত স্থানীয় জমিদার নাট্যামোদী যতীন্দ্রনাথ গোঁসাইয়ের বাড়িতে। তবে এই সব নাটকগুলির অধিকাংশই ছিল রাজধানী কলকাতার জনপ্রিয় নাটক। এই অস্থায়ী মঞ্চে 'বিল্বমঙ্গল', কুব্জ ও দরজী', 'রানা প্রতাপ', 'সাজাহান', 'দেবলাদেবী', 'মেবারপতন', 'আলমগীর', প্রভৃতি পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক নাটক মঞ্চস্থ হয়। এই সাধারণ রঙ্গশালার উদ্যোক্তা এবং অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন যতীন গোঁসাই, ড. জগদীশ সেন, উপেন বসু, সুধাময় প্রামাণিক প্রমুখ। এবং তাঁরা আমৃত্যু এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এরপর এখানে সাধারণ রঙ্গশালার অভিনয় শুরু হয়। প্রথম থেকেই লক্ষ করা যায় এখানকার উন্নত অভিনয় নৈপুণ্যে দর্শকরা মোহিত হয়ে পয়সা দিয়ে টিকিট কেটে কোন কোন নাটক দু-তিন বারও দেখতেন। অর্থাৎ প্রথম টিকিট বিক্রি করে ১৯২৩-২৪ খ্রিস্টাব্দের দিকে অভিনয় দেখানো শুরু হয়েছিল। এই পাটের গুদামে একাধিক্রমে চার-পাঁচ বছর ধরে বেশ কিছু নাটক পর্যায়ক্রমে অভিনীত হয়। রায়গঞ্জবাসীরা নাট্যচর্চাতে তখন

যথেষ্ট উৎসাহ পেয়েছেন। তারপর নানা কারণে এই স্থান পরিত্যাগ করতে হল। তারপর দেখা যায় ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে মোহনবাটির পাট ব্যবসায়ী খোকন কুণ্ডুর গুদাম ঘরে স্থানান্তরিত হল রঙ্গালয়। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের মাঝে লক্ষণীয় বিষয় হল কয়েকজন নাটক-প্রেমী মিলে উদ্যোগ নিয়ে এই নাট্য প্রক্রিয়াকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য গড়ে তুললেন নিয়মিত নাট্যপ্রয়াসে সৌখিন নাট্যসংস্থা 'রায়গঞ্জ নাট্য সমিতি।"[৫৮] যতদূর জানা যায় ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে এই নাট্যশালার উদ্বোধন হয় এবং এখানে দু-তিন মাস পরপর নতুন নাটক অভিনীত হতে শুরু করেছিল। বর্তমান ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক যে বাড়িতে অবস্থিত তার সামান্য উত্তর অংশে এই গুদামটি অবস্থিত। এই গুদামটি ছিল বাঁশের বেড়া এবং টিনের চাল দিয়ে তৈরী লম্বা একটি ঘর। তবে এবার কাঠের চৌকি পেতে অস্থায়ী মঞ্চের পরিবর্তে ঘরের একদিকে মাটির উপর ইঁট দিয়ে উঁচু করে বাঁধানো মঞ্চ নির্মিত হল। দর্শকদের ঘরের মেঝেতে বসার আসন ছিল। দেখা যায় মাটির মেঝের উপর বাঁশ পেতে তার উপর অংশে বিছানো খড় ও খড়ের উপর ত্রিপাল পাতানো হত। তাই এই আসন ছিল মোটামুটি আরামদায়ক। ডে-লাইট ঝুলিয়ে দিয়ে আলোর ব্যবস্থা ছিল কিন্তু মঞ্চ বা প্রেক্ষাগৃহ সম্পূর্ণ রূপে অন্ধকার করকার কোন উপায় ছিল না। এখানে নাটক রাত্রি ১০-১১ টায় শুরু হয়ে সারারাত অভিনয় চলার পর পরদিন ভোরে শেষ হত। অভিনেতারা সন্ধ্যার সময়ে উপস্থিত হয়ে মাইনে করা নাপিতের কাছ থেকে ক্ষৌরকার্য সম্পন্ন করে নিতেন। তার পরে সবেদা, পিউরি, মীনা ইত্যাদি সহযোগে রূপসজ্জা সেরে পোশাক, চুল ইত্যাদি পরে নিতেন। যতদূর জানা যায় এই মোহনবাটির জঙ্গলপূর্ণ পরিবেশে সন্ধ্যায় লোকজন যেতে রাজী হতেন না, কিন্তু যেদিন নাটক থাকত সেদিন স্বাভাবিকভাবে শুধু রায়গঞ্জেরই নয়, দূর-দূরান্ত থেকে গ্রামের মানুষেরা গরুর গাড়িতে এসে সারারাত নাটক দেখে পরের দিন সকালে বাড়ি ফিরতেন এবং সেই সময়কালের নাটকে লোকপালা বা যাত্রার প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট ও এই রীতিই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল বলে জানা যায়। এখানে উল্লেখ করা যায় সে সময় নাট্য-প্রযোজনায় প্রসেনিয়াম থিয়েটারের ছাপ ততটা স্পষ্ট না হয়ে বরং যাত্রার ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মোটকথা এ অঞ্চলের নাট্যরসিক বিদ্বজ্জন ইতস্তত যাত্রা বা কবিগানের মধ্য দিয়ে এক সময় তাঁদের নাট্যরস পিপাসা চরিতার্থ করতেন। অর্থাৎ রায়গঞ্জে প্রথম থেকেই কবিগানের ও যাত্রাগানের চর্চা ছিল এবং এই যাত্রাগানের চর্চার সূত্রেই এখানে থিয়েটারের সূত্রপাত হয়।

এখানে প্রবেশ মূল্য থেকে অর্জিত আয় দিয়ে ক্রমে ক্রমে দৃশ্যপট ও সাজ-সজ্জা তৈরি হয়। সেই সঙ্গে পূর্বের নাট্যশালার জিনিসপত্র এবং জমিদার যতীন গোঁসাই মহাশয় নিজস্ব মঞ্চের প্রায় সমস্ত জিনিস এই নাট্যসমিতিকে দান করেছিলেন। যা এই সমিতির অধীনে গচ্ছিত ছিল। এমনকি অভিনয়ের জন্য এলাকার অভিনেতারা অর্থ ব্যয় করতে কখনই কুণ্ঠাবোধ করেননি। তাঁরা পৌরাণিক,

ঐতিহাসিক, সামাজিক, প্রহসনধর্মী সবরকম নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন। অভিনয় শুরুর আগে ও মধ্যে বিরতির সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কনসার্ট বা ঐক্যতান বাজানো হত। সেই সঙ্গে বলা যায় এখানে প্রায় দশ বছর ধরে রায়গঞ্জ নাট্যসমিতি অনেক নাটক মঞ্চস্থ করে। এই সময় পর্বে রায়গঞ্জ নাট্যসমিতির ধারাবাহিক উল্লেখযোগ্য নাট্য-প্রযোজনা 'ঊষাহরণ', 'দেবলাদেবী', 'বিল্বমঙ্গল', 'সাজাহান', 'রাণাপ্রতাপ', 'প্রতাপাদিত্য', 'মেবার পতন', 'আলমগীর' প্রভৃতি পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক পূর্ণাঙ্গ নাটক।

তবে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের পর দেখা যায় যে, নাট্যাভিনয় সৌখিন ও মরশুমি চরিত্র থেকে ক্রমশ ধারাবাহিকতার দিকে অগ্রসর হয় এবং পরিশীলিত অভিনয়ের দিকে যাত্রা শুরু করে। এই সময় নারী চরিত্রে অভিনয় করতেন পুরুষ অভিনেতাগণ। বিন্দোলের জমিদার সুদর্শন তরুণ কামাক্ষ্যা চ্যাটার্জী তখন কলকাতার শিশির ভাদুড়ীর সম্প্রদায়ে স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনয় করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। তিনি রায়গঞ্জ নাট্যসমিতির মঞ্চেও অভিনয় করতেন। তারাপদ মুখার্জী, তারাপদ দাস, কৈলাস দাস ও বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জী প্রমুখরা স্ত্রী ভূমিকায় নিয়মিত অভিনয় করতেন। অন্যান্য খ্যাতিমান ও উল্লেখযোগ্য অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন জমিদার যতীন গোস্বামী, উপেন বসু, ডা. বিভূতি অধিকারী ডা. জগদীশ সেন, কিষেণ লাল ঘোষ, নগেন বসু, শচীন ব্যানার্জী, জ্যোৎস্না ঘোষ প্রমুখ।

এরপর স্বাভাবিকভাবে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে একটি স্থায়ী নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে জমি সংগ্রহ ও নাট্যমঞ্চ নির্মাণের জন্য দিনাজপুর এস্টেটের রাজ কাছারির নায়েব সুরেন শিকদার, যতীন্দ্রনাথ গোঁসাই, উপেন্দ্রনাথ বসু, কামিক্ষ্যা চ্যাটার্জী, করোনেশন স্কুল-এর তদানীন্তন হেডমাস্টার দামোদর প্রামাণিক, উকিল সুকুমার গুহ, উকিল কুলদাকান্ত মিত্র, ড. জগদীশচন্দ্র সেন, উকিল নির্মলকুমার ঘোষ, মৌলবি মহম্মদ আব্দুল গনি, উকিল গোলাম হামিদুর রহমান প্রমুখ রায়গঞ্জের তৎকালীন গণ্যমান্য ব্যক্তিমহোদয় উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এই কমিটির সম্পাদক হয়েছিলেন সুরেন শিকদার। দিনাজপুর মহারাজার কাছে আবেদন করা হয় রাজকাছারির বিপরীত দিকের এক জলা-জমি মঞ্চ নির্মাণের জন্য দান হিসেবে মঞ্জুর করতে।

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে আগে 'রায়গঞ্জ টাউন ক্লাব'-এর (ফুটবল খেলার জন্য) সৃষ্টি হয়। এরপর সাধনা সাহিত্য মন্দির' নাম নিয়ে আর একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রথমে শিউধনিরাম এবং পরে রাধাবল্লভ দাসের ভাড়া বাড়িতে স্থাপিত ছিল। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জুন দেখা যায় আর একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'বীণাপাণি সমিতি'র সাথে পূর্বোক্তটি একীভূত হয়ে কামাক্ষ্যাপ্রসাদ চ্যাটার্জীর বাড়িতে 'রায়গঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরী' নামে চালু হয়। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে 'টাউন ক্লাব', 'সাধনা সাহিত্য মন্দির', 'বীণাপানি পাঠাগার' ও 'রায়গঞ্জ নাট্যসমিতি'কে একত্রিত করার প্রস্তাব হয় এবং সেই

প্রস্তাব অনুযায়ী এই সংস্থার নামকরণ হয় 'রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট'। স্বভাবতই দেখা যায়, নাট্য সমিতি ইনস্টিটিউটের নাট্যবিভাগে পরিবর্তিত হল এবং সেই সঙ্গে তার দৃশ্যপট, পোশাক পরিচ্ছদ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সাজ-সজ্জার জিনিসপত্র নাট্যবিভাগের সম্পত্তি হয়ে উঠল। মোটকথা রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট নাট্যবিভাগের তথা সংক্ষেপে রাইনার ইতিহাস শুরু হল। তবে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে এই নাট্যসংস্থার আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা হয়নি বলে জানা যায়। শুধু তাই নয় প্রাপ্ত একটি সীল-এর সূত্র ধরে জানা যায় যে, রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাকাল লেখা ছিল ১৯৩৯।

এই ইনস্টিটিউট ভবনটি দিনাজপুর মহারাজার দেওয়া শর্ত অনুযায়ী নামকরণ হল— 'মহারানী স্নেহলতা হল' এবং সংলগ্ন মাঠের 'মহারাণী স্নেহলতা পার্ক' নাম মেনে নিয়ে সুরেন শিকদারের নেতৃত্বে কমিটি ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে সক্রিয়ভাবে কাজ শুরু করে। ১৭ই মার্চ ১৯৩৮-এ এই হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। হলের নির্মাণ কাজের অসমাপ্ত অবস্থাতেই 'দুই পুরুষ' ও 'পাঞ্জাব কেশরী রঞ্জিৎ সিং নামে দুটি নাটক অভিনীত হয় ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ৩রা মে। রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটের নাট্যশাখা রাইনার প্রযোজনায় মহারাণীর স্নেহলতা হলে স্বাধীনতার পূর্বে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যেসব নাটক অভিনীত হয়েছিল বলে যে তথ্য জানা যায় সেগুলি হল— 'প্রতাপাদিত্য', 'টিপু সুলতান', 'মীরকাশিম', 'রত্নদ্বীপ', 'পার্থসারথি', 'সরলা', 'কারাগার', 'চণ্ডীদাস', 'ঊষাহরণ', 'রীতিমত নাটক', 'পি-ডব্লু-ডি' প্রভৃতি ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক পূর্ণাঙ্গ নাটক।

মহারাণী স্নেহলতা হলঘরের দেওয়াল ছিল বাঁশের বেড়ার উপর মাটির পলেস্তারা করা। তার উপর ছিল কলি চুনের রঙ। দর্শকদের প্রবেশ প্রস্থান করার জন্য হল ঘরের তিনটি দরজা ছিল পার্কের দিকে। আর কাঠের ট্রাস্টের উপর করোগেটেড টিনের চাল এবং দরজাগুলির সামনের অংশে পাঁচ ফুটের মতো চওড়া সিমেন্ট বাঁধানো কিছুটা বারান্দা। সেই সঙ্গে লক্ষ করা যায় এই মঞ্চটি ছিল দালান ও পাটাতন ছিল কাঠের এবং মঞ্চের সামনের অংশে তিনটি প্রতিকৃতি স্থায়ীভাবে টাঙানো থাকতো। দেখা যায় হলের সামনের দিকে উপরে রমণীমোহন শিকদার তার এক পাশে উপেন্দ্রনাথ বোস এবং অপর প্রান্তে যতীন গোঁসাই। এই ভবনের অপরপ্রান্তে রাজ কাছারির দিকে রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটের অফিস ঘর ও লাইব্রেরী ছিল। মঞ্চসজ্জায় ছিল বেদী থেকে স্কাই পর্যন্ত দুই পাশ বরাবর সার সার কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো ক্যানভাস বা মোটা কাপড়ের উইংস অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রবেশ প্রস্থান এবং পেছনের অংশে দাঁড়িয়ে প্রম্পট করার জন্য। মাথার উপরে সারি সারি পরপর স্কাই এবং সামনের অংশে ছিল 'ড্রপসীন' পেছনের অংশে 'ব্যাক ড্রপ' বা মঞ্চস্থ নাটকের জন্য প্রয়োজনীয় হাতে আঁকা সীন বা 'ড্রপ'। অর্থাৎ সেই সময় লক্ষ করা যায় উপর থেকে ঝোলানো দৃশ্যপট ব্যবহারের রীতি প্রচলিত ছিল। তবুও মাঝে মাঝে মঞ্চমায়া সৃষ্টি করতেও দেখা যায়। উদাহরণ

স্বরূপ 'উষাহরণ' নাটকে এক দানবের মাথা উড়ে যাওয়া দেখানো হয়েছিল একটি নকল মাথা এবং তারের সাহায্য নিয়ে। অবশ্য মাথা ওড়ানো ঘটনাটি ঘটানোর আগে দানবটিকে খুঁজে পেতে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতে হয়েছিল। আর একটি নাটকে মঞ্চের উপর দিয়ে জনৈক অভিনেতা ঘোড়া চালিয়ে যান। এখানে মঞ্চ এবং আলোকসজ্জায় পরিকল্পনা মাফিক নতুন চিন্তা-চেতনার বাস্তব রূপায়ণ দেখা যায় ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে অভিনীত 'স্বামী স্ত্রী' নাটকে। এই নাটকে ঝোলানো দৃশ্যপট বাতিল করে প্রথম কাঠের কাঠামোয় আঁকা কাপড়ের সেট ব্যবহার শুরু হয়। সেই সঙ্গে তিন খণ্ড সেটে কক্ষের দৃশ্য তৈরী হল, রং গুলে কাপড়ে লাগানো, নক্সা তৈরি করা— এসব কিছু নিজেদের হাতে তৈরী করা। জঙ্গলের দৃশ্য দেখানোর জন্য মঞ্চে নানা রকম গাছপালা ও লতাপাতা দিয়ে রীতি-মতো একটি জঙ্গলের পরিবেশ তৈরি হয়ে গেল। আবার দেখা যায় কয়লা খাদে ওঠা নামার দৃশ্য দেখাতে মঞ্চের পিছন দিকের পাটাতন খুলে ওপর থেকে কপিকলে খাঁচা লাগিয়ে লোক ওঠানো এবং নামানোর উপায় দেখানো হলো। এছাড়া বিস্ফোরণের আওয়াজ ও অগ্নিকাণ্ড মঞ্চের নীচে করার ফলে একটি বাস্তব পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছিল। এই মঞ্চে নাটক হত দড়ি ও হুকের সাহায্যে পেট্রোম্যাকস উপর থেকে ঝুলিয়ে এবং প্রথম দিকে সামনের অংশে নীচে গ্যাস লাইট জ্বালিয়ে। মোটকথা তখনও বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা না হওয়ার কারণে দেখা যায় পেট্রোম্যাকস জ্বালিয়ে আলোর কারসাজি দেখানো হত। তাই ঢাকনা দেওয়া চারটে কাঠের বাক্সে চারটি পেট্রোম্যাকস ভরে দুটো মঞ্চের সামনে দু'পাশে রেখে ফুট লাইট করার রীতি ছিল। আর সেই সঙ্গে দুটো মঞ্চের দু পাশে থামের সঙ্গে উঁচু নিচু করে আলোক নিয়ন্ত্রণ করা এবং হালকা নীল রঙের সেলোফোন ব্যবহার করে জ্যোৎস্না রাত্রি দেখানো হত। এইভাবেই মঞ্চসজ্জা ও আলোক সম্পাতে আধুনিকতার শুরু হয়। এখানে টিকিট করে নাটক দেখানোর ব্যবস্থা ছিল। সেই সঙ্গে রায়গঞ্জে নাটক দেখতে দিনাজপুরের প্রায় সমসাময়িককাল থেকে মহিলাদের জন্য হলের পেছনের অংশে কাঠের তৈরি 'ব্যালকনি'র ব্যবস্থা ছিল। এখানে নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো ছোট রঙিন কাগজের হ্যাণ্ডবিল ছাপিয়ে শহরে নাটকের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হত এবং সেই সঙ্গে ঢোল সহরৎ করে পাড়ায় পাড়ায় প্রচার করার প্রচলন ছিল। সেই সঙ্গে সময়ে লক্ষ করা যায় রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটে কোনো নাটক মঞ্চস্থ করার পাকাপাকি সিদ্ধান্ত হলে নাট্যপরিচালক তাঁর প্রাথমিক কাস্টিং করতেন এমনকি সেই কাস্টিং-এর খাতাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রত্যেক অভিনেতার সই করাতেন। সেই সঙ্গে পরিচালক বা নাট্যশাখার সম্পাদক নোটিশ জারি করার পর এই নোটিশগুলির মাথায় ''নমঃ নটনাথায়'' লিখে রাখতেন। তবে অতীতেও এই রীতি ছিল কিনা তার কোন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

এরপর ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের দিকে অবিভক্ত বাংলা স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্তাল হয়ে উঠলে তার তেমন কোন প্রভাব রায়গঞ্জের জনজীবনে লক্ষ করা যায়নি। এমনকি মুসলিম লিগের 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে'র পর কলকতা, নোয়াখালিসহ বিভিন্ন জেলায় হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সংঘটিত দাঙ্গার প্রভাব এই আধাশহরে পড়েনি। বরং মহারাণী স্নেহলতা পার্কে দুইদিন ধরে 'দীপালি উৎসব' চলেছিল। এই উৎসবের পর বছরের শেষার্ধে দুটি নাটক রায়গঞ্জে অভিনীত হয়। একটি অনুষ্ঠিত হয় দিনাজপুর মহারাজা এস্টেটের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার জগদীশচন্দ্র সেনের পরিচালনায় রায়গঞ্জ থানার মাঠে ও থানার স্টাফদের নিয়ে মঞ্চ বেঁধে গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'বিল্বমঙ্গল' নামে পৌরাণিক নাটক। এই নাটকের প্রধান ভূমিকায় ছিলেন জগদীশচন্দ্র। আর ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট মঞ্চে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় নাটকটি হল বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'তাই তো' সামাজিক নাটক। তবে প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, দিনাজপুর নাট্যমঞ্চের খ্যাতনামা ও স্বনামধন্য অভিনেতা সতীশচন্দ্র গুপ্ত এ নাটকের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেন। যতদূর জানা যায় রায়গঞ্জের নাট্যমঞ্চে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের ট্রাডিশনের মধ্যে এই ধরনের আধুনিক সামাজিক নাটক নতুন না হলেও নিঃসন্দেহে কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী ছিল তারপর ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথমার্ধে মহারাণী স্নেহলতা হল বা ইনস্টিটিউট মঞ্চে 'স্বাধীনতা হীনতায়' নামে একটি নাটক মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকের পরিচালনায় ও দেশপ্রেমিকের প্রধান ভূমিকার অভিনয় করেন উকিল সুকুমার গুহ।

কালিয়াগঞ্জ বৃহত্তর বা অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার একটি থানা রূপে চিহ্নিত ছিল। ব্রিটিশ শাসন পর্বে ১৭৯৪-৯৫ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর জেলায় নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ২২টি থানার পত্তন হয়, তার অন্তর্ভুক্ত ছিল কালিয়াগঞ্জ থানা। এরপর দেখা যায় ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে মোট ১২টি থানা নিয়ে দিনাজপুর সদর মহকুমা গঠিত হয় তখন কালিয়াগঞ্জ থানা দিনাজপুর সদর মহকুমার অধীনভুক্ত হয়। তৎকালীন সময়ে থানা মাত্রই ছিল অনেকটা গ্রামগঞ্জের মতো মফস্বল শহর, তা সত্ত্বেও কালিয়াগঞ্জ থানা ছিল উন্নত। এটি ছিল মূলত বাণিজ্য প্রধান স্থান। এই থানা শহরটির অধিবাসীদের মধ্যে দারোগা, পুলিশ পোস্টমাস্টার, সেনেটারী ডাক্তার, স্কুল শিক্ষক— এরাই ছিলেন শিক্ষিত ও ভদ্র পরিবার। তার মধ্যে থানার দারোগা নাজমুল হক সাহেব ছিলেন পদমর্যাদা ও ক্ষমতায় প্রধান ব্যক্তি। যদিও তিনি ছিলেন বহিরাগত।

কালিয়াগঞ্জের জন-জীবনে সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার ঢেউ ১৯৩১-৩৯ খ্রিস্টাব্দে প্রবলভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করে। শুধু তাই নয়, দিনাজপুর জেলা সদর মাত্র ১৬ মাইল দূরে থাকার সুবাদে জেলাসদরের নাট্যচর্চা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে কালিয়াগঞ্জের জনজীবনে। যতদূর জানা যায়, ১৯৩২-৩৩ খ্রিস্টাব্দে খন্দকার নজবুল হক কালিয়াগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ হয়ে আসেন। এবং

তিনি ছিলেন সংগঠক, পরিচালক, নাট্যামোদী, দক্ষ অভিনেতা ও সর্বোপরি সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ। তাঁর বিশেষ উৎসাহ ও উদ্যোগে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং সেখানকার নাট্যপ্রেমী ব্যক্তিবর্গ যথা সুরেন্দ্রনাথ ভদ্র, মহেন্দ্রনাথ ভদ্র (ছোট), মহেন্দ্রনাথ ভদ্র (বড়), ভবেশ দত্ত, হরেন বিশ্বাস, নির্মল ব্যানার্জী, হরিপ্রসাদ নাথ, দিনেশ কমল গুহ প্রমুখের আপ্রাণ সহযোগিতায় কালিয়াগঞ্জ থানা শহরে প্রথম সৌখিন নাট্যচর্চা শুরু হয়। তিনি স্থানীয় এই তরুণ নাট্যশিল্পীদের নিয়ে 'বঙ্গেবর্গী' নাটকটি মঞ্চস্থ করে। ভাস্কর পণ্ডিতের ভূমিকায় নজমুল হক সাহেব অভিনয় করেন এবং এই নাটকটি ছিল কালিয়াগঞ্জের তরুণ যুবকদের প্রথম নাট্যপ্রয়াস। নজমুল হক সাহেবের উদ্যোগে ও স্থানীয় নাট্য তরুণ নাট্যপ্রেমীদের সহযোগিতায় ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে কোন রকমে বয়রা কালীমন্দিরের পাশের বাঁশের বেড়ার উপর টিনের চাল দিয়ে একটি কাঁচা ঘরে নাট্যনিকেতন তৈরি হয়। বিশিষ্ট যাত্রাশিল্পী মহেন্দ্রনাথ ভদ্র জমি দান করেন। বর্তমানে সেই মঞ্চই কালিয়াগঞ্জের একমাত্র রঙ্গমঞ্চ। পরবর্তীকালে নজমুল হক সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ নাট্যরসিক নজমুল হক সাহেবের স্মরণে এই স্থায়ী নাট্যসংস্থার নাম হয় নজমু নাট্যনিকেতন। এমনকি এই নাট্যমঞ্চকে কেন্দ্র করেই কালিয়াগঞ্জের নাট্যচর্চা যথেষ্ট উত্তরণের পথে এগিয়ে চলে। এরপর কালিয়াগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার পদে এলেন জ্ঞানেন্দ্র গুহরায় মহাশয় এবং তিনিও ছিলেন ভীষণ নাট্যামোদী, তারপাশাপাশি অনেক উৎসাহিত যুবক এগিয়ে এলেন— অশ্বিনী পাট্টাদার, ভবেশ দত্ত, শ্রীপতি কুণ্ডু, তারাপ্রসন্ন চক্রবর্তী, কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী, হেমপ্রসন্ন চক্রবর্তী, উপেন সাহা, সন্তোষ দত্ত, বাশরী চ্যাটার্জী, মানু গোঁসাই (রায়গঞ্জ), যগেন্দ্রনাথ নন্দী, মহাদেব মৈত্র, নির্মল গুহ, গুপী নন্দী আরও অনেকে। এই সময়ে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকই বেশি অভিনীত হয়েছে। এই পর্বে যে সব নাটক এখানে পর্যায়ক্রমে অভিনীত হয় বলে জানা যায় সেগুলি হল— 'দেবলাদেবী', 'সাবিত্রী-সত্যবান', 'রামের সুমতি', 'কেদার রায়', 'সরমা', গয়াসুর বধ', 'পার্থসারথী', 'বজ্রবাহন', 'সরলা', 'ঋণংকৃত্ত্বা', 'সিরাজদৌল্লা' প্রভৃতি পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক পূর্ণাঙ্গ নাটক। সেই সময়কালে 'গয়াসুর' চরিত্রের ভূমিকায় সুধীর সরকার, 'কেদার রায়' নাটকে কার্ভালোর ভূমিকায় এবং 'রায়গড়' নাটকে পেড্রোর ভূমিকায় কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী, বিষ্ণুর ভূমিকায় হেমপ্রসন্ন চক্রবর্তীর অসাধারণ অভিনয় এতদ অঞ্চলে আজও কিংবদন্তি তুল্য। তৎকালীন সময়ের অসাধারণ মেক আপ ম্যান ছিলেন অশ্বিনীকুমার পাট্টাদার। তখন নারীর ভূমিকায় অভিনয় করতেন পুরুষ অভিনেতারা। হরেন বিশ্বাস ও অশ্বিনী পাট্টাদার সেই সময়ে নারীর ভূমিকায় অভিনয় করতেন। এছাড়াও তৎকালীন স্ত্রী ভূমিকায় উল্লেখ্য পুরুষ অভিনেতারা হলেন— হরিয়ানন্দ বল, অক্ষয়কুমার সেনগুপ্ত, মাখন তালুকদার, খীরা পাল চৌধুরী, বলাই ভট্টাচার্য, শশাঙ্ক চ্যাটার্জী, নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিজয় সিংহরায় প্রমুখ।

১৯৪০-৪৭ খ্রিস্টাব্দের সময়সীমায় লক্ষ করা যায় ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকায় ব্যাপক পরিবর্তন হওয়ার ফলে এখানকার নাট্যপ্রেমী শিল্পীদের চিন্তা ও চেতনায় নতুন বেগ সঞ্চার করে এবং সেই সঙ্গে নাট্য আন্দোলনের একটি নতুন ধারার উদ্ভব হয়। এই সময়ে নাটক করার জন্য 'কালিয়াগঞ্জ ড্রামাটিক ক্লাব' নামে একটি ক্লাব গড়ে ওঠে। এই পর্বের আদর্শবান যুবক নাট্যপ্রেমী শিল্পীরা হলেন কান্তি মজুমদার, শৈলেন্দ্রনাথ নন্দী, ভোম্বল চ্যাটার্জী, ভোলা ভদ্র, আশু ব্যানার্জী, অরুণ চক্রবর্তী, পীযূষ ঘোষ, সুশীল বিশ্বাস, সুবিনয় দাস, স্বপনগুহ রায়, পল্টু গুহ, অনিল বিশ্বাস, জীতেন সেনগুপ্ত প্রমুখ। এদের সক্রিয় উদ্যোগ ও প্রযোজনায় ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের প্রথম পর্বে মহেন্দ্র গুপ্তের 'টিপুসুলতান' ও 'রায়গড়', 'মমতাময়ী হাসপাতাল', 'দুই মহল', 'চিরকুমার সভা', 'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'মাটির গর্ভ', 'ক্ষুদিরাম', 'কঙ্কাবতীর ঘাট' প্রভৃতি ঐতিহাসিক, সামাজিক ও দেশাত্ববোধক নাটক অভিনীত হয়। সেই সময়ে এই নাটকগুলি সমগ্র কালিয়াগঞ্জ সহ পার্শ্বস্থ অঞ্চলের সুধী সমাজে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা ও প্রশংসা লাভ করেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, 'কঙ্কাবতীর ঘাট' নাটকে স্থানীয় যুবকদের সঙ্গে অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন প্রখ্যাত নট ও নাট্যকার মহেন্দ্র গুপ্ত এবং বিখ্যাত চলচিত্রাভিনেত্রী মাধুরী মুখার্জী (তখন সিনেমায় আসেননি)— যা ছিল সেই সময়কালের কালিয়াগঞ্জের নাট্যচর্চার এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। এই সব নাট্যচর্চার মধ্যে সৌখিন অবসর বিনোদনই ছিল মুখ্য।

এরপর সারাদেশ জুড়ে পট পরিবর্তনের পালা চলাকালীন অবস্থায় শুরু হয় ১৯৪২ এর আন্দোলন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, উত্তরবঙ্গের কৃষক সমাজের তে-ভাগা আন্দোলন ও ভাতৃঘাতী দাঙ্গা, প্রভৃতি জাতীয় সমস্যার মধ্য দিয়ে দেশ উত্তাল। এই উত্তাল পরিবেশের প্রভাবে এখানকার নাট্যপ্রেমী নবীন-প্রবীণ শিল্পীদের আন্দোলিত করে তোলে তাই এই সময় দেখা যায় যে, এখানকার হরিনারায়ণ ভদ্র নামে একটি যুবক দেশাত্ববোধক নাটক 'মোহনলাল' লিখে ফেলেন। এই নাটকটি মঞ্চস্থ করার প্রস্তুতি চলছে। কিন্তু দেশের উত্তেজনাময় পরিস্থিতিতে এই নাটকটি পুলিশের বাধার কারণে মঞ্চস্থ করা সম্ভব হয়নি। এরপর ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে দাঙ্গা চলাকালীন মুহূর্তে নাট্যপ্রেমী নবীণ প্রবীণেরা সম্মিলিতভাবে বাণীকুমার কর্তৃক বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' এর নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এবং এই মর্মে 'আনন্দমঠে'র বিষয়বস্তুর উপর একটি হ্যাণ্ডবিল ছেপে কালিয়াগঞ্জসহ পার্শ্বস্থ সব অঞ্চলে প্রচার করা হয়। এই বিষয়টি দুর্ভাগ্যবশত: গোয়েন্দা বিভাগের নজরে আসার ফলে 'আনন্দমঠ' মঞ্চস্থ করাতে না পেরে তাঁরা তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' উপন্যাস অবলম্বন 'সরলা' নামে সামাজিক পূর্ণাঙ্গ নাটকটির মঞ্চস্থ করেছিল। এই সময়ে প্রসন্ন চক্রবর্তী ও তারাপ্রসন্ন চক্রবর্তী অভিনীত 'সন্তান' নাটকটি রাজরোষের শিকার হয়। কালিয়াগঞ্জ থানা শহরের

তৎকালীন নাট্যশিল্পীদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ার কারণে মঞ্চস্থ নাটক দেখতে বিভিন্ন অঞ্চলের দূর-দূরান্ত থেকে বহু দর্শক ছুটে আসত। এমনকি সেই সময়ের নট ও নাট্যকার শিবপ্রসাদ এখানে অভিনীত নাটক দেখতে আসতেন। জানা যায় যে, মাসে একটি করে নতুন বই অভিনীত হলেও কোন কোন নাটক ১০-১২ রাত্রি ধরে অভিনীত হত। আরও জানা যায় যে, বয়রা কালীবাড়ির সামনের রাস্তা ঘিরে টিকিট করে নাটক অভিনীত হলেও কখনও কখনও এমন পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল যে দর্শকদের জায়গা দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কালিয়াগঞ্জে স্বাধীনতার পূর্বযুগ পর্যন্ত প্রধানত ঐতিহাসিক ও সামাজিক পালার নাটক বেশী করে অভিনীত হয়েছিল। বীররস ও করুণ রসের ধারাই এই সব নাটকে প্রাধান্য পেত। এমনকি ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে দেশপ্রেম বোধের প্রকাশ কখনও কখনও ঘটত। এই সব যুগোপযোগী ও জনপ্রিয় নাটক তৎকালীন দর্শকদের ভীষণভাবে আকৃষ্ট করে তুলেছিল। তবে প্রসঙ্গত বলা যায় যে সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা তৎকালীন সময়ে ক্রমশই বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেও হয়তো অনুকূল মানসিক পরিবেশের অভাবজনিত কারণে এসব চিন্তাভাবনা নাটকে প্রকটিত হয়ে ওঠেনি।

অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার নাট্যসংস্কৃতির অনিবার্য প্রভাব তথা অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে দিনাজপুরের মহকুমা ভিত্তিক শহর ও সংস্কৃতি সম্পন্ন গ্রাম-গঞ্জেও। এই প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা সদর বালুরঘাট শহর থেকে ৬ কিলোমিটার পশ্চিমে সংস্কৃতিমনস্ক বোয়ালদাড় গ্রামে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে নবপর্যায়ে বাসন্তী পূজাকে কেন্দ্র করে বোয়ালদাড় বারোয়ারী নাট্যসংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও গ্রামের বিশিষ্ট্য নাট্যপ্রেমীদের হাত ধরে। এই বারোয়ারী নাট্যসংস্থার জনক বা স্রষ্টা ছিলেন উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। যতদূর জানা যায় এই চল্লিশের দশকে বোয়ালদাড় গ্রামে বাসন্তী পূজা উপলক্ষে বিশেষ করে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিন দিনে শিক্ষা ও সুস্থ্য সংস্কৃতিমূলক চিন্তা-চেতনাকে মাথায় রেখে নাট্যাভিনয়ের পথ চলা শুরু হয়। এই উদ্দেশ্যে বারোয়ারী নাট্যসংস্থার প্রযোজনায় 'মেবার কুমারী', 'মীনা' ও 'বঙ্গবীর' এই তিনটি নাটক অস্থায়ী মঞ্চ বেঁধে বেশ সফলতার সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়ে জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং গ্রামের দর্শক মহলে সাড়া জাগিয়ে তুলে বহুলপ্রশংসীত হয়। মোটকথা তখন এই নাট্যাভিনয় দেখার জন্য প্রচুর দর্শক সমাগম হত। এবং আত্মীয়স্বজনে গ্রাম ভরে যেত, সেই সঙ্গে বহিরাগত অভিনেতাদের রিহার্সেল থেকে শুরু করে নাটক মঞ্চস্থ হওয়া পর্যন্ত একটা বিরাট পর্ব চলত। এই নাট্য-প্রযোজনায় চরিত্র ভূমিকায় যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে গ্রামের অভিনেতা উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, জানকী চৌধুরী, খুদু এবং গ্রামের বাইরে ও দূরবর্তী স্থানের অভিনেতারা হলেন রামপদ সমাজদার, রামবল্লভ সমাজদার (ঝড়ু বাবু), মঙ্গল ঠাকুর, বিভূতী চৌধুরী, জীতেন সমাজদার (বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের বিশিষ্ট নাট্যশিল্পী

প্রমুখ)।

পরিশেষে একথা উল্লেখের দাবি রাখে যে বৃহত্তর বা অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার নাট্যাভিনয় তথা নাট্যচর্চার সূচনার বিষয়ে মেহরাব আলী কথিত বাবুকালচারের প্রভাবকে কিয়দংশ সমর্থন করেও আমি বলতে চাই যে, অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার নাট্যচর্চা বাবুকালচার দ্বারা পুরোপুরি প্রভাবিত নয়। যুগপ্রয়োজনে সেকালের নাট্যপ্রেমী তথা নাট্যরসিক বিদ্বজ্জনদের স্বতঃস্বেচ্ছ প্রচেষ্টায় ও সামাজিক বিবর্তনের ধারায় মধ্যবিত্ত দর্শক সমাজ গড়ে ওঠে। তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সার্বিক সহযোগিতায় কালের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে একটা স্বতন্ত্র নাট্য আন্দোলনের গতি লক্ষ্য করা যায়। যেখানে লোকসাধারণ বা দর্শক সমাজ তাঁদের নাটক দেখা তথা নাট্যরস পিপাসা চরিতার্থ করতে নিত্যনতুন নাট্যমঞ্চের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাই এই সময়ে অবিভক্ত দিনাজপুর জেলায় বহু নাট্যমঞ্চ ও নাট্যগোষ্ঠী বা দল নাট্যরসিক দর্শক সমাজের প্রয়োজনে স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠে, সেই সঙ্গে নাট্যচর্চা প্রাণবন্ত হয়ে প্রসার লাভের মধ্য দিয়ে সাবলীল ধারা বেয়ে প্রাক্-স্বাধীনতা পর্ব বা বিভাগ পূর্ব যুগ পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছিল।

স্বাধীনোত্তর পর্বে দিনাজপুর জেলার নাট্যচর্চার অবস্থান ও গতিপ্রকৃতি [বৃহত্তর বা অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার বিবর্তিত রূপ পশ্চিম দিনাজপুর জেলার উদ্ভব ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বিভাজিত রূপ উত্তর দিনাজপুর জেলা ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার (১৯৪৮-১৯৯২) নাট্যচর্চার অবস্থান ও গতিপ্রকৃতি।]

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের কেন্দ্র কলকাতা থেকে অবিভক্ত বা বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার সদর শহরে ইউরোপীয় সামাজিক সংস্কৃতি উনিশ শতকের প্রথম লগ্নেই পৌঁছেছিল ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্রিটিশ অফিসারদের মাধ্যমে। তাই একথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় যে, অবিভক্ত দিনাজপুর জেলায় নাট্যচর্চা শুরু হয় উনিশ শতকের প্রায় প্রথমার্ধ থেকেই। ব্রিটিশ শাসিত রাজা-মহারাজা, খানবাহাদুর ও রায় বাহাদুরদের পৃষ্ঠপোষকতা ও আর্থিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে অবিভক্ত দিনাজপুর জেলায় নাট্যচর্চা বেশ প্রাধান্য লাভ করেছিল। শুধু তাই নয়, এর সঙ্গে জানা যায় যে, দিনাজপুরের মহারাজাদের মধ্যে অনেকেই উচ্চ-শিক্ষিত ও সংস্কৃতিমনস্ক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ও অন্যতম ছিলেন মহানুভব মহারাজা গিরিজানাথ রায়। তিনি সেই সময়ের উন্নত শিল্পমোদী, নাট্যপ্রাণ বা নাট্যামোদী সঙ্গীতপ্রিয় ও উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এমনকি তাঁর উদ্যোগেই রাজবাড়ির মধ্যে প্রাঙ্গনে নাটমন্দির, কোহিনুর মঞ্চ, জলসাঘর প্রভৃতি নির্মিত হয়েছিল। মোটকথা যুগের প্রভাব অনুযায়ী রাজারা ছিলেন ক্লাসিক শিল্পের গুণগ্রাহী। এবং রাজধানী কলকাতার সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ

ফলে কলকাতার থিয়েটার চর্চার বিষয়ে যেমন ওয়াকিবহাল ছিলেন ঠিক তেমনিভাবে অনেকটা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। এই নাট্যচর্চার অনিবার্যপ্রভাব বিভাগপূর্ব তথা অবিভক্ত দিনাজপুর জেলায় সদরে প্রভাব বিস্তার করে মহকুমাভিত্তিক শহর ঠাকুর গাঁ ও বালুরঘাট সহ গ্রামীণ জমিদারিগুলিতে এবং সংস্কৃতি সম্পন্ন গ্রামেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এবং সেই সঙ্গে দেশবিভাগের পর অর্থাৎ স্বাধীনোত্তর যুগে পশ্চিম দিনাজপুর জেলা ও তার অন্তর্ভুক্ত উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাদ্বয়ের উপর স্বাভাবিকভাবে এই নাট্যচর্চার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার নাট্যসংস্কৃতি।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের ফলে স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের সীমানা বিভাজন রীতি অনুসারে অখণ্ড বা বৃহত্তর দিনাজপুর জেলাকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়। তার ফলে দুটি দিনাজপুরের উদ্ভব হয়, যথা— পূর্ব দিনাজপুর ও পশ্চিম দিনাজপুর। ভারত বিভাজনের পরিণাম স্বরূপ লক্ষ করা যায় যে, অখণ্ড দিনাজপুর জেলার সাবেক ৩০টি থানার মধ্যে পূর্বাংশ ২০টি থানার সম্পন্ন অংশ এবং হিলির অংশ বিশেষ থানা নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পূর্বদিনাজপুর জেলা গঠিত হয়। আর পশ্চিমাংশ পূর্বোক্ত ৩০টি থানার অবশিষ্ট ৯টি থানার সম্পন্ন অংশ এবং ১টি অংশ বিশেষ থানা নিয়ে অর্থাৎ বাকী ১০টি থানা ভারত ইউনিয়নভুক্ত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নাম হয় পশ্চিম দিনাজপুর জেলা।

দেশভাগের পর দেখা যায় যে, বালুরঘাট, কুমারগঞ্জ, গঙ্গারামপুর ও তপন থানা নিয়ে বালুরঘাট মহকুমা গঠিত হয়। এরপর ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মে বালুরঘাট মহকুমার অন্তর্ভুক্ত হয় হিলি থানা। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই জুলাই রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, হেমতাবাদ, ইটাহার, কুশমণ্ডি ও বংশীহারী থানা নিয়ে গঠিত হয় রায়গঞ্জ মহকুমা। মোটকথা পশ্চিম অংশ যুক্ত হয় ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সঙ্গে। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই জুলাই বালুরঘাট ও রায়গঞ্জ মহকুমা নিয়ে, যা পশ্চিমদিনাজপুর জেলা নামে পরিচিত হয়। এরপর ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের ১লা এপ্রিল লক্ষ করা যায় পশ্চিমবঙ্গস্থিত পশ্চিম দিনাজপুর জেলা প্রশাসনিক কারণে পুনরায় দ্বিখণ্ডিত হয়ে উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর নামে স্বতন্ত্র জেলা হিসেবে গড়ে ওঠে। সুতরাং পশ্চিম দিনাজপুর জেলার সীমানা পুনরায় দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে উত্তর দিনাজপুর জেলা ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলারূপে আত্মপ্রকাশ লাভ করলেও এই জেলাদ্বয়ের নাট্যচর্চার ধারা পূর্বতন (অবিভক্ত দিনাজপুরের) নাট্যচর্চার ধারাবাহিকতার প্রবহমান গতিকে আজও বহন করে চলেছে। তাই এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, স্বাধীনোত্তর পর্বের নাট্যচর্চার ধারা মূলত পশ্চিম দিনাজপুর জেলা ও তার অন্তর্ভুক্ত উত্তর দিনাজপুর জেলা ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছিল।

স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমদিনাজপুর জেলার নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় এক নতুন মাত্রা

যা চেতনাদর্শ। এমনকি শিক্ষা, শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও নতুন ভাবাদর্শগত চিন্তা-চেতনার শুরু হয়। মোটকথা দেশ বিভাগের পরও নতুন ভাবধারা এবং নাট্যভাবনাকে এই অঞ্চল তাঁদের শিল্পানুরাগে রূপ দিয়েছেন। এর ফলে দেখা যায় যে, বালুরঘাট ও রায়গঞ্জ মহকুমার সমন্বয়ে গঠিত পশ্চিম দিনাজপুর জেলার অধীনে অবস্থিত উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন জায়গায় ঐতিহ্যময় নাট্যচর্চার প্রয়োজনে প্রধান নাট্যসংস্থা 'বালুরঘাট নাট্যমন্দির' ছাড়াও আরও বহু নাট্যসংস্থার জন্ম হয়। এমনকি স্বাধীনোত্তর কালে পশ্চিমদিনাজপুর সহ উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় নাট্যচর্চা তথা নাট্যভিনয়ের প্রবণতা ও উৎসাহ অধিকমাত্রায় বেড়ে যায়। তাই দেখা যায় নাট্যচর্চার পরিধি, বিনোদনের সুযোগ ও গতিপ্রকৃতি প্রাক্-স্বাধীনতার চেয়ে স্বাধীনোত্তর যুগে পূর্বাপেক্ষা অনেকগুণে বর্দ্ধিত হয়। অর্থাৎ এই সময়ে জেলার নাট্যচর্চায় এক অবাধ গতি লক্ষ করা যায়। তাই পশ্চিম দিনাজপুর জেলার নাট্যচর্চার বিষয়ে জেলার শ্রেষ্ঠ নট ও নাট্যকার মন্মথ রায় 'পশ্চিম দিনাজপুর জেলার নাট্যশালায় শতবর্ষ পূর্তি উৎসব প্রসঙ্গে' প্রবন্ধে মূল্যবান ও প্রাসঙ্গিক মন্তব্য করেছেন— ''নাট্যসাধনা, নাট্যকৃতিত্ব এবং নাট্যসংস্কৃতির মানদণ্ডে পশ্চিম দিনাজপুর কলকাতার কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। নাট্যসমীক্ষার ক্ষেত্রেও পশ্চিম দিনাজপুর পিছিয়ে নেই। ১৮৭২ সালে কলকাতায় প্রথম সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর একশত বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে। এই একশত বৎসরে বাঙালীর যে নাট্যঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছে তার ধারক ও বাহকরূপে পশ্চিম দিনাজপুর বিশেষত বালুরঘাট সত্যই অসামান্য এবং এটা খুব অপ্রত্যাশিতও নয়।" এমনকি এই বিষয়ে তিনি আরও বলেছেন— ''বালুরঘাটের 'নাট্যমন্দির' বালুরঘাটের 'ত্রি-তীর্থ' পশ্চিমবঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও বহু নাট্য প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। 'ত্রি-তীর্থ' তো কলকাতাতেই শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর রেখেছে।"[৫৯]

আবার পশ্চিম দিনাজপুর জেলার নাট্যচর্চা তথা নাট্য সংস্কৃতির সম্বন্ধে বিশিষ্ট নাট্য সাংবাদিক প্রবোধবন্ধু অধিকারী মহাশয় পশ্চিম দিনাজপুর জেলা বাংলা সাধারণ নাট্যশালা শতবর্ষপূর্তি উৎসব সমিতির উদ্যোগে ২৩ থেকে ২৫ মার্চ, ১৯৭৩ তিনদিন ব্যাপী আয়োজিত পশ্চিম দিনাজপুর জেলা নাট্যশালা শতবর্ষপূর্তি নাট্যোৎসবে বালুরঘাটের 'ত্রি-তীর্থ' মঞ্চসভায় যথার্থ গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য তুলে ধরে বলেছেন—''সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কলকাতার জমিদারী ভাঙতে শুরু করেছে। মফস্বলকে আর উপেক্ষা করার উপায় নেই।''

স্বাধীনোত্তর পর্বে দিনাজপুর জেলার নাট্যচর্চার আলোচনার অবতরণিকায় বলে রাখা ভালো যে আমরা এখানে বৃহত্তর বা অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার বিবর্তিত রূপ পশ্চিম দিনাজপুর জেলার উদ্ভব ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বিভাজিত রূপ উত্তর দিনাজপুর জেলা ও দিক্ষণ দিনাজপুর

জেলার (১৯৪৮-১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে) নাট্যচর্চার অবস্থানও গতি প্রকৃতির উপর ক্ষেত্র সমীক্ষা এবং তথ্যসূত্র নির্দিষ্ট প্রমাণাদি সহ ধারাবাহিক আলোচনা তুলে ধরার চেষ্টা করব। সেই সঙ্গে স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিম দিনাজপুর জেলা ও তার অধীনে অন্তর্গত উত্তর দিনাজপুর জেলা ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নাট্যচর্চার সামগ্রিক আলোচনায় পরিস্ফুটিত করব এই উদ্দেশ্যে যে, স্বাধীনোত্তর দিনাজপুর জেলার নাট্যচর্চার অবস্থানগত বাস্তবচিত্র ও তার গতিপ্রকৃতির স্বরূপ আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়ে ওঠে।

আমরা জানি যে, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতবাসী রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করার ফলে ভারতবর্ষের ভূখণ্ড ভেঙে পৃথক আর একটি রাষ্ট্র পাকিস্তান গঠিত হয়। সেই সুবাদে বাংলাদেশ ভেঙে গঠিত হয় পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ। পূর্ববঙ্গ পূর্বপাকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশ) নামে পরিচিত লাভ করে। সেই সঙ্গে বৃহত্তর অখণ্ড দিনাজপুর জেলা ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট বেঙ্গল পার্টিশনের ফলে বিভক্ত হয়ে পূর্বাংশ পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। নাম হয় পূর্ব দিনাজপুর আর, পশ্চিমাংশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পশ্চিম দিনাজপুর নাম হয়। অর্থাৎ সেই সময় মোট ১০টি থানা নিয়ে বালুরঘাট ও রায়গঞ্জ মহকুমার সমন্বয়ে গঠিত পশ্চিম দিনাজপুর জেলা ভারতভুক্তিকরণ হয়। এবং ভারত সরকারের Notification no. 2139 GA., Dated 14.7.48 আদেশ অনুযায়ী রায়গঞ্জ মহকুমা সদর রূপে গঠিত হলে রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, হেমতাবাদ, ইটাহার, কুশমণ্ডি ও বংশীহারী থানা রায়গঞ্জ মহকুমার অধীনভুক্ত হয়। পরবর্তীকালে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের ১লা এপ্রিল পশ্চিম দিনাজপুর পুনরায় বিভক্ত হয় পশ্চিমবঙ্গের অধীনে দুটি জেলায়- উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর নামে স্বতন্ত্র জেলা হিসেবে। দেশ বিভাগের পূর্বে রায়গঞ্জ ছিল অবিভক্ত দিনাজপুর জেলা সদর মহকুমার (১৮৬৬ খ্রি:) একটি থানা। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে এখানে ছিল একটি মুন্সেফি চৌকিও। তবে বর্তমানে রায়গঞ্জ উত্তর দিনাজপুর জেলার অন্যতম মহকুমা ও জেলা সদর রূপে পরিচিতি লাভ করে। সেই সুবাদে উত্তর দিনাজপুর জেলার হেডকোয়াটার হয় রায়গঞ্জ কর্ণজোড়া। প্রসঙ্গক্রমে একথা উল্লেখের দাবী রাখে যে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে রাজ্যপুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বিহারের পূর্ণিয়া জেলার ৭৩২.৮৮ বর্গ মাইল এলাকা ৩৮৫৮ নং বিজ্ঞপ্তি বলে ১লা নভেম্বর তারিখে দার্জিলিং জেলার সঙ্গে বিযুক্ত করা হয় এবং তার পরেই দিনেই অর্থাৎ ২রা নভেম্বর ১৮৭৫ নং বিজ্ঞপ্তি বলে লক্ষ করা যায় যে, ঐ অংশ পশ্চিম দিনাজপুর জেলার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হলো। আবার দেখা যায় ২০শে মার্চ ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে উপরোক্ত এলাকার যে অংশ মহানন্দা নদীর উত্তর পাড়ে অবস্থিত সেই অংশ দার্জিলিং জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সেই ১৯৫৯ সালে ২০ শে মার্চ এই নতুন এলাকা নিয়ে ইসলামপুর মহকুমা গঠন করা হয়। শুধু তাই নয়, তার আগে অর্থাৎ

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের দিকে বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি অনুসারে জানা যায় যে, এই মহকুমার চোপড়া, ইসলামপুর, গোয়ালপোখর, করণদিঘী থানা গঠিত হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে গোয়ালপোখর থানার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত হয় চাকুলিয়া থানা। এবং তা পরে ইসলামপুর মহকুমাভুক্ত হয়। মোটকথা রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ক্রমবিন্যাসের মধ্য দিয়ে বর্তমানে উত্তর দিনাজপুর জেলা ৯টি থানা নিয়ে গঠিত, যথা— ১. রায়গঞ্জ, ২. কালিয়াগঞ্জ, ৩. হেমতাবাদ, ৪. ইটাহার, ৫. করণদীগি, ৬. গোয়ালপোখর, ৭. চাকুলিয়া, ৮. ইসলামপুর ও ৯. চোপড়া।

স্বাধীনোত্তর পশ্চিম দিনাজপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত উত্তর দিনাজপুর জেলার নাট্যচর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে রায়গঞ্জ সদর মহকুমার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আমরা অবগত হয়েছি যে, ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে জমিদার যতীন গোস্বামীর উদ্যোগে স্বীয় বন্দরস্থিত বাসভবনের প্রাঙ্গনে মঞ্চ বেঁধে আমন্ত্রিত অতিথিদের সম্মুখে 'বিজয়া' নাটকটি মঞ্চস্থ করার মধ্য দিয়ে রায়গঞ্জে প্রথম নাটকের সূচনা হয়। সুতরাং উত্তর দিনাজপুরের নাট্য-ইতিহাসে 'বিজয়া' নাট্য প্রযোজনাটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। সেদিক দিয়ে বিভক্ত দিনাজপুরের (পশ্চিম দিনাজপুর) উত্তর ভূমিখণ্ডে রায়গঞ্জ সদর মহকুমার সৌখিন প্রয়াস— সমৃদ্ধ নাট্যচর্চার গুরুত্ব উল্লেখযোগ্য। মোটকথা, বিশ শতকের একেবারে গোড়া থেকেই পশ্চিম দিনাজপুরের মহারাজাদের তথা জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাক্-স্বাধীনতাপর্বের সময়কালে নাট্যচর্চা অবিরামভাবে হয়েছে এবং এই পদাঙ্ক অনুসরণ করে স্বাধীনোত্তরকালে উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ মহকুমার নাট্যচর্চা অবিশ্রান্ত-ভাবে এগিয়ে চলেছে।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে রায়গঞ্জ সদর মহকুমার রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট রঙ্গমঞ্চকে কেন্দ্র করেই এখানকার নাট্যচর্চা ক্রমশ: উত্তরণের পথে অগ্রসর হয়। যতদূর জানা যায় স্বাধীনতার পর প্রায় এক বছর রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট মঞ্চে কোন নাট্যাভিনয় হয়নি। তবে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে এই স্নেহলতা হলে ডি.এল. রায়ের ঐতিহাসিক নাটক 'মেবার পতন' তিনবার মঞ্চস্থ করার মধ্য দিয়ে নাটকে সূত্রপাত হয়। মোটকথা স্বাধীনোত্তর পর্বের প্রথমার্ধ থেকেই রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট রায়গঞ্জে নাট্যচর্চার এক বিশাল অগ্রগতির পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২০ ডিসেম্বর এই নাটকের প্রথম অভিনয়ের পরিচালক ছিলেন প্রফুল্ল ভট্টাচার্য। এই 'মেবারপতন' নাটকের প্রথমবারের চরিত্রলিপি নিম্নরূপ ছিল বলে জানা যায়—

রানা অমর সিং: অসিত (পাঁচকড়ি) সেন, সাগর সিং: প্রফুল্ল ভট্টাচার্য, মহাবৎ খাঁ: সতীশচন্দ্র গুপ্ত, অরুণ সিং: রণেন (রানু) বসু, গোবিন্দ সিংহ: নির্মল ঘোষ, অজয় সিং: সুশীল সেন (দিনাজপুর থেকে আগত), হেদায়েৎ খাঁ: সুরেন্দ্র (সুরা) নাগ, আবদুল্লা: অজিত (বাবু) বসু, মহারাজা গজসিং:

কিষণ লাল ঘোষ (পচা ঘোষ), হুসেন: যুধিষ্ঠির দাস, কৃষ্ণদাস: যোগেশ মুখার্জী, অমর সিং: শান্তি চক্রবর্তী, জাহাঙ্গির : দোকড়ি দাস, সাজাহান: অংশুমান গুপ্ত।

দস্যু ১/২: চিত্ত দাস/ আশু পাল, রা: খৈনিক ১/২ শান্তি/গোপাল।

নারী চরিত্রে : পুরুষরা — রাণী রুক্মিনী: শরৎদেব, মানসী : ভজুয়া, সত্যসতী: কৈলাস দাস কল্যাণী: গিরিজা দাস, ছবিওয়ালি: কুলদা দাস।

এর পর ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ১০ জানুয়ারী 'মেবার পতন' দ্বিতীয় বার অনুষ্ঠিত হয় সতীশচন্দ্র গুপ্ত ও কল্যাণকুমার (মানু) গোঁসাইয়ের যৌথ পরিচালনায়। চরিত্রাভিনেতাদের নামের কিছু রদবদল করা হয়েছিল। সতীশচন্দ্র গুপ্তের পরিচালনায় এই 'মেবারপতন' নাটকটি ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ২৪ ফেব্রুয়ারি তৃতীয়বার অভিনীত হয় বলে জানা যায়। তবে এই নাটকের নির্বাচন ও অভিনেতাদের দক্ষ অভিনয় রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটের মহারাণী স্নেহলতা হলের অভিনয়ের ক্ষেত্রে এক সম্পূর্ণ নতুন প্রবাহ শুরু করে, যা ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দ্রুতবেগে প্রবাহিত হয়েছিল। এই নাটকের প্রথম দুই রাত্রির অভিনয়ে সতীশচন্দ্র গুপ্ত ছাড়াও দিনাজপুর থেকে বদলি হয়ে আসা সুশীল সেন ও যুধিষ্ঠির দাস ভীষণ মঞ্চসফল অভিনয় করেন। এমনকি এই নাটকের সাফল্য ও দর্শকদের চাহিদাতে তিনবার (চারবার হওয়ার কথাও ছিল) মঞ্চস্থ হয় এই নাটকে। তবে এই নাটকে মহাবৎ খা চরিত্রে পূর্বের সতীশচন্দ্রের অভিনয়ের জায়গায় তৃতীয়বার অভিনয় করেন কল্যাণ (মানু) কুমার গোঁসাই যথেষ্ট দক্ষতা ও নৈপুণ্যের সঙ্গে। এবং আশুতোষ বাগচী বেশ আকর্ষণীয় অভিনয় করেছিলেন বলে যানা যায়।[৬১]

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১১ই মার্চ শিবচতুদর্শী শিবরাত্রির দিন সারারাত ধরে এই নাট্যমঞ্চে তিনটি নাটক, যথা— ১. শিবচতুর্দশী , ২. অতিথি ও ৩. কুব্জ ও দরজী অনুষ্ঠিত হয়। এই তিনটি নাটক সাধারণ মানুষের কাছে আকর্ষণীয় হয়েছিল শিবরাত্রির দিনে উপবাসের পর রাত্রি জাগার উপকরণ হিসাবে। এই নাটকগুলির অভিনয় দেখার জন্য যথেষ্ট সংখ্যায় দরিদ্র ঘরের মেয়েদের সমাগম হয়েছিল। এমনকি সূর্যোদয় পর্যন্ত এই নাটক চলছিল বলে জানা যায়। 'কুব্জ ও দরজী' নাটকটি ছিল তৎকালীন গ্রামাঞ্চলে বহু অভিনীত নাটক। এরপর ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ৭ই এপ্রিলে আবার তিনটি নাটক অভিনীত হয় সাফল্যের সঙ্গে। এই নাটকগুলি হল— ১. অতিথি, ২. রাতকানা, ৩. বেজায় রগড়। প্রথম নাটকের পরিচালক ছিলেন সতীশচন্দ্র গুপ্ত, দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে কল্যাণ গোঁসাই ও তৃতীয়টির পরিচালক ছিলেন পাঁচকড়ি সেন। তবে শিবরাত্রির দিন দর্শকদের বিপুল সমাগম দেখে সম্ভবত পুনরায় সারারাত্রি ব্যাপী নাটকের পরিকল্পনা করা হয়েছিল প্রত্যাশিত সংখ্যক দর্শক বিশেষ করে সাধারণ দর্শক টানার জন্য রাত ৯.৩০ মিনিট থেকে এই নাটকগুলির অভিনয় শুরু হয়েছিল।

২১শে মে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে এই ইনস্টিটিউট মঞ্চে সেকালের সবচাইতে জনপ্রিয় ঐতিহাসিক নাটক ডি.এল রায়ের 'সাজাহান' মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকটির পরিচালনা করেন প্রফুল্ল কিশোর ভট্টাচার্য এবং জানা যায়, নানা সাব-কমিটি গঠন করে বিরাট ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে এই নাটকের মহলা চলে প্রায় দেড় মাস ধরে। তৎকালে গ্রাম-শহরগুলিতে অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা 'পপুলার' নাটক ছিল 'সাজাহান'। এমনকি শহরে দুবার লীফলেট ছড়িয়ে ব্যাণ্ড পার্টি বাজিয়ে এই নাটকের প্রচার করা হয়েছিল।

তবে কলকাতার মঞ্চ ছাড়াও ১৯৫০-এর দশক পর্যন্ত অবিভক্ত বাংলার প্রায় প্রত্যেকটি জেলায় এই নাটক বারেবারে অভিনীত হয়েছে। এই নাট্যমঞ্চেও অতিযত্ন সহকারে মঞ্চস্থ করা হয়েছিল। এই নাটকের মঞ্চে অভিনয় চলাকালীন অবস্থায় সতীশচন্দ্র গুপ্তের ঔরঙ্গজেব অভিনয় দর্শকদের অন্তরে জ্বালা সৃষ্টি করেছিল। এর মাঝে ক্রুদ্ধ দর্শকরা যখন দেখেন যশোবন্ত সিংহরূপী কল্যাণ (মানু) গোঁসাই সিংহ গর্জনে ঔরঙ্গজেবকে তিরস্কার ও যুক্তি-তর্কে তাকে আক্রমণ করেছেন তখন দর্শকরা আনন্দে ফেটে পড়তেন এবং তাদের ঘন ঘন হাততালির কারণে নাটকের ডায়লগ শোনা যেত না। সাজাহানের ভূমিকায় দেখা যায় প্রবীন অভিনেতা প্রফুল্ল কিশোর ভট্টাচার্য মনের যন্ত্রণা, বেদনা ও দীর্ঘশ্বাসকে জীবন্তরূপে দক্ষতার সাথে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। দিলদার চরিত্রে সার্থক অভিনয় করেন দেবেন্দ্র গোঁসাই। এছাড়াও জাহানারার ভূমিকায় কৈলাস দাস, নাদিরার ভূমিকায় অশ্বিনীকুমার সাহা ও পিয়ারার ভূমিকায় ননী অধিকারী যথেষ্ট চমৎকার অভিনয় করেছিলেন। এবং সঙ্গীতে সুর দেন অসিত (পাঁচ কড়ি) সেন। তৎকালে রায়গঞ্জে মার্চ মাসের দিকে শীতের প্রকোপের জন্য এই নাটক রাত্রি ১০টা নাগাদ শুরু হয়েছিল এই কারণে যে, দর্শকরা রাতের খাবার খেয়ে এসে নিশ্চিন্তে সারারাত নাটক দেখতে পারেন। এই নাটকের অভিনয় দেখতে শুধু রায়গঞ্জ শহর নয়, এছাড়াও কালিয়াগঞ্জ, দুর্গাপুর, বাঙ্গালবাড়ি, বিন্দোল, কমলাবাড়ি হাট থেকে প্রচুর মানুষ এসেছিলেন ও বিপুল ভিড় হতে দেখা যায়। দর্শক সমাজে বিপুল আগ্রহ এবং সেই সঙ্গে নাটকের প্রযোজনা ব্যয় পূরণের জন্য সাজাহান নাটকটি দ্বিতীয়বার রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটে ৫ই জুন ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে মঞ্চস্থ হয়। তবে এবারে বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটে। পরিচালক হলেন সতীশচন্দ্র গুপ্ত। ঔরঙ্গজেব চরিত্রে সতীশচন্দ্র গুপ্তের জায়গায় কল্যাণ (মানু) গোঁসাই অভিনয় করেন। দিলদারের ভূমিকায় দেবেন গোঁসাইয়ের স্থলে সতীশচন্দ্র গুপ্ত, জাহানারার ভূমিকায় কৈলাস দাসের পরিবর্তে বিন্দোলের জমিদার এমনকি নারী চরিত্রে অভিনয়ে প্রখ্যাত কামিক্ষ্যা চ্যাটার্জী, নাদিরা চরিত্রের ভূমিকায় অশ্বিনীকুমার সাহার পরিবর্তে মালদহ থেকে এসে বিমল দাশগুপ্ত, পিয়ারা চরিত্রে দিনাজপুর থেকে এসে সুতান সরকার প্রমুখের অভিনয় নাটকটিকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেয়। বিশেষ করে কামিক্ষ্যা চ্যাটার্জীর

জাহানারা ম্লান করে দেয় সকলকে। এছাড়া নারী চরিত্রে প্রত্যেকের অভিনয় পুরুষদের চরিত্রাভিনয়কে অতিক্রম করে গিয়েছিল তাঁদের অসামান্য দক্ষতায়। এই নাটকে যাঁরা অভিনয় করেছিলেন তাঁদের প্রত্যেকের চেয়ে বয়সে যথেষ্ট বড় ছিলেন কামিক্ষ্যা চ্যাটার্জী। কিন্তু জানা যায় সম্রাট কন্যার রূপ ও সজ্জাতে তিনি হয়ে উঠেছিলেন প্রায় উর্ব্বশী। এর ফলে তিনি দর্শকদের কাছ থেকে প্রবল প্রশংসা পেয়েছিলেন।

সতীশচন্দ্র গুপ্তের পরিচালনায় এই নাট্যমঞ্চে ৭ই জুলাই ১৯৪৮-এ 'থামাও রক্তপাত' এবং ১৫ই আগস্ট ১৯৪৮ তারিখে 'স্বর্গ হতে বড়' দুটি সামাজিক নাটক বেশ সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়। এরপর দেখা যায় সতীশচন্দ্র গুপ্ত ও কল্যাণ গোঁসাই-এর যুগ্মভাবে পরিচালনায় ২রা অক্টোবর ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুই পুরুষ' মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকের চরিত্রাভিনয়ে যে সব অভিনেতারা অংশগ্রহণ করেন বলে জানা যায়, তাঁরা হলেন— নটুবিহারী: কল্যাণ (মানু) কুমার গোঁসাই, অরুণ: রঞ্জন কুমার চৌধুরী, বরুণ: মাস্টার দুলু নাগ, মহাভারত: যুধিষ্ঠির দাস, কমলাপদ : সুখেন চন্দ্র ঘোষ, সুশোভন সুশীলকুমার সেন, বিপিন: শান্তি চক্রবর্তী, শিবনারায়ণ: আশুতোষ বাগচী, দেবনারায়ণ: কিষণলাল ঘোষ, গোপীনাথ: সতীশচন্দ্র গুপ্ত, কালী বাগদী: মুকুন্দ দাস, বৃদ্ধ: উদয়চন্দ্র চৌধুরী, জজ: অঞ্চল ঘোষ, জুরি: নিবারণ নন্দী, হেমন্ত দত্ত ও যোগেন মুখার্জী, চাকর : আশু পাল, প্রতিবেশী: গোপাল পোদ্দার, দারোয়ান: নিবারণ নন্দী, ডাক্তার: নির্মল কুমার (গুগলী) গোঁসাই। স্ত্রী ভূমিকায় মঞ্চসফল পুরুষ অভিনেতারা হলেন— বিমলা: ননী অধিকারী, শ্যামা: ভোলা চক্রবর্তী, সাতু: দেবেন্দ্র গোঁসাই, কল্যাণী : অশ্বিনীকুমার সাহা, মমতা: নীলোৎপল (নীলু) ঘোষ, জমিদার গৃহিণী: অর্ধোদয় চক্রবর্তী।

আমরা আগেই জেনেছি যে, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুই পুরুষ' (১৯২৬) অবিভক্ত দিনাজপুর শহরের 'দিনাজপুর নাট্যসমিতি'-র মঞ্চে অভিনীত ও উচ্চ প্রশংসিত নাটক। সেখানে 'নটুবিহারী'র চরিত্রে অভিনয় করেছিল দিনাজপুর শহরের শ্রেষ্ঠ নট ও নাট্যকার শিবপ্রসাদ কর এবং সুশোভন চরিত্রে সতীশ চন্দ্রর গুপ্তের অভিনয় ছিল একটি প্রায় 'মিথ' তুল্য ঘটনা। তবে যতদূর জানা যায়, রায়গঞ্জের এই মঞ্চে চরিত্রাভিনয়ের কাস্টিং-এর সময় সুশোভন চরিত্রে সতীশচন্দ্রের অভিনয়ের জোরালো দাবিসমূহ মৃদু প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও সতীশচন্দ্র তাঁরই দিনাজপুরের সহ-অভিনেতা ও বন্ধু সুশীল কুমার সেনের নাম নির্বাচিত করেন। কিন্তু তার নির্বাচন ভুল ছিল না। যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে সুশোভন চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছিলেন। নটুবিহারী চরিত্রে দেখা যায়, মানু গোঁসাই অভিনয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করে দর্শকদের মুগ্ধ করে দিয়েছিলেন। এবং গোপীনাথ চরিত্রেও সতীশচন্দ্র তাঁর অভিনয় দক্ষতার প্রমাণ রাখলেন। সেই সঙ্গে অরুণের ভূমিকায় রঞ্জন চৌধুরী পরিণত অভিনয়

করেন। এছাড়াও নারী ভূমিকাতে প্রত্যেক পুরুষ অভিনেতার অভিনয় হয়েছিল উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয়। সামাজিক, পূর্ণাঙ্গ ও সিরিয়াস নাটক হওয়া সত্ত্বেও এই নাটকের প্রথমবার অভিনয়ে-র চেয়ে পরবর্তী অভিনয়ে দর্শক সমাগম বেশি হয়েছিল।

এরপর রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে সেপ্টেম্বরে সতীশচন্দ্র গুপ্তের পরিচালনায় ও সরোজিনী বালিকা বিদ্যালয়ের উদ্যোগে মন্মথ রায়ের 'সাবিত্রী সত্যবান' নামে পৌরাণিক নাটক অভিনীত হয়। এই নাটকের অভিনয়ে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন বলে যানা যায়, তাঁরা হলেন— ফুলু বসু, কবিতা বসু, শিপ্রা চ্যাটার্জী, টুলু বসু, গীতা চৌধুরী, শুভাশীষ গুপ্ত ও সমরজিৎ (রানু) বসু প্রমুখ।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বরের শেষ লগ্নে সতীশচন্দ্র গুপ্তের পরিচালনায় বিধায়ক ভট্টাচার্যের সামাজিক নাটক 'মাটির ঘর' অনুষ্ঠিত হয়। এই নাটকের ব্যবস্থাপনার জন্য দেখা যায়— ক. স্টেজ, খ. সীন ও স্ক্রীন, গ. পেইন্টিং ও পোশাক, ঘ. ঐক্যতান, ঙ. বুকিং, চ. পুরুষদের বসানোর ব্যবস্থাপনা ও ছ. নারী দর্শকদের বসানো প্রভৃতি বিস্তৃত দায়িত্ব বন্টন করা হয়েছিল। যদিও অতীতে এই রকম ব্যবস্থাগুলি 'অ্যাডহক' ভিত্তিতে ছিল। কিন্তু এবারে এই নাটকের মহলার শুরু থেকেই পূর্বোক্ত ব্যবস্থাগুলির জন্য দায়িত্ব বন্টন করা হয়।

১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের দিকে রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউ নাট্যমঞ্চে অনেকগুলি নাটক মঞ্চস্থ হতে দেখা যায়। এই শতকের ১৫ই জানুয়ারী সতীশচন্দ্র গুপ্তের নির্দেশনায় এই মঞ্চে একরাতে ৩টি সামাজিক নাটক অভিনীত হয়। এই নাটকগুলি হল— ১. গুরুঠাকুর, ২. সবুজ সুধা, ও ৩. প্রেমের চিকিৎসা। এই নাটক তিনটি দেখতে বিপুল দর্শক সমাগম হয়েছিল। জানা যায়, কর্পূর চাঁদের ভূমিকায় যুধিষ্ঠির দাস, দাদামশাই চরিত্রে কল্যাণ গোঁসাই, তিলকাঞ্চন ও কবিরাজের টাইপ চরিত্রের সতীশচন্দ্র গুপ্ত এবং বেনারসীর ভূমিকায় ননী ভট্টাচার্য যথেষ্ট সার্থক মঞ্চসফল অভিনয় করেছিলেন। এই, সময়ে ২৫শে ফেব্রুয়ারি শিবচতুর্দশীর দিন শিবরাত্রি উপলক্ষে সারারাত ব্যাপী পৌরাণিক ও সামাজিক নাটক অনুষ্ঠিত হয়। যথা— ১. শিবচতুর্দর্শী, ২. আপ টু ডেট, ৩. ভূতের বিয়ে ও ৪. সবুজ সুধা। এই নাটকগুলির পরিচালক কে বা কারা ছিলেন তার কোনো উল্লেখ পাওয়া না গেলেও বেশ কয়েকজন নতুন অভিনেতা রায়গঞ্জ মহারাণী স্নেহলতা হলে তথা মঞ্চে এই নাটকগুলির মাধ্যমে আবির্ভূত হতে শুরু করেছিলেন। এরপর সতীশচন্দ্রের পরিচালনায় ৩১ শে মে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে মহেন্দ্র গুপ্তের 'কঙ্কাবতীর ঘাট' এবং ২৪ শে সেপ্টেম্বর দ্বিতীয়বার 'থামাও রক্তপাত' সামাজিক নাটক মঞ্চস্থ হয় বলে যানা যায়।

বিংশ শতাব্দীর পাঁচ-এর দশকেও লক্ষ করা যায় ইনস্টিটিউট মঞ্চে 'চ্যারিটি শো' হিসেবে

সাড়া জাগানো কিছু নাটক মঞ্চস্থ হয়। এই সময়ে দেখা যায় প্রফুল্ল ভট্টাচার্য, কল্যাণ গোঁসাই ও কিষণ ঘোষকে মিলিত ভাবে পরিচালকের দায়িত্ব দেওয়া হয়, কিন্তু তাঁর চারমাস বিভিন্নভাবে চেষ্টা করা সত্ত্বেও বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের পৌরাণিক ও কল্পনাশ্রয়ী ঐতিহাসিক বিষয়ের সংমিশ্রণে রচিত নাটক 'মিশর কুমারী' (১৯১৯), মঞ্চস্থ করতে না পারায় সতীশচন্দ্র গুপ্তকে পরিচালনা করার ও মঞ্চস্থ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। তখন এই মঞ্চের নাট্যবিভাগের সম্পাদক ছিলেন সমর মুন্সী, সতীশচন্দ্র গুপ্ত পুরনো কাস্টিং-এর প্রচুর অদল বদল করে-এই নাটকটি ১৯৫০খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে মঞ্চস্থ করেন। এই সময়ে রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট মঞ্চে নবাগতদের নাট্যাভিনয়ে ক্রমশ অংশগ্রহণ ও প্রতিষ্ঠা নিতে শুরু করেন। সেই সকল অভিনেতারা হলেন সুশীল সেন, যোগেশ মুখার্জী, রঞ্জন রায়, সমর মুন্সী, মুকুল সেন, অধীর মুখার্জী প্রমুখ। মেকআপ দিতে দিনাজপুর থেকে এসেছিলেন শম্ভু চক্রবর্তী। তখন জানা যায় কাটিহার থেকে ড্রেস ও মেকআপ সামগ্রী আনা হতো। এমনকি উইগ, ক্রেপ ইত্যাদি কলকাতার আব্দুল বারির দোকান থেকে ক্রয় করা হতো। এই সময়ে যে সাব কমিটি গঠন করে প্রম্পটিং-এর দায়িত্ব জ্যোৎস্না সেন ও কুমার ঘোষকে দেওয়া হয়। কল্যাণ গোঁসাই বা সতীশচন্দ্র গুপ্তকে বাদ দিলে এই মঞ্চে প্রথম খ্যাতি ও প্রশংসা অর্জন করেন সমর মুন্সী এই নাটকের কাকাতুয়ার ভূমিকায়। এবং কাফ্রী যুবকের সামান্য ভূমিকায় প্রশান্ত (খোকা) ভৌমিক যথেষ্ট প্রশংসনীয় ও মঞ্চ সফল অভিনয় করেছিলেন।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে দাঙ্গা এবং তার ফলস্বরূপ রায়গঞ্জের বিপুল সংখ্যায় উদ্বাস্তু আগমনের কারণে তাঁদের আর্থিক সাহায্যার্থে 'চ্যারিটি শো' হিসাবে ২৫ মার্চ ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ইনস্টিটিউট মঞ্চে সতীশচন্দ্র গুপ্ত ও কল্যাণ গোঁসাইয়ের যৌথ পরিচালনায় 'সাজাহান' নাটকটি অনুষ্ঠিত হয়। তারপর ২৫বৈশাখে (মে, ১৯৫০) রায়গঞ্জে প্রবল ও ভয়ঙ্কর কালবৈশাখী ঝড়ে বিপুল ক্ষতি হয়। এর ফলে লক্ষ করা যায় রায়গঞ্জ বিদ্যাচক্র স্কুল প্রয়াস সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হওয়ার ফলে এই স্কুল কর্তৃপক্ষ ইনস্টিটিউটের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে পত্র দেওয়ায় 'চ্যারিটি শো'র মাধ্যমে টাকা সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তখন এই সময়ে নাট্যবিভাগের সম্পাদক সতীশচন্দ্র গুপ্তের পরিচালনায় ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে অভিনীত হয়, রবীন্দ্রনাথ মৈত্রর রচিত সামাজিক নাটক 'মানময়ী গার্লস স্কুল'। এই সময়ে সেপ্টেম্বরের দিকে দিনাজপুর শহরের (তখন পূর্ব পাকিস্তান ভুক্ত) অভিনেতাদের দিয়ে ও দিনাজপুর শহরের নট ধীরেন্দ্রনারায়ণ (ধীরু) ঘোষের পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিসর্জন নাটকটি রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট অভিনীত হয়। এই নাটকের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল, তা হলো অতীতের মতো নাটকের রীতি অনুযায়ী অঙ্কিত 'ব্যাক ড্রপ' ব্যবহৃত হওয়ার বদলে কেবল মাত্র সাদা পটভূমিকা ব্যবহার ও বাঁশের বাঁশির নেপথ্য সঙ্গীত প্রয়োগ

করা হয়।

১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারীর দিকে সতীশচন্দ্র গুপ্তের পরিচালনায় বিধায়ক ভট্টাচার্যের সামাজিক নাটক 'বিশ বছর আগে' ভীষণ সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমবারের চেয়ে দ্বিতীয়বার 'বিশ বছর আগে' নাটকের অভিনয় বেশ উন্নত ও দর্শকপ্রিয় হয়েছিল। বিশেষ করে সুশীল সেন, বিমল দাশগুপ্ত ও সুতান সরকারের অনবদ্য অভিনয় দর্শকদের ভীষণ মুগ্ধ করেছিল। এই তিনজন মূলত রায়গঞ্জবাসী ছিলেন না। যদিও তাঁরা ছিলেন দিনাজপুর শহরের নাট্যমঞ্চের বহুকালের অভিনেতা। এই ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের শেষের লগ্নে ডা. অজিত দাশগুপ্তের পরিচানায় ইনস্টিটিউট মঞ্চে বেশ সাফল্যের সঙ্গে 'জয়দেব-পদ্মাবতী' নাটক বেশ সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল বলে যানা যায়।

উত্তর দিনাজপুর জেলার মঞ্চ-শিল্পে 'কো-অ্যাকটিং' বা সহ-অভিনয় ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের শুরু হতে দেখা যায়। তাই লক্ষ করা যায় যে, পঞ্চাশ দশকের প্রথমার্ধে স্ত্রী— ভূমিকায় পুরুষ অভিনেতারাই অভিনয় করলেও ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের দিকে প্রথম মহিলা শিল্পীরা স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউড মঞ্চে কো-অ্যাকিটং ব্যবস্থা প্রচলন করার প্রথম মহড়া হিসেবে সতীশচন্দ্র গুপ্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'নিষ্কৃতি' নাটক (নাট্যরূপ দেবনারায়ণ গুপ্ত) ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে মঞ্চস্থ করেন। এই নাটকে নারীরা নারী ভূমিকায় এবং পুরুষদের ভূমিকায় নারীদের প্রথম অভিনয় করতে দেখা যায়। অর্থাৎ নারীরা নারী চরিত্রে একমাত্র অভিনয় করলে ইনস্টিটিউট কতৃপক্ষ এবং রায়গঞ্জের সমাজপতিদের বিরোধীতা করার বিষয়টিকে মাথায় রেখে সতীশচন্দ্র নারীদের পুরুষ ভূমিকায় নামিয়ে মঞ্চে পুরুষদের সঙ্গে নারী অভিনেত্রীদের উপস্থিতিকে মানিয়ে নেবার উদ্যোগ তথা কৌশল গ্রহণ করেছিলেন। আবার অন্যদিক থেকে এই সময়ে সহ-অভিনয়-এর নতুন সুযোগ তৈরি হয় রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটের কর্তৃপক্ষ ছাড়াও তৎকালী শিক্ষিত ও প্রশাসনিক কর্মে যুক্ত বিশেষ কিছু মানুষের মাধ্যমে দেখা যায়। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের জুনের দিকে 'রায়গঞ্জ অফিসার্স ক্লাব'-এর উদ্যোগে প্রযোজিত হয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিজয়া' উপন্যাসের নাট্যরূপ। এই নাটকে আমন্ত্রিত পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন সতীশচন্দ্র গুপ্ত। উক্ত নাট্য-প্রযোজনায় অভিনয় করেছিলেন অমিতাভ সেনগুপ্ত (সাব-ডিভিশনাল এগ্রিকালচার অফিসার), গৌতমা দেবী (সাব-ডিভিশনাল পুলিশ অফিসারের স্ত্রী), তৃপ্তি মিত্র, বেলা সরকার (কাস্টমস্ অফিসারের স্ত্রী), জীতেন মজুমদার (গভর্নমেন্ট প্লিডার), জ্যোৎস্না সেনগুপ্ত (রায়গঞ্জ কলেজের 'টিউটর') প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এই নাটক থেকেই প্রকৃতপক্ষে কো-অ্যাক্টিং শুরু হয়। অর্থাৎ এই 'বিজয়া' নাটকে নায়িকাসহ অন্যান্য স্ত্রী-ভূমিকাতে পরিণত বয়স্কা নারীরা প্রথম অভিনয় শুরু করেন। রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটে 'কো-অ্যাকটিং'

প্রথা চালু করা সহজ হবে না জেনেও সতীশচন্দ্র তারাশংকরের সামাজিক নাটক 'কালিন্দী' বেছে নিয়ে বাইরের বিশিষ্ট খ্যাতনামা অভিনেতা- অভিনেত্রীদের দিয়ে পুরুষ ও নারীদের সংমিশ্রণে অভিনয় করানোর উদ্যোগ নিলেন এবং সেই সঙ্গে দিনাজপুর জেলার বিখ্যাত নট ও নাট্যকার শ্রদ্ধেয় শিবপ্রসাদ করের উপর এই নাটক পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। তা সত্ত্বেও সতীশচন্দ্রের কো-অ্যাক্টিং চালু করার বিষয়টিকে রায়গঞ্জের রক্ষণশীল সমাজ মেনে নিতে পারেননি এবং জানা যায় যে, ইনস্টিটিউট মঞ্চে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরের শেষের দিকে 'কালিন্দী' নাটকটি অভিনীত হয়। এমনকি এই নাটক পরেও শিবপ্রসাদ করের পরিচালনায় ও নেতৃত্বে বেশ কয়েকবার অভিনীত হয়েছিল। তবে প্রসঙ্গক্রমে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই নাটকটিই ছিল রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটের নিজস্ব প্রযোজিত নাটকে 'কো-অ্যাক্টিং'-এর প্রথম পদক্ষেপ। এবং রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটের এই নাট্য-প্রযোজনা যথেষ্ট সার্থকতা ও জনপ্রশংসা লাভ করেছিল এমনকি নটু বিহারীর ভূমিকায় দিনাজপুরের সর্বাপেক্ষা খ্যাতনামা ও শ্রেষ্ঠ অভিনেতা শিবপ্রসাদ কর দর্শকদের ভীষণভাবে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করে তুলেছিলেন। কিন্তু এরপর দেখা যায় নারীদের নিয়ে কো-অ্যাক্টিং বা সহ-অভিনয়ের মাধ্যমে নাট্যপ্রযোজনা রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ বন্ধ করে দেন। এর ফলে সতীশচন্দ্রও স্পষ্টভাবে জানান যে কো-এ্যাক্টিং ছাড়া কোন নাটক এখানে মঞ্চস্থ হবে না। প্রায় এক বছরের বেশী সময় ধরে এই ঠাণ্ডা লড়াই চলেছিল। পরিশেষে তৎকালীন রায়গঞ্জের এস.ডি.ও অরুণ মুখার্জী ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষের উপর সরকারী নাটক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করায় ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন অবিভক্ত পশ্চিম দিনাজপুর জেলাতে 'পশ্চিমবঙ্গ লোকচিত্ত বিনোদন অনুবিভাগে'র আহ্বানে জেলা নাট্য প্রতিযোগিতায় রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট মঞ্চে 'কালিন্দী' নাটক দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ও ২৪ মে অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালক ছিলেন সতীশচন্দ্র গুপ্ত। কাস্টিং পরিবর্তিত হয় এবং নারীরাই নারীর ভূমিকায় অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন। সতীশচন্দ্র গুপ্ত রামেশ্বরের ভূমিকায় অভিনয় করেন। পুরুষ চরিত্রে অন্যান্য যাঁরা অংশ গ্রহণ করেন, তাঁরা হলেন— কল্যাণ গোঁসাই, বারীন রায়, পরিতোষ সরকার, কালী নন্দী, জীতেন মজুমদার, যতীন দে, নির্মল গোঁসাই, অজিত বসু, কিষণলাল ঘোষ, অধীর মুখার্জী, যুধিষ্ঠির দাস, সত্য ঘোষ, রঞ্জন চৌধুরী, নীলোৎপল রায় ও প্রমুখ। নারী চরিত্রে পূর্ণিমা চক্রবর্তী, তৃপ্তি রায়, গীতা বসু, কৃষ্ণা চক্রবর্তী, প্রণতি গুপ্ত, মিনতি গুপ্ত, পম্পা সেনগুপ্ত, অলকা সেন, লিপিকা সেন, অনিমা চক্রবর্তী, ভারতী গুপ্ত, শকুন্তলা ঘোষ প্রমুখ।

নৃত্যপরিকল্পনা : প্রণতি গুপ্ত, সুর সৃষ্টি: অমিত সেন, দৃশ্যপট: জ্যোতি চাকী। রূপসজ্জা : বীরেন রায়, কৈলাস দাস ও অজিত বোস। আলোকসজ্জায়: তুলসী আগরওয়াল ও নগেন সিংহ।

প্রচার: পরিতোষ সরকার ও কালী নন্দী। ব্যাবস্থাপনায়: যতীন দে। টিকিটের হার— স্পেশাল ৩টাকা, প্রথম শ্রেণি ২ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণি ১টাকা, তৃতীয় শ্রেণি ১২ আনা, ছাত্রছাত্রী ৮আনা এবং মহিলা ৬ আনা। আরও জানা যায়, রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট এই নাটকটি নিয়ে বালুরঘাটে অনুষ্ঠিত নাট্য— প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করায় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। তবে জয়ী হয় বালুরঘাট নাট্যমন্দির ও শ্রেষ্ঠ অভিনেতা নির্বাচিত হন শিবপ্রসাদ কর। রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটের কর্তৃপক্ষের এই জাতীয় পশ্চাদপদতাকে প্রত্যাঘাত করার অর্থাৎ নারী অভিনেত্রীদের নিয়ে কো-অ্যাক্টিং বা সহ-অভিনয়ের পক্ষে আর একটি সুযোগ এ এসেছিল ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট নবম স্বাধীনতা দিবসে জনহিতকর প্রতিষ্ঠানাদির সাহায্যকল্পে' রায়গঞ্জ 'অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন'র দ্বারা তারাশঙ্করের 'দুই পুরুষ' নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে। এই নাটকের প্রযোজনার দায়িত্বে ছিলেন রায়গঞ্জের তৎকালীন এস.ডি ও অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় এবং পরিচালনায় সতীশচন্দ্র গুপ্ত ও বিশ্বনাথ মুখার্জী। নাটকের কুশীলবগণের মধ্যে ছিলেন— নটুবিহারী: আদর্শ দেশসেবক প্রতুল সেন, অরুণ: ওই পুত্র: অমিতাভ সেনগুপ্ত, বরুণ: ওই পুত্র: অরুণ সরকার, মহাভারত : ওই আশ্রিত চাষী: বিশ্বানাথ মুখার্জী, কমলাপদ: ওই, বঙ্কু: ননীগোপাল সরকার, সুশোভন : ওই, ছাত্র: জ্যোৎস্না কুমার সেন, বিপিন: ওই, মহুরী: রমেশচন্দ্র গিরি, শিবনারায়ণ : কঙ্কনার জমিদার: ডা: বৃন্দাবন বাগচি, দেবনারায়ণ: ওই পুত্র: জ্যোতির্ময় নাথ, গোপীনাথ: ওই গোমস্তা: জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার, কালী বাগদী: ওই প্রজা: জিতেন্দ্রনাথ পাল, রাজেন: উকিল রণজিৎ গাঙ্গুলী। কোহিনীকুমার দে, সলিলকুমার বর্ধন, মনীন্দ্রনাথ রায় ইত্যাদি আরও অন্যান্য অভিনেতা। বিমলা: নটুমিথারীর স্ত্রী সবিতা চক্রবর্তী, শ্যামা: ওই কন্যা, নন্দিতা বর্ধন, কণিকা সরকার, মাতু: ওই গ্রাম্য দিদি: বেলা সরকার, কল্যাণী : সুশোভনের ভগ্নী: মনীষা সেন, মমতা: ওই কন্যা: শম্পা রায়, মুকুলিকা রায়, জমিদার গৃহিনী: শিবনারায়ণের স্ত্রী: পারুল গাঙ্গুলি।

তবে যতদূর জানা যায়, এই সহ-অভিনয়ে সম্ভ্রান্ত মহিলারা অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র রায়গঞ্জ ছাড়াও উত্তরবঙ্গের অনেক স্থানে মহিলা শিল্পীদের নাট্যমঞ্চে প্রবেশের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন। এরপর স্বাভাবিকভাবে ইনস্টিটিউট মঞ্চে মহিলা শিল্পীরা নিয়মিতভাবে অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছেন যা ছিল সেই সময়ের দুঃসাহসিকতার পরিচয়। তৎকালীন স্থানীয় রক্ষণশীল সমাজের প্রবল প্রতিকূলতাজয় করে এবং সেই সঙ্গে নানারকম বিরুদ্ধ আচরণ ও বিরুদ্ধ পরিবেশ উপেক্ষা করেও এই নারী শিল্পীরা নাট্যকলার সেবায় সাহসিকতার সঙ্গে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম বেশ কিছু উচ্চাঙ্গের অভিনয় প্রতিভার অধিকারিনী নারী-শিল্পীরা হলেন— ময়না সরকার, গীতা বসু, গীতা মৌলিক, গীতা গুপ্ত, মীনা ব্যানার্জী, তৃপ্তি রায়, মিনতি গুপ্ত, গীতা ব্যানার্জী

কুমু চক্রবর্তী, ফুলু চক্রবর্তী, শেফালী সরকার, ভারতী গুপ্ত, সমাপিকা রায় প্রমুখ।[৬২]

সতীশচন্দ্র রায়গঞ্জের ইনস্টিটিউট নাট্যমঞ্চকে আধুনিক ও পরিশিলিত করে তোলার জন্য কেবল নারী অভিনেত্রীদের নিয়ে নাট্যাভিনয় করার পাশাপাশি বিদ্যুতের আলো ব্যবহারের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিখ্যাত নাট্যকার, পরিচালক ও অভিনেতা মহেন্দ্র গুপ্তের ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের ২৩ শে মার্চ সতীশবাবুর উদ্দেশ্যে লেখা একটি চিঠির মাধ্যমে—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

''শ্রীমতি গীতার মারফৎ (গীতা বোস, রায়গঞ্জ মঞ্চের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী-লেখক) আপনার চিঠি পেলাম, 'কালিন্দী'র মৎকৃত নাট্যরূপের একখানি সম্পূর্ণ প্রতিলিপি গীতাকে দিয়েছি। ওখানি অনেক কষ্টে জোগাড় করতে পেরেছি।

''(১) আমার [রামেশ্বর (বর)] দৃশ্যগুলি যথাযথ বলে আপনার, আপনাদের সুবিধা অনুযায়ী অন্য দৃশ্যগুলি অদল-বদল করে নিতে পারেন— তাতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই।

''(২) লাইট সম্বন্ধে: প্রতি রাতে ২০ টাকা হিসাবে আমি লোক দিতে পারি। ওই 'রেট'— এ একটি পার্টি যেতে পারে। অন্য পার্টি হলে রাত পিছু ৩০ টাকা পড়বে। সর্বপ্রথমে আপনাদের অভিনয়ের তারিখ চূড়ান্ত জানা দরকার যাতে প্রমোক্ত পার্টিকে আগে থেকে বুক করে রাখতে পারি। তবে যে কোনো পার্টিই যাক ৩ জনের থাকা-খাওয়া ও যাতায়াতের খরচ আপনাদের দিতে হবে। আপনারা শুধু ইলেকট্রিক কানেকশন দিবেন, আর সব চারাই নিয়ে যাবে।

''(৩) নারী অভিনেত্রীর অসুবিধার কথা আপনার পত্রে এবং গীতার মুখেও শুনলুম। আমার নিজস্ব দলে একশ বা দেড়শ রাত্রিতে কঙ্কাবতীর ঘাটে নিলো এবং কালিন্দীতে উমার ভূমিকা খুব অভিনয় করেছে— প্রয়োজন হয় আমি এমন একটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি। মেয়েটির নাম মাধুরী মুখার্জী (পরবর্তীকালে সিনেমা জগতের সুবিখ্যাত মাধবী মুখার্জী— লেখক)। তপন সিংহ পরিচালিত 'টনসিল' ছায়াচিত্রে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছিল। কালকাতায় প্রতি রাত্রি অভিনয়ে ৭৫ টাকা, ৮০ টাকা নেয়। আমার কাছে প্রতি রাত অভিনয়ে ৫০ টাকা নেয়। যদি প্রয়োজন বোধ করেন তাকে সাথে নিতে পারি। আপনাদের বাজেটে অসুবিধা হলে আমি তাকে হাতে করে ওই টাকার কিছু কম পরিমাণ দিলেও সে হয়তো আপত্তি করবে না। তবে আমি তাকে কখনো ৫০ টাকার কম দিইনি। যাইহোক বিষয়টি ভেবে দেখবেন। প্রয়োজন হলে ওই পরিমাণের কম আমি করাতে পারবো সে বিশ্বাস আমার আছে। এবং ওই মেয়েটি অভিনয় করলে চরিত্র দুটি যে অত্যন্ত সুন্দর রূপ নেবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অসমের গভর্নর আমার সঙ্গে ওর আলেয়া দেখে অজস্র সুখ্যাতি করেছিলেন। যদি প্রয়োজন বোধ করেন অবিলম্বে জানাবেন। অমি ওকে বুক করে রাখব। ... ইতি

গুনমুগ্ধ মহেন্দ্র গুপ্ত।"[৬৩] তবে সতীশচন্দ্র মহেন্দ্র গুপ্তের এত অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁর অক্ষমতার কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন। এবং তিনি এরপরেও নারী অভিনেত্রী দিয়েই নাটক মঞ্চস্থ করা পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যান।

রায়গঞ্জ শহরের বিন্যাসের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে বহুবিধ পরিবর্তন সাধিত হয়। অর্থাৎ ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের দিকে রায়গঞ্জ শহরে বিদ্যুতের সংযোগ শুরু হওয়ার ফলে নাগরিক জীবনের রূপই পরিবর্তিত হয়ে যায়। তার পাশাপাশি রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটের নাট্যমঞ্চে বিদ্যুৎ ও তার মাধ্যমে আলোক সম্পাতের ব্যবহার শুরু হওয়ায় আধুনিকতার আগমন ঘটে। কো-অ্যাকটিং ও বিদ্যুতের আলো রায়গঞ্জের নাট্যালয়ের গুণগত পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়। এমনকি নাটকের পুরনো সেট পরিবর্তিত হয়ে নতুন মঞ্চসজ্জা শুরু হয়। মোটকথা আলোক সম্পাতে আধুনিক কৌশল প্রয়োগ আরম্ভ হয়। এর ফলে লক্ষ করা যায় যে, দানবের মুণ্ড ওড়ানো থেকে শুরু করে 'ঝিন্দের বন্দী', নাটকে মঞ্চের উপর দিয়ে নৌকা ভাসিয়ে যাওয়া এবং দেখা যায় একই দৃশ্যে এক চেহারার দুইজন লোক দেখানো সম্ভব হয়েছিল।

শুধু তাই নয়, পূর্বে দর্শকদের কাছে দৃশ্যান্তর ছিল এক ভীষণ বিরক্তিকর বিষয় এই কারণে যে, মঞ্চে যবনিকা দেওয়ার পর বেশ কিছুক্ষণ অন্য দৃশ্যে সাজিয়ে নিয়ে দেখানো হতো। মঞ্চ ঘূর্ণায়মান নয় জন্যই এই বিরক্তি অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে মঞ্চ অন্ধকার করে দ্রুত নতুন দৃশ্য সাজানোর রেওয়াজ চালু হল এবং এই রীতির ধারাকে মান্যতা দিয়ে নাটকের গতি অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হয়। তাই দেখা যায় 'কালিন্দী', 'উল্কা', 'ঝিন্দের বন্দী', 'সাহেব বিবি গোলাম' ও 'দুই মহল' প্রভৃতি বহু দৃশ্যযুক্ত সামাজিক ও ঐতিহাসিক নাটকগুলি এই রীতি অনুসারে মঞ্চস্থ হয়। এবং দর্শকদের প্রশংসা লাভ করেছিল। তবে জানা যায় এইভাবে অন্ধকারের মধ্যে সেট্ বা আসবাব সাজানো এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রবেশ প্রস্থান ছিল যথেষ্ট দুরূহ ও দুর্ঘটনাপূর্ণ। এমনকি কখনো কখনো ছোটখাট দুর্ঘটনা ঘটতেও দেখা যায়। তবে ইনস্টিটিউট মঞ্চে ঘূর্ণায়মান মঞ্চ তৈরি না হওয়া পর্যন্ত নানাবিধ বিপদের ঝুঁকি নিয়ে অভিনয় করার মধ্য দিয়ে নাটকের গতি অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই প্রথা চালু করার জন্য সর্বাপেক্ষা বেশী কার্যকরী ভূমিকা ও 'অবদান ছিল শ্রী জ্যোতিপ্রকাশ রায়ের তিনি ছিলেন সেই সময়ের রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট মঞ্চের শ্রেষ্ঠ আলোক শিল্পী ও মঞ্চশিল্পী হিসেবে উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে ইনস্টিটিউটের নাট্যমঞ্চের অন্যতম রূপসজ্জাকর শিল্পী শ্রী নীরেন রায় ও শ্রী রবি দাশগুপ্ত দীর্ঘকাল নাট্যবিভাগের সেবায় সার্থকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে থেকে ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত রায়গঞ্জ শহরের নাট্যের পীঠস্থান রায়গঞ্জ

ইনস্টিটিউট-এর উল্লেখযোগ্য মঞ্চ সফল নাট্য-প্রযোজনাগুলি অবশ্যই উল্লেখের দাবি রাখে। সেগুলি হল— কালিন্দী' (১৯৫৩), পরিচালক ছিলেন শিবপ্রসাদ কর, পরবর্তীতে বেশ কয়েকবার এই নাটক অভিনীত হয়েছে। 'আরোগ্য নিকেতন' (১৯৫৬), পরিচালক সতীশচন্দ্র গুপ্ত। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো' (১৯৫৭-৫৮), পরিচালক সতীশচন্দ্র গুপ্ত। দর্শকদের মধ্যে সমাদৃত হওয়ায় নাটকটি ৫-৬ বার অভিনীত হয়। 'মহেশ' নাট্যরূপ বিধানচন্দ্র সিংহ। পরিচালনায় সতীশচন্দ্র গুপ্ত। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১৯ অক্টোবর শনিবার শারদীয়া উপলক্ষে নাটকটি প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে যথেষ্ট সাফল্যের সাথে ৫-৬ বার এই নাটকটি অভিনীত হয়। 'ব্যাপিকা বিদায়' (১৯৫৯), পরিচালনায় সতীশচন্দ্র গুপ্ত। 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' (১৯৫৯), পরিচালনায় সতীশচন্দ্র গুপ্ত। 'ঝিন্দের বন্দী' (১৯৬০), নাট্যরূপ দেন তৎকালের নবীন নাট্যকার নবকুমার গড়াই নারায়ণ সান্যালের 'ঝিন্দের বন্দী' উপন্যাসের কাহিনি অবলম্বনে। 'আলেয়া' (১৯৬০), পরিচালনা করেন নবকুমার গড়াই। 'কালিন্দী' (১৯৬২), পরিচালনায় সতীশচন্দ্র গুপ্ত। 'এক পেয়ালা কফি' (১৯৬৩), পরিচালক সতীশচন্দ্র গুপ্ত। 'ময়নার বিয়ে (১৯৬৩) সতীশচন্দ্রের পরিচালনায় ইনস্টিটিউট মঞ্চে একাঙ্ক নাটকটি অভিনীত হয়। 'মহাভারতী' (১৯৬৩), পরিচালনাক-ড. মতি সাহা, 'কিপ্টে বাড়ির নেমন্তন্ন' (১৯৬৩), একাঙ্গনাটক পরিচালনায় অজিত বসু। রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট নাট্যমঞ্চে সামাজিক ঐতিহাসিক পুর্ণাঙ্গ ও একাঙ্ক নাট্য-প্রয়োজনাগুলি রায়গঞ্জের যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে রায়গঞ্জের দর্শকমহলে সুউচ্চ প্রশংসা ও প্রাণভরা অভিনন্দন লাভ করে রায়গঞ্জের নাট্যচর্চাকে প্রাণবন্ত ও জীবন্ত করে তুলেছিলেন। এই নাট্য-প্রযোজনাগুলিতে অন্যতম ও উল্লেখযোগ্য মঞ্চসফল চরিত্রাভিনেতা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন প্রফুল্ল ভট্টাচার্য, সতীশ গুপ্ত, সনৎ ব্যানার্জী, বিমল দাসগুপ্ত, পরিতোষ রায়, অজিত রায়, অধীর মুখার্জী, কল্যাণ কুমার গোস্বামী (মানু) অমিতাভ সেনগুপ্ত, নবকুমার গড়াই, কালী নন্দী, যুধিষ্ঠির দাস, মনু দাসগুপ্ত, ড. যতীন দে, পরিতোষ সরকার, মতি সাহা, ডা. বৃন্দাবন বাগচি, ডা. অজিত দাসগুপ্ত, উৎপল নিয়োগী, যোগেন মুখার্জী, গোপাল পোদ্দার, জ্যোৎস্না কুমার সেন, কার্তিক সেন, সুধাংশু দে, সীতাংশুজ্যোতি দাস, শুভাশীষ গুপ্ত, মনোজ সরকার প্রমুখ। এছাড়াও মঞ্চসফল অভিনেত্রীদের মধ্যে বর্তমান ছিলেন জ্যোৎস্না সেনগুপ্ত, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা কুণ্ডু, পূর্ণিমা চক্রবর্তী, ইন্দ্রানী (ময়না) গুহ, ভারতী গুপ্ত, সমাপিকা রায়, গীতা বসু প্রমুখ।

রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটের নাট্যবিভাগ উদ্যোগ নিয়ে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে একটি রেকর্ড সৃষ্টিকারী অনুষ্ঠান করেন। অর্থাৎ জানা যায় প্রতি সপ্তাহে একটি করে নতুন একাঙ্ক নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যবস্থা করে রায়গঞ্জের নাট্যচর্চায় এক অভূতপূর্ব ও অসাধারণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। মোটকথা, দীর্ঘ

দিন ধরে এইভাবে প্রতি সপ্তাহে নতুন নাটক মঞ্চায়ন করার তৎপরতা, উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল সেই সময় কালের এক বিরল দৃষ্টান্ত। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই নাট্যসংস্থার অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি: ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট মঞ্চে সতীশচন্দ্র গুপ্তের পরিচালনায় তিনটি নাটক অভিনীত হয়। 'কেরানীর জীবন' 'নাচের মহল', 'রজনীগন্ধা' প্রভৃতি। ১৯৬৫-১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে ইনস্টিটিউটের প্রযোজনায় এবং জ্যোৎস্না সেনগুপ্তের পরিচালনায় বাদল সরকার রচিত অ্যাবসাড' নাটক 'বাকী ইতিহাস' মঞ্চস্থ হয়। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে সতীশচন্দ্র গুপ্তের পরিচালনায় 'আসামী হাজির' অভিনীত হয়। ১৯৬৬-১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ ব্যাপী সতীশ গুপ্তের পরিচালনায় এই নাট্য সংস্থার প্রযোজনায় 'প্রাইভেট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ' নাটকটি বহুবার অভিনীত হয়। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে ইনস্টিটিউটের প্রযোজনায় 'সাহেব বিবি গোলাম' নাটক মঞ্চস্থ হয়। রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটের প্রযোজনায় ও জয়াসন্ধের উপন্যাস 'লৌহকপাট' অবলম্বনে জ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাট্যরূপ ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে অভিনীত হয়। সতীশগুপ্তের পরিচালনায় ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয় 'আজকের নায়ক'। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে ইনস্টিটিউট মঞ্চে সতীশ গুপ্তের পরিচালনায় 'নিকটে ফাঁদ', 'তাহার নামটি অঞ্জনা' (একাঙ্ক নাটক) ছাড়াও সপ্তাহ ধরে অভিনীত হয় 'আজকের নাটক', 'দিনান্ত', 'দৃষ্টি' ইত্যাদি। প্রসঙ্গক্রমে একথা বলা যায় যে, রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট-এ এবং কাটিহারে নাট্যকার জোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্ণাঙ্গ নাটক 'দৃষ্টি' ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে বেশ কয়েকবার অভিনীত হয়। তবে কাটিহারের অনুষ্ঠানে এই নাটকটি সতীশচন্দ্রের গুপ্ত ও জ্যোৎস্না সেনগুপ্ত যৌথভাবে পরিচালনা করেন।

পূর্বে লক্ষ করা যায় সাধারণত পেশাদার মঞ্চে অভিনীত নাটকগুলির অভিনয়ের জন্যে এখানে নির্বাচন করা হত কিন্তু বর্তমানে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে অপেশাদার এবং পরীক্ষা মূলক নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার অভিমুখে। তবে সর্বোপরি একথা বলা যায় যে নানাবিধ কারণে এখানে নাটক বাছাই পর্ব কখনো কখনো খুব শক্ত হয়ে উঠত। এরপর ইনস্টিটিউটের নাট্য প্রযোজনাগুলি হল যথা— স্পার্টাকাস', 'মারীচ সংবাদ', 'জীবন রঙ্গ', 'রাজরক্ত', 'শিবের অসাধ্যি' সাজানো বাগান, রাজদর্শন, জীবনাস্থ, এই নারী এই তরবারি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তবে একথা উল্লেখের অবকাশ থাকে না যে, রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট ও এই সময়ে নাটক নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। জানা যায় যে রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট 'বাকি ইতিহাস', 'মারীচ সংবাদ', 'স্পার্টাকাস' প্রভৃতি নাট্যপ্রযোজনা করার মধ্য দিয়ে রায়গঞ্জের নাট্যচর্চায় তথা উত্তর দিনাজপুরের নাট্যচর্চায় উজ্জ্বলতম ক্ষেত্র তৈরি করে সকল নাট্যায়নের দ্যুতি দানে সক্ষম হয়েছিলেন।

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের দিকে এই ইনস্টিটিউট মঞ্চে একটি একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলেও পরবর্তীকালে নানা অসুবিধাজনিত কারণে এই নাট্য প্রতিযোগিতা স্বাভাবিক ভাবে বন্ধ হয়ে

গিয়েছিল। এরপর ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে কল্যাণ কুমার গোস্বামীর (মানু) স্মৃতি রক্ষার জন্য রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউ 'কল্যাণ স্মৃতি একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা' নামে একটি নাটক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল। এই একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতা স্থানীয় নাট্যসংস্থাগুলির উৎসাহের সঙ্গে সক্রিয় অংশ গ্রহণ ও পারস্পরিক সহযোগিতায় সাফল্য মণ্ডিত হয়ে উঠেছিল এবং রায়গঞ্জের নাট্যচর্চায় প্রবল গতির সঞ্চার করেছিল। বিজেতাদের পুরস্কার বিতরণ করেন দিনাজপুর জেলা তথা বাংলার শ্রেষ্ঠ নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়। যতদূর জানা যায় এই ইনস্টিটিউটের কয়েকটি প্রযোজিত নাটক সেই সময়ে বাংলা তথা বাংলার বাইরে নাট্য প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে পুরস্কার লাভ করেছিল। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প অবলম্বনে শাস্তি (১৯৬৭ খ্রি:) নাটকটি কাটিহারে প্রথম হয়, 'অভিনয়' বালুরঘাটে এবং 'প্রাইভেট এম্প্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ' নাটক মালদহে প্রথম স্থান অর্জন করে। তারপর ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের ৭ই জুলাই রাইনার প্রযোজিত 'এই নারী এই তরবারি' নাটকটি মঞ্চস্থ হয় কলকাতার রবীন্দ্রসদন মঞ্চে এবং সেই সঙ্গে কলকাতার টিউবার কিউলেসিস রিলিফ অ্যাসোসিয়েশনের কল্যানে টিকিট বিক্রয় ও স্যুভেনীর থেকে দশ হাজার টাকার আর্থিক সাহায্য করা হয়। নানা রকম বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করে রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট-এর নাট্যচর্চার প্রবহমান ধারা গতি বহু অভিনেতা-অভিনেত্রী ও অন্যান্য নাট্যকর্মীদের কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। যা স্বাধীনোত্তর পশ্চিম দিনাজপুর তথা উত্তর দিনাজপুর জেলার নাট্যচর্চার এক অনবদ্য ও অতুলনীয় নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত।

তবে জানা যায়, একসময় ইনস্টিটিউট মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ আর্থিক অনটনের কারণে বহুদিন ধরে সিনেমা প্রদর্শকদের কাছে ভাড়া দিয়ে লব্ধ অর্থ দিয়ে উন্নয়নের কাজগুলি করেছেন। তার ফলে নিয়মিত মঞ্চ ব্যবহার করা এবং সেখানে মহলা দেওয়া সম্ভব না হওয়ার দরুণ নাট্যচর্চা ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল। এমনকি নাট্যবিভাগকে নিরুপায় হয়ে উক্ত অসুবিধাগুলি মেনে নিয়ে চলতে হয়েছে এবং সেই সঙ্গে নিয়মিত অভিনয় করা তাদের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ হয়ে উঠেছিল বলে জানা যায়। ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ক্রমান্বয়ে লক্ষ করা যায় এই নাট্যসংস্থার দীর্ঘদিনের পরিচালক ও দক্ষ অভিনেতা সতীশচন্দ্র গুপ্তের সংঘর্ষ বিভিন্ন কারণে চরম আকার লাভ করে। যদদূর জানা যায়— কো-অ্যাকটিং, নির্বাচিত নাটকের বিষয়বস্তুতে আধুনিকতা ও সামাজিক বাস্তবতায় প্রতিফলন এছাড়াও প্রগতিপন্থী যুবকদের অভিনয়ে প্রাধান্য দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ তার উপর প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এমন কি নাটক নির্বাচন, পরিচালনা ও অভিনয়ে প্রবল দক্ষতার জন্য সতীশচন্দ্র গুপ্তকে অপসারণ করা সম্ভব নয়, তাই তাঁকে বাধা দেওয়া হয় নতুন নাটক শুরু করার মুহূর্তে নানা চেষ্টা ও অজুহাতের মাধ্যমে। আবার ধনী ও উচ্চ শিক্ষিত অভিনেতাদের

কেউ কেউ তৎকালীন নিম্নবিত্ত অভিনেতাদের প্রাধান্য মেনে নিতে পারেন নি। এবং প্রবীনরা অভিনয় জগতে উপেক্ষিত হচ্ছেন বলেও একরকম প্রচার শুরু হয়। এর ফলে সতীশচন্দ্র গুপ্ত ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝির দিকে রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট থেকে বিদায় নেন এবং তাঁর সঙ্গে অন্যান্য অভিনেতাদের মধ্যে গুগলী গোঁসাই, ডা: যতীন দে, অধীর মুখার্জী, গোপাল দত্ত, কালী নন্দী, জ্যোতি রায়, যুধিষ্ঠির দাস, শক্তি চন্দ্র, প্রশান্ত সেনগুপ্ত, নীরেন (নটু) সেন, দুলু নাগ, মন্মথ নট্ট, অংশুমান গুপ্ত, শেফালী সরকার রবি দাশগুপ্ত প্রমুখ ইনস্টিটিউট মঞ্চ ছেড়ে আসেন। এই ঘটনার পাশাপাশি দেখা যায় ইনস্টিটিউট নাট্যমঞ্চের মূলস্রোতে যে সব অভিনেতরা থেকে গেলেন তাঁরা হলেন-কল্যাণ গোঁসাই, জ্যোৎস্না সেনগুপ্ত, ডা. বৃন্দাবন বাগচী, ডা. মতি সাহা, কুমু চক্রবর্তী, ইতি চক্রবর্তী, তৃপ্তি রায় প্রমুখ। এছাড়াও কয়েকজন অভিনেতা মাঝামাঝি অবস্থানে থেকে যান। এই অদ্ভুত পরিস্থিতিতেই লক্ষ করা যায়, ইনস্টিটিউটের স্নেহলতা মঞ্চে নাটক মঞ্চস্থ করা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রবীন ও দক্ষ অভিনেতা কল্যাণ গোঁসাইসহ ও অন্যান্য অভিনেতাদের সদিচ্ছায় পুনরায় ঐক্য প্রতিষ্ঠার এক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এর ফলে স্বতন্ত্র হয়ে যাওয়া পূর্বোক্তরা প্রায় সবাই ইনস্টিটিউটে ফিরে আসেন এবং সতীশচন্দ্রের দেওয়া শর্তগুলি ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ মেনে নিয়েছিলেন। যেগুলি হল কো-অ্যাকটিং আবশ্যিক, সামাজিক নাটক ছাড়া অন্য নাটক মঞ্চস্থ হবে না, সমস্ত যুবককে ইনস্টিটিউটের সদস্য পদ ফিরিয়ে দিতে হবে এবং কোন ওজর তুলে কাউকে বাইরে রাখা চলবে না। মোটকথা পূর্বোক্তদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এক অস্থায়ী ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হলেও একটি লক্ষণীয় বিষয় হল যে, রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটের কর্তৃপক্ষের একটি অংশের (প্রগতি পন্থীর যুবক) ঐক্যের পক্ষে পুরোপুরি মত ছিল না বলে জানা যায়।

পরিশেষে একথা বলার অবকাশ থাকে না যে, 'মহারাণী স্নেহলতা হল' তথা 'রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট' ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা লাভ করে প্রথমার্ধে এই নাট্যসংস্থার নাট্যচর্চা তথা নাট্যভিনয়ের চেয়ে বরং স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর বিশেষ করে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাইরে থেকে নবাগত অভিনেতাদের যোগ্যতা ও দক্ষতায় রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটের নাট্য-প্রযোজনা গুনমানে বেশ উচ্চতায় পৌঁছে যায় বিশেষত যৌথ অভিনয়ের দ্বারা। এর ফলে মহারাণী স্নেহলতা হলে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয় এবং মঞ্চাভিনয়ে ব্যাপক অগ্রগতির জোয়ার আসায় এই সংস্থা উৎকর্ষতায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। সেই সঙ্গে রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট উত্তর দিনাজপুরের নাট্যচর্চার শুরু থেকে অসাধারণ সাফল্যের সঙ্গে নাট্যচর্চা তথা নাট্যভিনয় করে উত্তরবঙ্গ সহ বাংলাব্যাপী বিস্তার লাভ করে ভূয়সী প্রশংসা লাভ করে এবং অপরিসীম কৃতিত্বের অধিকারী হয়ে ওঠে।

এরপর রায়গঞ্জ শহরে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে এগিয়ে এসেছিল রায়গঞ্জ কলেজের ছাত্র ইউনিয়ন।

এই ছাত্র ইউনিয়নে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে নাট্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করে এবং তারা সেই সময়ের নাট্যচর্চায় গতি সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিল। এমনকি তাদের এই নাটক নিয়ে নিয়মিত চর্চার মধ্য দিয়ে রায়গঞ্জের নাট্যচর্চাতে এক নতুন নাট্য ধারার সংযুক্তীকরণ ঘটতে দেখা যায়।

রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটের আনুষ্ঠানিকভাবে ঐক্য প্রতিষ্ঠার বা মিলনের ফলে প্রগতিপন্থী নব-যুবকেরা ইনস্টিটিউটের সদস্যপদ গ্রহণ করলেও মঞ্চায়নের জন্য নির্বাচিত নাটকে তাঁদের যোগ্য স্থান দেওয়াকে কেন্দ্র করে ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে তীব্র বিরোধীতা শুরু হয়। রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটের অভ্যন্তরে আধুনিক নাট্য-প্রযোজনা, যোগ্য-অভিনেতা নির্বাচন, প্রযুক্তির পত্তন, পুরুষ ও নারীর যৌথ অভিনয়ের (কো-অ্যাক্টিং) স্থায়ী ব্যবস্থা, নিম্নবিত্ত পরিবারের নাট্যপ্রতিভাকে মঞ্চে প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দেওয়া, প্রতিষ্ঠানিক কর্তৃত্ববাদের জায়গায়-গণতান্ত্রিক প্রথার প্রচলন করা এবং নাটকের দর্শকদের মাঝে নাট্য অলীকতার পরিবর্তে জীবনধর্মী বাস্তবতাকে প্রকটিত করে তোলার জন্য পূর্বের প্রায় দুই দশক যাবৎ যে সংগ্রাম চলছিল তার অন্যতম প্রত্যক্ষ ফসল ছিল এই 'ছন্দম' নাট্যগোষ্ঠী। রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটের সমান্তরালে ঋষিপাড়া তথা রামেন্দ্রপল্লীর দুর্গামণ্ডপের মাঠে 'ছন্দম' প্রতিষ্ঠা লগ্নের পূর্ব থেকেই প্রথম অভিনয় চর্চা শুরু করেছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে রায়গঞ্জের নাট্যজগতের পরিসরে নাট্য আন্দোলন বলতে যা বোঝায় জন্ম সূত্রেই তার চিহ্ন বহন করে চলেছে 'ছন্দম'।

১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে রায়গঞ্জের নাট্যচর্চায় গ্রুফথিয়েটারের আদর্শ হিসেবে রায়গঞ্জের 'ছন্দম' নাট্যগোষ্ঠীর নাট্য-প্রয়াস ছিল যুগোপযোগী ও অভাবনীয় তাৎপর্যপূর্ণ। এর ফলে লক্ষ করা যায় যে, রায়গঞ্জের নাট্যচর্চায় সখ-সৌখিনতার পরিবর্তে সামাজিক দায়বদ্ধতা যথেষ্ট প্রাধান্য লাভ করার ফলে এখানকার নাট্য-প্রয়াস কেবলমাত্র বিনোদনের মাধ্যমকে পরিহার করে সমাজ ভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যম হিসেবে গড়ে উঠল এবং সেই উদ্দেশ্যের বাস্তবোচিত ও মূর্তিরূপ 'ছন্দম' নাট্যগোষ্ঠীর আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় ১০ই জানুয়ারী ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে রবীরন্দ্রনাথের ছোটগল্প অবলম্বনে 'কাবুলিওয়ালা' নাট্য-প্রযোজনার মধ্য দিয়ে। ছন্দম নাট্যগোষ্ঠী রায়গঞ্জের নাট্যচর্চায় যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দের সঙ্গে নাট্য-প্রয়াস চলমান রেখে অগ্রসর হয়।

নাটকের বিকাশের ক্ষেত্রে অন্যতম শর্ত হল স্থায়ী নাট্যকেন্দ্র। ছন্দমের নিজস্ব স্থায়ী ও আধুনিক নাট্যমঞ্চ তাদের তিল তিল করে কঠোর শ্রম ও নাট্য-সাধনার মধ্য দিয়ে রায়গঞ্জের রামেন্দ্র পল্লীতে গড়ে ওঠে। রায়গঞ্জের নাট্যচর্চায় পূর্বে যে নাট্যধারা প্রচলিত ছিল, তা থেকে একটু স্বতন্ত্র বৈচিত্র্যের নাটক নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল ছন্দম নাট্যগোষ্ঠী। তারা পৌরাণিক, ঐতিহাসিক নাট্য-প্রযোজনার গতানুগতিক ধারাকে বিদায় দিয়ে নতুন চিন্তা চেতনায় ঋদ্ধ হয়ে প্রযোজনা শুরু করে সামাজিক এবং রাজনৈতিক নাট্য-প্রযোজনা। তাই রায়গঞ্জের নাট্যপ্রেমীদের নাট্যরস পিপাসা পরিতৃপ্তির জন্য

১৯৬৩-২০১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ছন্দম প্রযোজিত ও পরিচালিত নাট্য-প্রযোজনার নাট্যতালিকা নিম্নে তুলে ধরা হল—

১. 'কাবুলিওয়ালা' (পূর্ণাঙ্গ) ১৯৬৩, কাহিনী-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নাট্যরূপ-স্বপন গুপ্ত।

২. গেটম্যান (পূর্ণাঙ্গ) ১৯৬৩, নাট্যকার-জতু বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩. রুপোলী চাঁদ (পূর্ণাঙ্গ) ১৯৬৪, নাট্যকার- ধনঞ্জয় বৈরাগী।

৪. ফেরারী ফৌজ (পূর্ণাঙ্গ) ১৯৬৫, নাট্যকার- উৎপল দত্ত।

৫. ভিয়েতনাম (একাঙ্ক) ১৯৬৫

৬. সমুদ্রের স্বাদ (একাঙ্ক) ১৯৬৫

৭. নবতরঙ্গ (একাঙ্ক) ১৯৬৫

৮. শাস্তি (একাঙ্ক) ১৯৬৬, কাহিনী-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নাট্যরূপ-বীরু মুখোপাধ্যায়।

৯. রক্তকরবী (পূর্ণাঙ্গ) ১৯৬৬, নাট্যকার-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০. কাঞ্চনরঙ্গ (পূর্ণাঙ্গ) ১৯৬৬, নাট্যরূপ- শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র

১১. ছেড়া তমসুক (একাঙ্ক) ১৯৬৬, কাহিনী-সমরেশ বসু

১২. লেডিস হোস্টেল (একাঙ্ক) ১৯৬৬

১৩. জন্মদিন (একাঙ্ক) ১৯৬৬

১৪. মে দিবস (একাঙ্ক) ১৯৬৬

১৫. মেঘে ঢাকা তারা (পূর্ণাঙ্গ) ১৯৬৬, কাহিনী-শক্তিপদ রাজগুরু।

১৬. বৌদির বিয়ে (একাঙ্ক) ১৯৬৭, নাট্যকার শৈলেশ গুহনিয়োগী

১৭. আবর্ত (পূর্ণাঙ্গ) ১৯৬৭

১৮. শেষ থেকে শুরু (পূর্ণাঙ্গ) ১৯৬৮, নাট্যকার-সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯. ফরিয়াদ (পূর্ণাঙ্গ) ১৯৬৮, নাট্যকার-শেখর চট্টোপাধ্যায়।

২০. ছেঁড়াতার (পূর্ণাঙ্গ) ১৯৬৮, নাট্যকার-তুলসী লাহিড়ী।

২১. নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র (পূর্ণাঙ্গ) ১৯৭০, নাট্যকার-লুইজি পিরানদেল্লো

২২. নীলদর্পণ (পূর্ণাঙ্গ) ১৯৭৩, নাট্যকার- দীনবন্ধু মিত্র

২৩. অগ্নিগর্ভ লেনা (পূর্ণাঙ্গ)১৯৭৪, নাট্যকার-শ্যামকান্ত দাস

২৪. পদ্য গদ্য প্রবন্ধ (পূর্ণাঙ্গ) ১৯৭৬, নাট্যকার- জোছন দস্তিদার।

২৫. আজকের হ্যামলেড (পূর্ণাঙ্গ) ১৯৮০, নাট্যকার-অসিত বসু।

২৬. ভোট এড়াতে কোটে চলো, ১৯৮২

২৭. জানালা (একাঙ্ক)

২৮. ফুলমোতিয়া (পূর্ণাঙ্গ, হিন্দি) ৮ ডিসেম্বর ১৯৮২, কাহিনী-প্রশান্ত চৌধুরী, নাট্যকার-সুপ্রিয় সর্বাধিকারী

২৯. নো এন্ট্রি, ১৯৮৭

৩০. যতীনবাবুর চাকর (পূর্ণাঙ্গ) ১৯৮৮, কাহিনী-শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, নাট্যরূপ-সুব্রত রায়।

৩১. জবাব, ১৯৬৩

৩২. দহন (পূর্ণাঙ্গ) ১৯৯৭, কাহিনী (কালরাত্রি)- দুলেন্দ্র ভৌমিক, নাট্যরূপ-সুব্রত রায়

৩৩. আমি মেয়ে (পথ নাটক) ২০০০

৩৪. আবার যদি (পূর্ণাঙ্গ) ২০০৭, নাট্যকার-চন্দন সেন

৩৫. গণতন্ত্রের বিচার, ২০০৯

৩৬. উত্তরাধিকার (পূর্ণাঙ্গ) ২০১২, কাহিনী-নটরাজন, নাট্যরূপ-অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩৭. বদনাম, ২০১৩[৬৪]

'ছন্দম' নাট্যসংস্থা সমগ্র উত্তরবঙ্গ সহ বাংলার বাইরে উক্ত নাটকগুলি মঞ্চস্থ করে দর্শক সমাজে সমাদৃত হয়ে সুউচ্চ প্রশংসা লাভ করেছিল। এছাড়াও এই সংস্থা গ্রাম-গ্রামান্তরে বহু পথ নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। এই ছন্দম নাট্যসংস্থার পরিচালক ও কর্ণধার ছিলেন সুধাংশু দে। এছাড়াও তিনি সমাজ সচেতন দক্ষ ও প্রতিভাধর অভিনেতা ও সংগঠক রূপে যথেষ্ট নিপুণতার পরিচয় দিয়েছিলেন। নাট্য একাডেমির সদস্য সুধাংশু দের নেতৃত্বে ছন্দম নাট ল্লখযোগ্য মঞ্চসাফল্য চরিত্রভিনেতা-অভিনেত্রীবৃন্দের সমাবেশ ঘটতে দেখা যায়, তারা হলেন— সুধাংশু দে, বারীন রায়, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, প্রশান্ত (খোকা) ভৌমিক, মনোজ সরকার, বোমকেশ ঘোষ, নীরেন (নটু) সেনগুপ্ত, শিব শঙ্কর সেনগুপ্ত, অজিত সেনগুপ্ত, অরুণ হোড়, পুষ্পজিৎ রায়, অশোক ব্যানার্জী, ধীরেন দে, প্রশান্ত সেনগুপ্ত, জগদীশ রায়, প্রশান্ত দে, বিপ্লব শীল, শুভাশীষ গুপ্ত, ভারতী সেনগুপ্ত, গীতা ব্যানার্জী, কৃষ্ণ সেনগুপ্ত, সন্ধ্যা দাস, মমতা ব্যানার্জী, বীথি দে, উমা রায়, অনুরাধা ভৌমিক প্রমুখ। এই নাট্য সংস্থায় রূপসজ্জা, মঞ্চ, আলোক সম্পাত ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজে প্রধান ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেছেন রবি দাশগুপ্ত, দীপ্তেশ মজুমদার, সুভাষ মজুমদার, অধীর রায়, প্রণব চৌধুরী, নিমুধর, অমল নাথ প্রমুখ। পরবর্তীতে আরও অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রী এই নাট্যসংস্থার মঞ্চস্থ নাটকে ধারাবাহিক ভাবে অংশ গ্রহণ করেছেন। নিয়মিত মঞ্চাভিনয়ের পাশাপাশি 'ছন্দম' এর উদ্যোগে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের শতবার্ষিকী উৎসব যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়েছিল। এই নাট্যসংস্থা রাজ্যে অনুষ্ঠিত নানা

নাট্য প্রতিযোগিতায় অভিনয় করে সাফল্যের সঙ্গে জয়ী হয়েছে। শুধুমাত্র 'লিটল থিয়েটার' গ্রুপগুলির মধ্যেই তাদের খ্যাতি সীমাবদ্ধ নয়, সমগ্র পশ্চিমবাংলার নাট্যজগতে 'ছন্দম' একটি বিশেষ ভাবে পরিচিত ও বিশিষ্ট নাট্যসংস্থা। তারা কলিকাতাসহ বাংলার অন্যত্র আমন্ত্রিত হয়ে বহু নাটক মঞ্চস্থ করেছে। ছন্দম ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে শ্রেষ্ঠ নাট্যপ্রযোজনার পুরস্কার পায়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসু পুরস্কার প্রদান করেন। এমনকি 'ফুলমোতিয়া' নাট্য-প্রযোজনায় এই নাট্যসংস্থার অভিনেত্রী নিবেদিতা সেনগুপ্ত 'দিশারী' পুরস্কারে ভূষিত হন। এই ছন্দম নাট্যসংস্থার পাশাপাশি রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট ও নাটক নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। ঠিক তেমনিভাবে রায়গঞ্জের দেহশ্রী ব্যামাগারও রায়গঞ্জের নাট্যচর্চায় ভীষণ উৎসাহের জোয়ার এনেছিল দীপালি উৎসবে একাঙ্কা নাটক প্রতিযোগিতার আয়োজন করার মাধ্যমে।

রায়গঞ্জের নাট্যচর্চায় সত্তরের দশকে আরও বেশ কয়েকটি গ্রুপ থিয়েটার আত্মপ্রকাশ করেছিল। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— বিবেকানন্দ নাট্যচক্র, শিল্পী চক্র, এল.টি.সি.। এদের অনিয়মিত নাট্য-প্রযোজনা গুলিও দর্শক সমাজে যথেষ্ট জনসমাদর ও প্রশংসা লাভ করেছিল। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বিবেকানন্দ নাট্যচক্র, প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নাট্যসংস্থার অন্যতম ও মঞ্চসফল অভিনেতারা হলেন শীতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সৌরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বিনয়কুমার দেবনাথ, স্বপনকুমার ঘোষ, মধুসূদন রায় প্রমুখ। এই নাট্যসংস্থার অভিনব ও উল্লেখযোগ্য নাট্যপ্রযোজনা গুলি হল—'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'প্রেত শান্তি', 'ঝড়ের পাখি', 'সুখী পরিবার', 'বুনো হাঁস', 'ধূসর গোধূলি', 'শেষ বিচার', 'বিলাসী', 'সূর্য নেই স্বপ্ন আছে' প্রভৃতি। সত্তরের দশকের শেষার্ধ থেকে আশির দশকের শুরুতে রায়গঞ্জ শহরে নাট্যচর্চার জোয়ার এসে দেখা দেয়। এরফলে বেশ কয়েকটি নাট্যদল গড়ে ওঠে। এই দলগুলির মধ্যে অন্যতম হল 'শিল্পী চক্র'। ষষ্ঠী সাহার দায়িত্বভরা নেতৃত্বে রায়গঞ্জের নাট্যচর্চায় শিল্পীচক্রের নাট্য-প্রযোজনাগুলি উল্লেখযোগ্যও বটে— 'ক্রীতদাস', 'অগ্নিগর্ভ হেকেমপুর', 'পরাণ মণ্ডলের ঘর গেরাস্তি', 'এখনো অন্ধকার' প্রভৃতি।

রায়গঞ্জের নাট্যচর্চায় ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে যাত্রিক নাট্যসংস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই নাট্যসংস্থার অন্যতম নাট্য-প্রযোজনা হল— 'শতাব্দীর পরে', 'অভিযান', 'মহাবিদ্যা', 'টিনের তলোয়ার', 'চাকভাঙা মধু', 'রক্তাক্ত', 'রোডেসিয়া', 'ইতিহাস কথা কয়', 'জগন্নাথ', 'শ্রীরামচন্দ্রজীর ভারতদর্শন' প্রভৃতি। তবে 'যাত্রিক' নাট্যসংস্থা সুব্রত রায়ের শ্রীরাম চন্দ্রজীর ভারত দর্শন' এই পোস্টার নাটকটি বেশ সাফল্যের সঙ্গে প্রযোজনা করেছিল। এই নাটকটি সংস্থার পরিচালক নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীর পরিচালনায় ১৫ বার প্রযোজিত হয়। এর অভিনয়ে যাঁরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেন তাঁরা হলেন— পুষ্পেন্দু মুখার্জী, নরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তী, অজয় দে, বিজন কুমার সাহা, অতুল

পাল, তাপস ভট্টাচার্য, ও সৌরভ রায় প্রমুখ। 'শিল্পীতীর্থ' রায়গঞ্জের দেবীনগরে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রুপ থিয়েটারের আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিয়ে এই নাট্যসংস্থাটি তৈরি হয়। এই সংস্থার সম্পাদক ও পরিচালক সুজিতভূষণ রায়। এই সংস্থার অন্যতম নাট্য প্রযোজনাগুলি: 'সংগ্রামী ভারত', 'মৃত্যুঞ্জয়ী সুভাষ' (স্লাইড সহ), 'বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ' (স্লাইড সহ), 'আমার গানের মালা' (নজরুল নৃত্যনাট্য), রবীন্দ্রগীতি বিচিত্রা, বর্ষামঙ্গল (রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য), 'দুর্গা বন্দনা', 'ঋতুরঙ্গ' প্রভৃতি। প্রায় সমসাময়িককালে রায়গঞ্জের নাট্যচর্চায় গ্রুপথিয়েটারের একলব্য নাট্যসংস্থা হিসেবে উল্লেখযোগ্য 'রূপকল্প' নাট্যসংস্থা ও 'রঙ্গম'। 'রূপকল্প' নাট্যসংস্থার সীমিত সংখ্যক ও অন্যতম নাট্য-প্রযোজনা হল— 'মস্তান দি গ্রেট', 'দুই মহল' প্রায়শ্চিত্ত', 'দাদা জন্মালেন', 'সিঁড়ি' প্রভৃতি। রঙ্গম যে সব নাটকের প্রযোজনা করেছেন— বিধায়ক ভট্টাচার্য্যের 'জয় পরাজয়', 'ভানু চট্টোপাধ্যায়ের 'আজকাল' রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর', 'সম্পত্তি সমর্পণ' অগ্নিদূতের 'কিন্তু নাটক নয়', একাঙ্ক— 'ছেঁড়া তমসুক' প্রভৃতি। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে ১৩ অক্টোবর রায়গঞ্জের নাট্যচর্চার ইতিহাসে লিটল থিয়েটার সেন্টার (এল.টি.সি.)-এর আবির্ভাব কালটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই গ্রুপ থিয়েটার সম্পাদক টুটুল চক্রবর্তী এবং প্রধান কর্ণধার ও পরিচালক ছিলেন দেবব্রত গুহরায়। এই নাট্যসংস্থার প্রথম থেকেই প্রয়াস ছিল নিজস্ব পাণ্ডুলিপি থেকে নাট্য-প্রযোজনা করা। এমনকি এই সংস্থার প্রথম পরিচালক দেবব্রত গুহরায় নিজে নাট্যকার হওয়ায় এই দিক থেকে তারা ভাগ্যবান ও গর্ববোধ করে। এই সংস্থার উল্লেখযোগ্য একাঙ্ক নাট্য-প্রযোজনার মধ্যে রয়েছে— 'এক্কাগাড়ির ঘোড়া', 'প্রসেনিয়াম', 'কক্ষপথ', 'যোগীন যখন যজ্ঞেশ্বর', 'সকালের রঙ', 'গদাই চন্দর' প্রভৃতি। এর পূর্ণাঙ্গ নাট্যপ্রযোজনাগুলি— 'ইসকাবনের গোলাম', 'প্রতিশ্রুতি', 'ব্যূহ' অভিমুন্যআমরা', 'মানতামাসা' প্রভৃতি। অভিনয়ে উল্লেখযোগ্য অভিনেতারা হলেন— দেবব্রত গুহরায়, রচিতদের স্বপনকুমার পালিত প্রমুখ।

এছাড়া আরো জানা যায় যে, ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে এল.টি.সি. তাদের দশম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বেশ সমারোহের সঙ্গে তিন দিন ব্যাপী নাট্য-উৎসবের আয়োজন করেছিল; তদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই উৎসবে নাট্য-প্রযোজনায় সহ নাটক নিয়ে সেমিনারও হয়। প্রায় সমসাময়িক কালপর্বে আরও দুটি নাট্যসংস্থা সংকল্প এবং 'রূপম' প্রতিষ্ঠিত হয়। সংকল্প নাট্যসংস্থা নচিকেতা, ঝালাপালা, প্রভৃতি কয়েকটি ভালো নাট্যপ্রযোজনা উপহার দিয়ে এই সংস্থাটি লুপ্ত হয়ে যায়। এই সংস্থার সদস্যসহ অভিনেতারা হলেন সমীর দাস, সজল দাস, পল্টু কুণ্ডু প্রমুখ। এই সময়ের একটি ক্ষণস্থায়ী নাট্যদল হল 'রূপম'। এই নাট্যসংস্থার দুটি উল্লেখযোগ্য নাট্যপ্রযোজনা 'নরক গুলজার' ও 'নাজি-৭৪'। পরবর্তীকালে এই নাট্যসংস্থা ছন্দমের সঙ্গে মিশে যায়। পরবর্তীকালে তৈরি হয় 'ব্যতিক্রম' (১৯৮০)। এই নাট্যসংস্থার নেতৃত্বে রয়েছেন দেবাশীষ সাহা, দুর্গেশ ঘোষ, অমল রায়বর্মন প্রমুখ। এই সংস্থার

উল্লেখযোগ প্রযোজনা 'পঙ্গপাল', 'হাঙ্গর' প্রভৃতি। এবং পরে গড়ে ওঠে 'বিজয়ী'। এই 'বিজয়ী' নাট্যসংস্থার উল্লখযোগ্য নাট্য-প্রযোনা হল 'মহাভারতের যুদ্ধ'।

গৌতম চক্রবর্তীর পরিচালনায় ও নির্দেশনায় রায়গঞ্জের গণনাট্যসংঘের 'মনন' শাখাও বেশ কিছু সমাজ সচেতন মূলক নাটক রায়গঞ্জের নাট্যপ্রেমী দর্শকদের উপহার দিয়েছে। তারপর সত্তরের দশকে লক্ষ করা যায় ছন্দমের মঞ্চ সকল নাট্য-প্রযোজনা 'আবর্ত', রায়গঞ্জের রঙ্গম নাট্য সংস্থার শ্রেষ্ঠতম নাট্য-প্রযোজনা 'ঝিঝি পোকার কান্না', বিবেকানন্দ নাট্যচক্রের মঞ্চ-খ্যাত নাট্য-প্রযোজনা 'বিলাসী', শিল্পীচক্রের নাট্য প্রযোজনা কৈলাস বদ্ধ উন্মাদ', এল. টি.সি'র নাট্য প্রযোজনা 'কক্ষপথ', 'রায়গঞ্জের রূপম নাট্যসংস্থার 'নাজী ৭৪', 'আলোয় ফেরা', 'নরক গুলজার' প্রভৃতি নাট্য-প্রযোজনা, রায়গঞ্জের 'মাতৃমণ্ডলী'র (১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ) নাট্য-প্রযোজনা অসবর্ণা', 'মেজদি' প্রভৃতি এই জেলার নাট্যচর্চায় যথেষ্ট শক্তি জুগিয়েছে।

এরপর ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে উত্তর দিনাজপুর জেলার অন্যতম গ্রুফথিয়েটারধর্মী নাট্যসংস্থা রূপে 'বেতাল নাট্য সংস্থা'র উদ্ভব হয়। এই নাট্যসংস্থার অন্যতম নাট্য-প্রযোজনাগুলি হল— 'শ্রীমতী ভয়ঙ্করী', 'জয় মা কালী বোর্ডিং', 'জিয়োদার্নো ব্রুনো', 'মিছিল' প্রভৃতি। অভিনয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন জয়ন্ত রায় সুবীর চক্রবর্তী, সুব্রত চক্রবর্তী, বিবস্বত বাগচী, মুক্তি দত্ত প্রমুখ। আরও জানা যায়, ৮ জানুয়ারি ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে জয়ন্ত রামের পরিচালনায় 'বেতাল নাট্য সংস্থা'র শ্রেষ্ঠতম নাট্য-প্রযোজনা হল 'আজকের সমাজ'। এই নাট্য সংস্থার 'আজকের সমাজ' নাট্য-প্রযোজনাটির মধ্য দিয়ে সমাজ সংস্কারের ইঙ্গিতবাহী একটি অতি আবশ্যিক পরিস্ফুটিত হয়েছে। এই নাটকটির প্রযোজনা ছিল সামগ্রিকভাবে সার্থক এবং নাট্য-প্রতিযোগিতার মান উজ্জ্বল করতে যথেষ্ট সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিল।

১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময় সীমায় রায়গঞ্জ ছন্দম নাট্যসংস্থার প্রযোজিত নাটক ও সেই সমস্ত বিবরণ থেকে জানা যায়। নাট্য-প্রযোজনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল— 'অগ্নিগর্ভ লেনা' ৩২ রজনী অভিনীত হয়। 'ফেব্রুয়ারি ফৌজ'-২৪ রজনী অভিনীত হয়। 'ছেঁড়া তার', 'গদ্য-পদ্য-প্রবন্ধ'-২৮ রজনী অভিনীত হয়। 'নীলদর্পণ', 'রক্তকরবী', 'শাস্তি', 'মেঘে ঢাকা তারা' এবং হিন্দি নাটক ফুলমোতিয়া যথাক্রমে মোট ১৭ রজনী অভিনীত হয়। এই নাট্য-প্রযোজনাগুলির প্রতিটিই শহর ও গ্রামাঞ্চলে সমাদর লাভ করেছে। ছন্দমের সামগ্রিক পরিচালনায় এবং বিশেষত সুধাংশুদের নির্দেশনায় এই নাটকগুলি মঞ্চস্থ হয়। উক্ত প্রযোজনাগুলি ছন্দমের নিজস্ব মঞ্চ ছাড়াও মঞ্চস্থ হয় যথা— শিলিগুড়ি, কল্যাণী রাজ্যযুব উৎসব, মালদহ, সারা রাজ্য কিষাণ সভা, গাজোল, কালিয়াগঞ্জ, ডালখোলা, ইসলামপুর, বালুরঘাট, গঙ্গারামপুর, পতিরাম,

কাটিহার প্রভৃতি স্থানের স্থায়ী এবং অস্থায়ী মঞ্চ গুলিতে। তবে এই নাট্য-প্রযোজনাগুলি একাধিকবার অভিনীত হয়েছিল লক্ষাধিক দর্শকবৃন্দের সু উচ্চ প্রশংসা ও গভীর সমাদর ও আন্তরিক প্রীতি ও ভালোবাসার স্বতস্ফূর্ত টানে।

১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের সমসাময়িক কালপর্বে তরুণ নাট্যসমাজ' নামে একটি নাট্যসংস্থার উদ্ভব হয়। এই নাট্যসংস্থার মঞ্চস্থ নাটকগুলি হল 'তাহার নাম রঞ্জনা', 'পরবাস', 'নৈশভোজ', 'কেয়াকুঞ্জ', 'আদাব', অক্টোপাস লিমিটেড' প্রভৃতি। এই নাট্য-প্রযোজনাগুলি চরিত্রাভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন- সন্দীপ লাহিড়ী, প্রদীপ সাহা, খোকন মণ্ডল, অসীম দাস প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। বেতাল নাট্যসংস্থা ভেঙ্গে ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় 'গন্ধর্ব' এই নাট্য সংস্থার নেতৃত্বে ছিলেন বিরস্বত বাগচী। সংস্থার উল্লেখযোগ্য অভিনেতারা হলেন— মানস সরকার, অমিত সরকার, বিশ্বজিৎ গুহ প্রমুখ। এই নাট্যসংস্থার উল্লেখযোগ্য নাট্যপ্রযোজনা হল— 'চোখে আঙুল দাদা', 'অঘটন', 'সাধুসঙ্গ প্রভৃতি।

১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে রায়গঞ্জের অন্যতম একটি নাট্য সংস্থা 'স্ফুলিঙ্গ' দেবী-ইন্দিরা' মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে পথ চলা শুরু করে। পরবর্তীতে এই সংস্থায় সোনার সাহারা 'নহবত' ইত্যাদি নাটক মঞ্চস্থ হয়। 'মালঞ্চ' সাংস্কৃতিক বিকাশ' নাট্যসংস্থার যাত্রা শুরু হয় ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে। এদের অভিনীত নাটকগুলি— 'হিপোক্রিট', 'কুষ্ঠ', 'চোখ' প্রভৃতি। এরপর এই সময়ের উল্লেখযোগ্য অপর একটি নাট্যসংস্থা ভারতীয় গণনাট্য সংঘের 'মনন' শাখার জন্ম হয়। এদের নাট্য-প্রযোজনাগুলি হল 'রাজা কি রাজা', 'ত্রিংশ শতাব্দী' ইত্যাদি এবং সংস্থার অভিনেতা-অভিনেত্রীরা হলেন— অনিরুদ্ধ ভৌমিক, দেবব্রত মুখার্জী, গৌতম মুখার্জী, চুমকি মিত্র অমিত দাস, রজতাভ দাস প্রমুখ। তবে এই শাখাটি পরবর্তীকালে গণনাট্য সংঘ থেকে বেরিয়ে 'সময়' সংস্থা নামে গড়ে ওঠে। এই নাট্য সংস্থারা মঞ্চস্থ হয় মৈনুদ্দিনের ভূত, 'কাল বা পরশু', জয়বাবা ভূতনাথ' প্রভৃতি। এই নাট্যসংস্থার উল্লেখযোগ্য অভিনেতাবৃন্দ হলেন .... সরকার, আদিত্য নারায়ণ দাস প্রমুখ।

উত্তরবঙ্গের একটি বিশিষ্ট দৈনিকের আলোচনায় উত্তর দিনাজপুর, 'ছন্দম' নাট্যসংস্থার একটি নাট্য-প্রযোজনা প্রাসঙ্গিকভাবে প্রানিধানযোগ্য। ১৩ই জানুয়ারি, ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃতি, উত্তরবঙ্গ সংবাদ ''গত ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় রায়গঞ্জের নবনির্মিত ছন্দম মঞ্চে ছন্দমের প্রযোজনায় অভিনীত হয় সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়-উত্তরণের প্রেক্ষাপটে দুলেন্দ্র ভৌমিকের কাহিনী অবলম্বনে সুব্রত রায়ের নাট্যরূপ 'দহন'। এই নাটকের শুরুতে দেখা যায় নাটকের কাহিনী-অনুসৃত চরিত্র প্রধান শিক্ষকের স্ত্রী শীলার সঙ্গে মেয়ে মৌ-এর দ্বিমুখী দ্বন্দ্ব। মৌ-এর চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে সততা। নিষ্ঠা যুক্তিশীলতা, মানবিক বোধ সম্পন্ন মানসিকতা যা তার পিতার কাছ থেকে অর্জিত। বিপরীতে মা শীলার চরিত্রে ফুটে উঠেছে প্রতিষ্ঠান মুখিনতার জন্য মূল্যবোধহীন

মানসিকতার প্রতিফলন। দুটি চরিত্রেই শীলা ও মৌ-এর চরিত্রে যথাক্রমে ভারতী সেনগুপ্ত ও শ্রাবণী দে দর্শকদের প্রশংসা পেয়েছেন। প্রতিবেশি জেঠু অনাদি বাবুর চরিত্রে মৃনালকান্তি বিশ্বাসের উৎকণ্ঠা এবং ফোনে তার উৎকণ্ঠিত বাক্যালাপ দর্শকদের নাটকের গভীরে নিয়ে যায়। প্রধান শিক্ষকের পুত্র রঙ্গন চরিত্রে আশিস মুখার্জির অভিনয়ের মান পরিশীলিত। দারোয়ান শিবুর চরিত্রে সুভাষ মজুমদারের অভিনয়ে নিরক্ষর শ্রমজীবী মানুষের সাধারণ সততাবোধ আরও বেশি করে দীপ্যমান হয়ে ওঠা উচিত ছিল। অনুপ অর্থাৎ পুলিশের এস.আই-এর ভূমিকায় স্বপন বসু ততোটা চরিত্রানুগ হয়ে উঠতে পারেনি। স্কুল সম্পাদক প্রিয়তোষের ভূমিকায় আশোক ব্যানার্জী সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে মানানসই, বিশেষত: সংগঠিত রাজনৈতিক মেরুকরণ যখন চারপাশে খুব সক্রিয়, সে অর্থে চরিত্রায়ন মৌলিকভাবে বাস্তবোপযোগী। অমিতের ভূমিকায় গৌতম মুখার্জীর অভিনয়ে আরও গতি ও ধার থাকা উচিত ছিল। গোয়ালা চরিত্রে তপন দাশগুপ্তের অভিনয় দীপ্তোজ্জ্বল ও সাবলীল। নাট্যকার সুব্রত রায় এবং পরিচালক অভিনেতা সুধাংশু দে মধ্যবিত্ত- দ্বিচারিতায় দ্বন্দ্বটি ফুটিয়ে তুলতে বেশ সক্ষম হয়েছেন। আলোক সজ্জায় কনক সেন ও সুবল দাস যত্নশীল। মঞ্চ সজ্জায় স্বপন বসু ও হিমাদ্রী মল্লিকের সৃষ্টিশীলতা নতুন মাত্রা দিয়েছে।"

বর্তমান পরিসরে উত্তরদিনাজপুর জেলার ছন্দমের যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ আর একটি নাট্য-প্রযোজনা অবশ্যই উল্লেখের দাবি রাখে। সম্প্রতি রায়গঞ্জের ছন্দম নাট্য-মঞ্চের পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে চতুর্থ রজনী বেশ সাফল্যের সঙ্গে নাট্যকার চন্দন সেনের 'আবার যদি' নাটকটি অভিনীত হয়েছে। বিশ্বায়নের দাপটে বাংলা সংস্কৃতি চর্চায় প্রায় সকল মাধ্যমগুলোতে চটুল ও ভোগবাদী লালসার বিনোদন পৌঁছে দিতে ঘরে ঘরে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রবল চাপে সুস্থ প্রগতিশীল নান্দনিক সংস্কৃতিচর্চা অনেকটা স্তিমিত ও কিছুটা দিশেহারা হয়ে পড়েছে। এমনকি সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অকল্পনীয় ও ক্রমবর্ধমান বিকাশের দ্বারা সংস্কৃতিচর্চা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে তখন বাংলার নাট্যপ্রেমী মানুষ ও নতুন প্রজন্ম কলকাতা সহ মফঃস্বলের নাট্য সংস্থাগুলির কাছে ভালো নাটক দেখবার সুযোগ থেকে দীর্ঘদিন বঞ্চিত ছিল। মোটকথা এইরকম উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নাট্যদলগুলি নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার লড়াইয়ে পিছিয়ে পড়ছিল। কিন্তু আশার কথা হল সম্প্রতি নাটকের ক্ষেত্রে উক্ত হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টায় নাট্যদলগুলি সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এর ফলে লক্ষ করা যায় উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জের ছন্দম নাট্যসংস্থাও তার হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হওয়ার সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের কাছে অভিনন্দিত হয়েছে।

'আবার যদি', নাটকটি শুধুমাত্র মানবতাবোধ সম্পন্ন বিনোদনের নাটক নয়। বরং 'মানবিক' শব্দটি যে এই নাটকে শুধুমাত্র শ্রেণিচেতনাবিহীন কোনো অরাজনৈতিক অর্থ বহন করে না তা

নাটকের প্রথম দৃশ্যের উপস্থাপনা থেকে শেষ দৃশ্য পর্যন্ত সংলাপে ও প্রয়োগে সে বার্তাই পরিস্ফুটত হয়েছে। এই নাটকে এক স্বাধীনতা সংগ্রামী ব্রিটিশ সৈনিকের বুলেটের আঘাতে জর্জরিত হয়ে ব্রিটিশ কারাগারে দীর্ঘ কারাবাসের পর স্বাধীনতা উত্তর ভারতে শিক্ষকতার পেশা অবলম্বন করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগ্রামে তৎপর হয়ে আজীবন আপোষহীন এক সৎ নিষ্ঠাবান, আদর্শবাদী মানুষের পারিবারিক সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনবৃত্তের কাহিনী ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ এই নাটকে সামাজিক ও রাজনৈতিক নীতি-নৈতিকতার অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে জোরালোকণ্ঠে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। মোটকথা, ছন্দমের প্রযোজিত নাটক 'আবার যদি' ক্রমান্বয়ে ক্ষয়মান নৈতিকতা ও দুনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান জানায়। এমনকি দর্শক সমাজখুব সহজেই সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াগুলিকে শনাক্ত করে নেওয়ার ফলে নাটকটি রসোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে। এই নাটকের অভিনয়ে বিশেষ করে শিশুশিল্পী সৌরভ ব্যানার্জী ও তপেন্দু চরিত্রে গৌতম মুখার্জির অভিনয় করার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এছাড়াও অন্যান্য চরিত্রাভিনয়ে যারা সার্থক ও মঞ্চ সফল অভিনয় করেছেন তারা হলেন-হরিনারায়ণ রায়, অসিম মুখার্জী, আদিত্য দাস, শান্তনু চ্যাটার্জী, অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রাবণী মুখার্জী। তবে অঞ্চল প্রধানের চরিত্রের মেকআপ ও অভিনয়ে দর্শকের প্রত্যাশা লাভে ব্যর্থ হয়েছে। অবিনাশ মিত্র ও সুপ্রভার চরিত্রে সুধাংশু দে ও নিবেদিতা সেনগুপ্তর অভিনয় চরিত্রানুগ হয়েছে। স্বপন বোসের মঞ্চসজ্জা যথার্থ হয়েছে। আলোক সম্পাতে কনক সেন ও সুবল দাস এবং আবহসঙ্গীতে তনু দাশগুপ্তের আলো ছায়া নিয়ন্ত্রণে ও শব্দ প্রক্ষেপনে কিছুটা ত্রুটিযুক্ত হওয়ায় আরও সযত্ন অনুশীলন প্রয়োজন। এই নাট্যসংস্থার সুদক্ষ অভিনেতা সুদাংশু দে ও অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুগ্ম নির্দেশনার মধ্য দিয়ে এই নাটকটি সাফল্য লাভ করে।

পরিশেষে একথা বলা যায়, আমরা দেখেছি পেশাদার থিয়েটারে নাটক নির্বাচনের ক্ষেত্রে দায়িত্বকে প্রাধান্য না দিয়ে বরং বাজার জমানোটাই হল তাদের আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু গ্রুপ থিয়েটারের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় নাটক নির্বাচন এবং তার পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক উদ্দেশ্য ও দায়িত্ববোধ সচেতন দর্শক মহলের কাছে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। সেই দিক মাথায় রেখে এই জেলার মফস্বল-কেন্দ্রিক নাট্যচর্চায় গ্রুপ থিয়েটার গুলির মধ্যে ছন্দম কিছুটা হলেও অবশ্যই সচেতনতার পরিচয় দিয়েছে। নাট্য-প্রযোজনার মান এবং তার মূল্যায়নের বিচারে দেখা যায় জেলার অধিকাংশ নাট্যসংস্থাই প্রায় সব নাটকই রাজধানী কলকাতার নাটকের পুনঃপ্রযোজনা এবং নাটকগুলির প্রযোজনায় স্বতন্ত্র ভাবনার পরিচয় না দিতে পারলেও নিজস্ব নাটক প্রযোজনার ক্ষেত্রে এ জেলার নাট্যদলগুলোর স্বতন্ত্র চিন্তাভাবনা এবং সামর্থগত দিক দিয়ে কিছুটা হলেও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। সেই দিক থেকে 'ছন্দম' নাট্যসংস্থার 'আবর্ত', 'ছেঁড়া তার' নাট্যপ্রযোজনা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। ছন্দমের

এই নাট্য-প্রযোজনাগুলির উপস্থাপনারীতি, মঞ্চ ভাবনাসহ আঙ্গিকগত প্রয়োগে স্বাতন্ত্রতা লক্ষ করা যায়। এ জেলায় ছোট বড় অসংখ্য নাটকের দল আছে এবং এরা কিছু প্রতিষ্ঠানিক আচার অনুষ্ঠানের বাঁধা। এতদ্‌সত্ত্বেও গোষ্ঠীচিন্তার বাইরে ছন্দম নাট্যদলটি মাঝে মাঝে বেশ কিছু প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছিল— যা উত্তর দিনাজপুর জেলার নাট্যচর্চার উত্তরণে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিল। মোটকথা রায়গঞ্জ সদর মহকুমার নাট্যচর্চায় ছন্দম নাট্যদলটি বর্তমানকালেও অভাবনীয় সাফল্যের সঙ্গে নাট্য-প্রয়াসের মধ্যে দিয়ে সমগ্র বাংলা সহ বর্হিবাংলায় পরিব্যাপ্ত হয়ে সুদূর প্রসারী লাভ করেছে।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার সুবাদে বেঙ্গল পার্টিশনের ফলে দিনাজপুর জেলা বিভক্ত হয়। এই সময়ে সাবেক দিনাজপুর জেলার মোট ১০টি থানা নিয়ে বালুরঘাট ও রায়গঞ্জ মহকুমা পশ্চিমবঙ্গের অধীনে পশ্চিম দিনাজপুর নামে ভারতভুক্তকরণ হয়। ভারত সরকারের Notification no. 2139 GA, Dated 14.7.48 আদেশ অনুযায়ী রায়গঞ্জ মহকুমা সদর হিসাবে গঠিত হলে কালিয়াগঞ্জ থানা রায়গঞ্জ মহকুমার অধীনভুক্ত হয়। কিন্তু দিনাজপুর জেলার ভাঙ্গা-গড়া তথা বিবর্তনের ধারা বেয়ে পুনরায় ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে ১লা এপ্রিল পশ্চিমদিনাজপুর জেলা দ্বিখণ্ডিত হয়ে উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর নামে স্বতন্ত্র জেলারূপে আত্মপ্রকাশ করলে দেখা যায় যে, উত্তর দিনাজপুর জেলার অধীনে দুটি মহকুমার উদ্ভব হয়— রায়গঞ্জ মহকুমা ও ইসলামপুর মহকুমা। তখন বিশেষ করে ৪টি থানা রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, হেমতাবাদ ও ইটাহার থানার সমন্বয়ে নতুন করে রায়গঞ্জ মহকুমা গঠিত হয়। তাই প্রসঙ্গক্রমেই বলা যায় যে, কালিয়াগঞ্জ থানা ছিল বরাবরই রায়গঞ্জ মহকুমার অধীনে এক অন্যতম ও উল্লেখযোগ্য থানা। উত্তরদিনাজপুর জেলার নাট্যচর্চার জগতে কালিয়াগঞ্জ থানার গুরুত্ব অপরিসীম। রায়গঞ্জের মতো থিয়েটার চর্চার পূর্বে কালিয়াগঞ্জও ছিল যাত্রা ও পালাগানের শহর। এসব পালাগান ও যাত্রা এখানকার জনজীবনে প্রবলভাবে সাড়া জাগায়, যা ক্রমে থিয়েটার চর্চার অভিমুখে ধাবিত হয়। জেলা সদর দিনাজপুরের প্রেরণায় ও প্রত্যক্ষ প্রভাবে এই থানার নাট্যচর্চার পুরনো ঐতিহ্য বিকশিত হয়ে ওঠে। যা ক্রমান্বয়ে স্বাধীনোত্তর যুগে আরোতর সমৃদ্ধি লাভ করে। উত্তর দিনাজপুরের নাট্যমোদি ছোট মফস্বল শহর কালিয়াগঞ্জের নাট্যসংস্থাগুলি ক্রমান্বয়ে রায়গঞ্জ মহকুমার পাশাপাশি বালুঘাট মহকুমার নাট্যচর্চার ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে আবার কখনও প্রভাবান্বিত হয়ে তাদের নাট্যচর্চার গতির সঞ্চার করেছিল। স্বাধীনোত্তর পর্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল একাধিক নাট্যগোষ্ঠীর সৃষ্টি এবং এর ফলে নাট্যচর্চা তথা নাট্যাভিনয়ের পরিধি ও সুযোগ বৃদ্ধি পায়। তখন পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক শ্রেণির নাটকের অবসান হতে শুরু করে এবং সেই জায়গায় সামাজিক নাটকের আড়ালে আবডালে কখনও কখনও সাংকেতিক, রূপক, অ্যাবসার্ড প্রভৃতি

নাট্য-প্রযোজনার প্রচলন ও চর্চার মধ্য দিয়ে কালিয়াগঞ্জর নাট্যচর্চায় ব্যাপক সাড়া জাগিয়ে তোলে। এছাড়াও এই সময়ে একাঙ্ক নাটক সহ বিদেশী (অনূদিত) নাটকের অভিনয়-প্রয়াস দর্শক সমাজে প্রশংসা লাভ করেছিল। কালিয়াগঞ্জের নাট্যচর্চায় লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে, ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথম মহিলা শিল্পীরা মঞ্চে স্ত্রী-ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করতে আরম্ভ করেন। 'উল্কা' নাটকের অভিনয় দিয়ে তাদের যাত্রা শুরু হয়। এমনকি কালিয়াগঞ্জের নাট্য জগতে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। এই নাটকে শ্রীমতী তৃপ্তি রায় অসাধারণ অভিনয় নৈপুণ্যের দ্বারা সেই সময়ের দর্শকদের মুগ্ধ করে তোলেন। এই সময়ে স্ত্রী-ভূমিকায় তৃপ্তি রায় ছাড়াও মীনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ফুল্লরা রায়, ইলা ঘোষ, বেলা ঘোষ ও ইরানী গুহরায় প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে অংশ গ্রহণ করেছেন মঞ্জু ঘোষ ও মিনতি গুহরায় প্রমুখ। এই সময়ে কালিয়াগঞ্জের নাট্যমঞ্চে চক্রবর্তী ভ্রাতারাই 'ড্রামাটিক ক্লাবে'র ছায়াতলে থেকে অভিনয় কলাকে আধুনিক আঙ্গিকে রূপদান করেছেন। তাই এ সময়পর্বে যাঁরা অভিনয়ে পারদর্শিতা প্রদর্শনে সক্ষম ও মঞ্চসফলতা লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে তারাপ্রসন্ন চক্রবর্তী, কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী, অরুণ চক্রবর্তী, শৈলেন্দ্রনাথ নন্দী ও উপেন্দ্রনাথ সাহা প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কালিয়াগঞ্জ থানা উত্তর দিনাজপুর জেলার ঐতিহ্যবাহী নাট্যচর্চার ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। এই থানা শহরের উল্লেখযোগ্য নাট্যদলগুলি তাদের নাট্য-প্রযোজনার মধ্য দিয়ে উক্ত এলাকার নাট্যচর্চায় যথেষ্ট সাড়া ফেলেছিল। কালিয়াগঞ্জ থানার ঐতিহ্যভরা নাট্যচর্চার সূচনালগ্ন থেকে স্বাধীনোত্তর পর্বে পৌঁছে এতদ্ অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য নাট্যসংস্থা নজমু নাট্যনিকেতন সুদীর্ঘ কলার পথে ৩০টি নাট্য-প্রযোজনার উপঢৌকন দিয়ে এই অঞ্চলের দর্শকদের মুগ্ধ করে তুলেছে। এই নাট্যসংস্থার প্রতিটি নাটক কম করে হলেও ২ রাত্রি আবার কখনো ৫-৬ রাত্রিও অভিনীত হয়েছে। এইভাবে নাট্যচর্চার পথচলার মধ্য দিয়ে ক্রমান্বয়ে নজমু নাট্যসংস্থার প্রস্থান হয় ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে। তবে এখানে উল্লেখ্য যে, ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে কালিয়াগঞ্জবাসীর গর্বের নাট্যসংস্থা এই নজমু নাট্যনিকেতন তাদের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে শান্তনু দাসের ব্যবস্থাপনায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প অবলম্বনে এ জেলার তথা বাংলার বিশিষ্ট নট ও নাট্যকার হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের রচিত 'ক্ষীরের পুতুল' নাটকটি তাঁরই নির্দেশনায় পঞ্চাশ জন শিশু-শিল্পীর সহযোগে বেশ সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। এবং বেশ সহজ ও মনোরম অভিনয় আঙ্গিকে এই ক্ষীরের পুতুল নাটকটি রচনার সুবাদে নজমু নাট্যসংস্থার এই নাট্য-প্রযোজনা কালিয়াগঞ্জের নাট্যপ্রেমী মানুষদের কাছে খুবই প্রশংসিত হয়।

কালিয়াগঞ্জ থানার অতীতের নাট্যচর্চার যে স্বর্ণযুগ বিরাজমান ছিল পরবর্তীকালে সেই

গৌরবময় ঐতিহ্যের অনেকটাই 'অপরাজিতা' নাট্যগোষ্ঠীর মাধ্যমে ফিরে এসেছিল। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে অপরাজিতা নাট্যগোষ্ঠী আত্মপ্রকাশ করে— নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'রাত্রির শেষ' নাটকের প্রযোজনার মধ্য দিয়ে। এই অপরাজিতা নাট্যগোষ্ঠীর অসাধারণ প্রযোজনায় 'অঙ্গার', 'ফেরারী ফৌজ', 'মারীচ সংবাদ' ইত্যাদি নাটক মঞ্চ সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয় এবং দর্শক ধন্য হয়ে আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। এই নাট্যসংস্থা কলকাতার রবীন্দ্রসদন মঞ্চে ও মুক্তাঙ্গনে 'ছেঁড়াতার' ও 'মারীচ সংবাদ' নাটক দুটি যথেষ্ট সার্থকতার সঙ্গে মঞ্চস্থ করে প্রশংসিত হয়। অপরাজিতা নাট্যগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য ও মঞ্চসফল অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা হলেন— দীপক চক্রবর্তী, সুহাসকমল গুহ, শচীদুলাল চৌধুরী, মাখন সরকার, শরদিন্দু দাশগুপ্ত, কাজল গুহরায়, ইরানী গুহরায়, কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়, সুনন্দা রায়, দিপালী হোড়, উত্তরা দত্ত, মনীষা চক্রবর্তী প্রমুখ। তবে একটি নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য যাঁর কণ্ঠস্বর ও বাচনভঙ্গি সকল দর্শকের মনে গেঁথে আছে, তিনি হলেন বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত। এবং আলোক পরিকল্পনার কাজে উল্লেখযোগ্য আলোকশিল্পী ছিলেন সন্তোষ চৌধুরী। এই নাট্যসংস্থা নিজেদের লেখা বেশ কয়েকটি বিশেষ করে প্রখ্যাত লেখকের গল্পের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করে বেশ সাড়া জাগিয়ে তুলেছিল। যেমন সুকুমার বর্মনের 'সম্পত্তি সমর্পণ', স্বপন গুপ্তের 'কাবুলিওয়ালা', শরদিন্দু দাশগুপ্তের 'পঞ্চপাণ্ডব', 'মহেশ' ইত্যাদি। তবে আটের দশকের দিকে এই সংস্থা শ্লথ হয়ে পড়লেও সম্প্রতি ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে 'সিসিফাস', 'ঝুমুর', সদানন্দের 'সাতকাহন' মঞ্চস্থ করে এই অঞ্চলের নাট্যচর্চায় বেশ আলোড়ন তুলতে সমর্থ হয়েছিল। অপরাজিতা নাট্যগোষ্ঠীর নাট্য-প্রযোজনার পরিসংখ্যান নিম্নে তুলে ধরা হল—

১. রাত্রি শেষে — নীহাররঞ্জন গুপ্ত

২. আজকাল— ভানু চট্টোপাধ্যায়

৩. আজব শহর কলকাতা

৪. শেষ রক্ষা— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫. রূপোলী চাঁদ— জোছন দস্তিদার

৬. ফেরারী ফৌজ— উৎপল দত্ত (৭ রাত্রি)

৭. তাহার নামটি রঞ্জনা— বিধায়ক ভট্টাচার্য

৮. অংশীদার— গঙ্গাপদ বসু

৯. নেপথ্যে (একাঙ্ক)

১০. মহেশ — শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (নাট্যরূপ শরদিন্দু দাশগুপ্ত)

১১. শেষ থেকে শুরু— সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় (৫ রাত্রি)

১২. ছেঁড়াতার— তুলসী লাহিড়ী (১৮ রাত্রি)

১৩. নহবৎ— সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

১৪. বাকী ইতিহাস — বাদল সরকার

১৫. মারীচ সংবাদ (২০ রাত্রি)

১৬. সিসিফাস— দ্বীপায়ন ভট্টাচার্য

১৭. 'ফ্লু' — শৈলেশ গুহনিয়োগী

১৮. ঝুমুর

১৯. সদর দরজা

২০. অঙ্গার— উৎপল দত্ত

২১. কিন্তু নাটক নয়— কিরণ মৈত্র

২২. কাঞ্চন বাঈ— তৃপ্তি মিত্র ও অমিত মৈত্র[৬৫]

এই অপরাজিতা নাট্যগোষ্ঠীর নাট্যপ্রযোজনা চলাকালীন অবস্থায় রবীন্দ্রকুমার কুণ্ডু, স্বপনকুমার কুণ্ডু প্রমুখের উদ্যোগে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে 'শাশ্বতী নাট্যসংস্থা' নামে একটি সংস্থা অরুণ কুমার দে সরকারের 'ডানপিঠে ভিক্ষুর' নাট্য-প্রযোজনার মাধ্যমে গড়ে ওঠে। এই নাট্যসংস্থার বেশ কয়েকটি নাট্য-প্রযোজনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— 'এরাও মানুষ', 'রানার', 'আবর্ত', 'শেষ বিচার', 'মেঘে ঢাকা তারা' প্রভৃতি। শাশ্বতী নাট্যসংস্থার পূর্ণাঙ্গ এবং একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে পুরস্কৃত হয়। কিন্তু এই নাট্যদলটি পরবর্তীকালে যাত্রাদলে পরিণত হয়। এই সময় পর্বে আরও দু-একটি নাট্যদল যথা 'মৌসুমী', 'পদধ্বনি' ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য এই সংস্থাগুলি ভালো মঞ্চ সফল অভিনয় করলেও নাট্য-প্রযোজনায় গুণগত সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। কালিয়াগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক অধ্যাপিকাবৃন্দু 'মঞ্চ মিত্র' নামে একটি সৌখিন নাট্যগোষ্ঠী তৈরী করেন। এই থানার ছোট মফস্বল শহর কেন্দ্রিক প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী নাট্যচর্চার ভাবধারায় নতুন আঙ্গিকের নাট্যনির্বাচন করে খুব সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করে দর্শক সমাজে ভীষণ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই নাট্যদল 'সারারাত্তি'র নাট্য-প্রযোজনার পর নাট্যকার বাদল সরকারের জনপ্রিয় অ্যাবসার্ড নাটক 'এবং ইন্দ্রজিৎ' অভিনয় করে দর্শক মহলে চমক লাগিয়ে দিয়েছেন। অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ রায়ের পরিচালনায় অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন শ্যামল বিহারী বসু, শিশির ভট্টাচার্য। হিমাংশু সরকার প্রমুখ এছাড়াও মহিলা শিল্পী ছিলেন যথেষ্ট পারদর্শী। এমনকি কালিয়াগঞ্জে তাঁরাই অ্যাবসার্ড নাটকের প্রথম প্রচলন করেন। এই সংস্থা বরাবরই তাঁদের নাট্য-প্রযোজনাকে নতুন চেতনায় (বিষয় প্রয়োগে) ও আঙ্গিকের আলোকে চর্চার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছেন, সেই সঙ্গে ইদানিং 'অপরাজিতা' গোষ্ঠীও

'মঞ্চমিত্র' নাট্যসংস্থার পথ অনুসরণ করে 'বাকী ইতিহাস' নাটকের মঞ্চসফল অভিনয় করে আধুনিক মনস্ক নাট্যপ্রেমী দর্শকদের নাট্যরস পিপাসু পরিতৃপ্ত করে বিপুল সাড়া জাগিয়ে তোলে।

১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে কালিয়াগঞ্জ থানা শহরে তৈরি হয় বিচিত্রা নামের একটি অন্যতম নাট্যসংস্থা। সুভাষরঞ্জন ভৌমিক, শান্তনু দাস, অজয় বিশ্বাস, বিপ্লব চাকী ও রবীন্দ্রনাথ তালুকদারের উদ্যোগে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে 'বিচিত্রা' নামের একটি অন্যতম নাট্যসংস্থার যাত্রা শুরু হয়। সুভাষরঞ্জন ভৌমিক ও শান্তনু দাস নাট্যদলের নিয়মিত নাট্য-নির্দেশক হলেও, এই নাট্যদলের কিছু নাট্য-প্রযোজনার অতিথি নাট্য-নির্দেশক হিসেব বালুরঘাটের তথা দক্ষিণ দিনাজপুরের প্রখ্যাত নট ও নাট্যকার হরিমাধব মুখোপাধ্যায় যুক্তছিলেন। এই নাট্যসংস্থায় অন্যতম অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মধ্যে রয়েছেন— দীপক পাল, অশোক দাস, ষষ্ঠীচরণ দাস, দিলীপ রায়, সুব্রত রায়, রতন সাহা, মায়া সাহা, জলি রায়, দুলালী রায়, সুচরিতা গুহ, ইন্দ্রানী সান্যাল, প্রতিমা চক্রবর্তী প্রমুখ।

এই নাট্যসংস্থার মঞ্চ সফল ও উল্লেখযোগ্য নাট্য-প্রযোজনাগুলি হল— 'ক্যাম্প থ্রী', 'শেষ দৃশ্যে পৌঁছে', 'একটি অবাস্তব গল্প', 'সত্যি ভূতের গপ্পো', 'তেঁতুল গাছ', 'হইতে সাবধান', 'গুলশন', 'রাজনিদ্রা', 'নৈশভোজ', 'সন্ধ্যা তারা', 'ধর্ষিতা' প্রভৃতি। এই নাট্যসংস্থার অসাধারণ প্রযোজনা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের কাহিনী অবলম্বনে হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের রচিত একাঙ্ক নাটক 'বন্দুক' শুধ এই থানা শহরেই নয়, এই জেলায় এমনকি কলকাতার থিয়েটার ওয়ার্কশপের আমন্ত্রণেও এই নাট্য-প্রযোজনাটি এই সংস্থাকে পুরস্কারে সম্মানিত করে তুলেছে। তারপর স্বাভাবিকভাবে এই অঞ্চলের নাট্যপ্রেমী মানুষের কাছে হরিমাধব বাবুর রচিত নাটকের উপর প্রত্যাশা বেড়ে যায়। এবং সেই প্রত্যাশা পূরণের জন্য বিচিত্রা নাট্যসংস্থা সম্প্রতি ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের রচিত 'গণেশ গাথা' নাটকটি তাঁর (নাট্যকারের) নির্দেশনায় নজমু নাট্যনিকেতনের মঞ্চে মঞ্চস্থ করে এবং আজও এই নাট্য-প্রযোজনাটি বিভিন্ন জায়গায় বেশ সুনামের সঙ্গে অভিনীত হচ্ছে। ২০১২ খ্রিস্টাব্দে 'বিচিত্রা' হরিমাধব বাবুর রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্প অবলম্বনে 'শাস্তি' নাটকটি সার্থকভাবে মঞ্চস্থ করেন। এই সংস্থার নাট্য-নির্দেশক সুভাষরঞ্জন ভৌমিকের লেখা দুটি নাটক, যেমন— রবীন্দ্রকবিতার উপর নাট্যরূপ দিয়ে শ্রুতি নাটক 'নিষ্কৃতি' ও সাক্ষরতার বিষয় নিয়ে নাটক 'সাপের বিষ' বেশ মঞ্চ সফলতার সঙ্গে মঞ্চস্থ করে প্রশংসিত হয়। মোটকথা এই বিচিত্রা নাট্যসংস্থা মৌলিক নাট্যচর্চার মধ্য দিয়ে উত্তর দিনাজপুর জেলার নাট্যচর্চার ঐতিহ্যকে সুখ্যাতি ও মর্যাদার আসনে অলংকৃত করার প্রয়াসে এগিয়ে চলেছে।

সত্তরের দশকে অর্থাৎ ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে কালিয়াগঞ্জের নাট্যচর্চার পাদ প্রদীপের আলোয় 'যাত্রিক' নাট্যগোষ্ঠী পদার্পণ করে। এই নাট্যসংস্থা অমল চক্রবর্তী রচিত একাঙ্ক নাটক 'শতাব্দীর

পারে' নাট্য-প্রযোজনা দিয়ে পথচলা শুরু করে। এরপর যাত্রিক নাট্যসংস্থার অসাধারণ ও উল্লেখযোগ্য নাট্য-প্রযোজনাগুলি হল শতাব্দীর পদাবলী, 'ইতিহাস কথা কয়', 'মহেশ' (নাট্যরূপ) রক্তাক্ত রোডেশিয়া, 'মহাবিদ্যা', উৎপল দত্তের 'ব্যারিকেড', 'টিনের তলোয়ার', মনোজ মিত্রের 'চাকভাঙ্গা মধু', 'চিচিং ফাঁক' ও 'গরুর গাড়ীর হেডলাইট', দীপেন্দ্র সেনগুপ্তের 'রাজা সাজার পলো', 'গাব্বু খেলা' প্রভৃতি।

যাত্রিক নাট্যসংস্থার ১৯৭৯ খ্রি: প্রযোজিত মনোজমিত্রের 'চাকভাঙ্গা মধু' প্রতিটি নাট্যশিল্পীর অসাধারণ অভিনয়ের জন্য দর্শকদের কাছে বহুল প্রশংসিত হয়। এই নাট্য-প্রযোজনাটির অনেক আমন্ত্রিত অভিনয় হয়েছে এবং জেলার বাইরে অভিনীত হয়েছে। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে এই নাট্যসংস্থা দীপেন্দ্র সেনগুপ্তের রচিত 'গাব্বু খেলা' নাট্য-প্রযোজনাটি উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদের লক্ষ্ণৌ শহরে সারাভারত পূর্ণাঙ্গ নাটক প্রতিযোগিতায় সফল হয়ে সর্বোচ্চ সম্মান লাভ করে। এই প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা এবং শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মানে অলংকৃত হন যাত্রিক নাট্যসংস্থার নাট্য-নির্দেশক, পরিচালক ও সুদক্ষ অভিনেতা নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী। সংস্থার এই নাট্য-প্রযোজনাটি সমগ্র উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে মঞ্চস্থ হয়ে বেশ সাড়া জাগিয়ে তুলেছিল। এরপর এই নাট্যসংস্থার আরও একটি সফল নাট্য-প্রযোজনা 'শার্দূল'। এই একাঙ্ক নাটকটি এই অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি সাড়া জাগিয়ে তোলে। মোটকথা বাঘ সংরক্ষণ করার বিষয় নিয়ে কৃষ্ণ কুমার ঘোষের লেখা এই নাটকটি পর্যায়ক্রমে কালিয়াগঞ্জের বিভিন্ন ক্লাবের আমন্ত্রণে জেলায় অনুষ্ঠিত নাট্যোৎসবে এবং ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমীর নাট্যমেলায় বেশ সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়। তারপর ১৯৮৯-৯০ খ্রি: এদের দুটি একাঙ্ক নাটক, যথা—'মহাবিদ্যা' এবং এই সংস্থার একনিষ্ঠ সদস্য দুলাল চক্রবর্তীর সাক্ষরতার স্বপক্ষে লেখা নাটক 'অভিযান' বিভিন্ন মঞ্চে এবং পথ নাটকের আদলে কালিয়াগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে মঞ্চস্থ হয়েছে। পরবর্তীতে এই অভিযান নাটকটির বিভিন্ন নাট্যোৎসবে এবং পশ্চিমবঙ্গ নাট্যএকাডেমীর বিভাগী নাট্যোৎসবে ফালকাটায় মঞ্চস্থ হয়। এছাড়াও তথ্য সংস্কৃতি বিভাগের জেলা নাট্যোৎসব রায়গঞ্জে এই সংস্থা অরুণ মুখোপাধ্যায়ের রচিত 'জগন্নাথ' নাটকটি নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীর নির্দেশনায় মঞ্চস্থ করে বেশ সুনাম অর্জন করে।

যাত্রিক নাট্যসংস্থা বিভিন্ন সময়ে শিল্পমেলা, কৃষিমেলা নাট্যোৎসবে অংশ গ্রহণ করে নাটক মঞ্চস্থ করার পাশাপাশি তিনবার প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করেন। প্রথমবার কালিয়াগঞ্জের বিভিন্ন নাট্যদলের নাট্যকর্মীদের নিয়ে দুই দিনের একটা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। দ্বিতীয়বার বিভিন্ন নাট্যদলের সমন্বয়ে অভিনেতার প্রস্তুতি এবং মঞ্চ, আলো, মেকআপ প্রভৃতি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানে কলকাতা থিয়েটার ওয়ার্কশপের শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায় অংশ নিয়েছিলেন। তৃতীয়বার

বালুরঘাট ত্রিতীর্থের নাট্যনির্দেশক শ্রী হরিমাধব মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে যাত্রিক সংস্থার নাট্যকর্মী ও অনেক উৎসাহী নাট্যমোদীদের নিয়ে পাঁচদিনের প্রশিক্ষণ হয় এবং শেষ দিনে কলকাতার বহুরূপী নাট্যসংস্থার শ্রী দেবেশ চৌধুরীর নির্দেশনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রথের রশি' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। এই প্রশিক্ষণ জেলায় বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এরপর ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে এই সংস্থার তরুণ নাট্য-পরিচালক নন্দকুমার ঘোষের রচিত মৌলিক নাটক 'একদেশ ছিল বটে' ও উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর গল্প অবলম্বনে 'টুনটুনি ও রাজার কথা', স্থানীয় নাট্যকার শান্তনু মজুমদারের ... তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প অবলম্বনে 'ভক্তিরসের রোজনমেচা'-এই তিনটি নাটক উৎসাহী নাট্যশিল্পীদের দিয়ে যথেষ্ট সফলতার সঙ্গে মঞ্চস্থ হয় এবং দর্শন-ধন্য হয়ে ওঠে। এছাড়াও নন্দকুমার ঘোষের রচিত ও পরিচালিত নাটক 'সামিল', 'বিপন্ন নীলকণ্ঠ', 'জাগরণ', 'বংশীবাজে' ইত্যাদি নাটক মঞ্চ ছাড়াও পথ নাটক হিসাবে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে সার্থকতার সঙ্গে অভিনীত হয় এবং এই নাট্যসংস্থার পক্ষ থেকে নন্দ কুমার ঘোষের পরিচালনায় তিনবার শিশুকিশোর নাট্য-প্রযোজনা হয়েছে, সেই সঙ্গে শিলিগুড়ি নাট্যমেলায় অংশগ্রহণ করে।

২০১১ খ্রি: রবীন্দ্র সার্ধ শতবর্ষে কবিগুরুর 'মুক্তির উপায়' গল্প অবলম্বনে নন্দকুমার ঘোষের নাট্যরূপ নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীর পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়ে দর্শকদের ভীষণ মুগ্ধ করে তুলেছিল, যা ছিল এই সংস্থার সাম্প্রতিক নাট্য-প্রযোজনা যে সব নাট্যশিল্পী তথা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মঞ্চসফল অসাধারণ অভিনয়ের মাধ্যমে এই সংস্থা সমৃদ্ধি লাভ করেছে, তাঁরা হলেন— তাপস ভট্টাচার্য, বিজন সাহা, বাসুদেব ব্যানার্জী, অমিত ব্যানার্জী, নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী (গোরা), অতুল পাল, দীপক গুহ, ভারতেন্দ্র চৌধুরী, কমল ভৌমিক, অজয় দে, স্মৃতিময় ঘোষাল, শান্তা কুণ্ডু, প্রীতিময় ঘোষাল, রণেন সরকার, পুষ্পেন্দু মুখার্জী, দুলাল চক্রবর্তী, শিবেন চক্রবর্তী, নন্দকুমার ঘোষ, কানাইলাল সাহা, দেবাশীষ পাল, শান্তনু বিশ্বাস, লিটন সাহা, গোবিন্দ কুণ্ডু, সোমা পাল, গৌরাঙ্গ সাহা, উৎপল পাল, দীপঙ্কর দে, সোমা বোস, স্বর্ণালী সাহা, শ্রীলেখা চক্রবর্তী, শিউলি ঘোষ, স্মৃতিকণা ঘোষ প্রমুখ। তবে আলাদাভাবে একটি নাম উল্লেখ্য যাঁর অভিনয়ের প্রতিভার গুণে কালিয়াগঞ্জের নাট্যজগতে উত্তরবঙ্গ তথা সমগ্র-বাংলার বুকে উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয়েছে। তিনি হলেন উত্তর দিনাজপুর জেলার মফস্বল শহর কালিয়াগঞ্জের স্কুল পাড়ার তরুণ সুদক্ষ অভিনেতা অমিত ব্যানার্জী। তিনি শৈশবে কালিয়াগঞ্জের অপরাজিতা নাট্যগোষ্ঠীর প্রাণপুরুষ সুহাসমকল গুহের কাছে নাট্যাভিনয়ের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়েছেন। এবং নাট্যগোষ্ঠীর কর্ণধার নাট্যব্যক্তিত্ব নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীর নিকট দীর্ঘদিন নাটকের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে নাটকেই জীবনের পাথেয় হিসেবে বেছে নেন। এরপর তিনি দিল্লীর ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা থেকে ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে

স্নাতক উপাধিতে উত্তীর্ণ হন। পরবর্তীতে নাট্যবিষয়ে এই প্রতিষ্ঠান থেকেই স্নাতকোত্তর উপাধি লাভ করে ৬ বছরের জন্য দিল্লীর স্কুল অফ ড্রামার রিপাটোরী কোম্পানীর দ্বারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে নাটক করার সুযোগ অর্জন করেন। এইভাবে নাট্যজগতে থেকে ক্রমান্বয়ে সিরিয়াল, টেলিফিল্ম এবং চলচ্চিত্র জগতের অভিনয়ে পদার্পণ করে। উত্তরবঙ্গের এই সীমান্ত ঘেষা মফস্বল শহরের কালিয়াগঞ্জের নাট্যচর্চার মানোন্নয়নে অমিত ব্যানার্জী একটি নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।[৬৬]

আশির দশকে কালিয়াগঞ্জের নাট্যচর্চায় 'বলাকা' নামে একটি নাট্যগোষ্ঠী উদ্ভূত হল। এই নাট্যগোষ্ঠীর নাট্যশিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন— বিপ্লব বাগচী, জয়দেব সাহা (নাট্য-নির্দেশক), কাজল গুহরায়, পার্থপ্রতিম চক্রবর্তী, চন্দন দাস, বিভুভূষণ সাহা, বিপ্লব দেবনাথ, চন্দন চক্রবর্তী, গৌতম দে, নির্মল গুহ প্রমুখ। এদের অন্যতম নাট্য-প্রযোজনা 'দুইমহল', 'বায়েন', 'সোনার মাথাওয়ালা মানুষ', 'প্রথম পার্থ' বেশ সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করে অভাবনীয় খ্যাতি লাভ করেন। এই নাট্যসংস্থা 'বায়েন' নাটকটি নাট্য-প্রযোজনা করে অনেক পুরস্কার পেয়েছেন। এছড়াও বলাকার আর একটি অন্যতম নাট্য-প্রযোজনা হল সেক্সপীয়ারের নাট্য পঞ্চক 'ভাগোভূত ভগবান', এই নাট্যপঞ্চকটি অধ্যাপক শ্রী সুভাষ চক্রবর্তী মহাশয়ের রচিত। তবে পরবর্তীকালে এই সংস্থা ভেঙ্গে তৈরি হয় 'প্রতীক' নামে একটি নাট্যগোষ্ঠী। এই নাট্যসংস্থার নেতৃত্বে ছিলেন রজতেশ লাহিড়ী এবং উল্লেখযোগ্য নাট্য-প্রযোজনা 'হরিপদ হরিবোল', 'ঋণ', নাটিকা 'প্রেমের সমাধি তীরে' প্রমুখ।

এরপর ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে 'সংগ্রামী' নাট্যসংস্থা গড়ে ওঠে। 'বেদুইন', 'চেতনায় হানছে আঘাত', 'ট্রোজান' ইত্যানি নাট্য-প্রযোজনা করে দর্শক সমাদর লাভ করে। এই নাট্যসংস্থার নাট্য-নির্দেশক ছিলেন শ্রীস্বপন ভদ্র এবং অন্যান্য নাট্যশিল্পীদের মধ্যে লিটন সরকার, শুভেন্দু চক্রবর্তী, খোকন দেবনাথ, পরেশ রায়, আনন্দ কুণ্ডু শুক্লা দাশগুপ্ত, বন্দনা সাহা, পদ্মদেবনাথ প্রমুখ। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে কালিয়াগঞ্জে 'নাট্যায়ন গোষ্ঠী' তৈরি হয়ে কয়েকটি পূর্ণাঙ্গ নাটক মঞ্চস্থ করে সুনাম অর্জন করে। নাট্য-প্রযোজনাগুলির মধ্যে তোতারাম, কেনারাম বেচারাম ইত্যাদি ছিল উল্লেখযোগ্য।

নব্বই এর দশকে অর্থাৎ ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ শহরের নাট্যচর্চার জগতে অন্যতম আলোচিত ও প্রাণচঞ্চল নাট্যগোষ্ঠী হিসেবে 'অনন্য থিয়েটার' নাট্যগোষ্ঠীর জন্ম হয়। এই নাট্যসংস্থা সম্প্রতি নাটকের পাদ প্রদীপের আলোয় প্রবেশ করে দর্শক চিত্তে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়ে তোলে। অনন্য থিয়েটারের হাত ধরে এই জেলায় আধুনিক নাট্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অভিনেতৃমণ্ডলী তৈরির যে প্রচেষ্টা তার প্রথম সূত্রপাত হয়। অর্থাৎ এই সংস্থার নাট্যশিল্পীরা বিভিন্ন সময়ে নিজেরা নাট্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে নাট্য-প্রযোজনায় মনোনিবেশ করেন। মোটকথা অনন্য থিয়েটারের নাট্যশিল্পীরা স্বর প্রক্ষেপণ রপ্ত করার জন্য ব্যায়াম, উচ্চারণের শুদ্ধতার জন্য প্রশিক্ষণ

এবং আঙ্গিক অভিনয়ের জন্য রীতিমতো শারীরিক ও যোগশিক্ষা নিয়েছেন। এজন্য বিভূভূষণ সাহা ও চন্দন চক্রবর্তী দীর্ঘদিন এ সব বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন দিল্লীর ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা থেকে স্নাতকোত্তর প্রাপ্ত এই কালিয়াগঞ্জ থানারই দিকপাল অভিনেতা অমিত ব্যানার্জী, কলকাতার সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী এবং বহরমপুরের প্রদীপ ভট্টাচার্যের মতো নাট্যজগতের সুপরিচিত নাট্যব্যক্তিত্বদের কাছে। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ৭ই অক্টোবর অনন্য থিয়েটারের প্রযোজনায় প্রথম মঞ্চস্থ হয় পূর্ণাঙ্গ নাটক 'সন্ন্যস্ত' শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কাহিনীর নাট্যরূপ দেন বালুরঘাট তথা উত্তরবঙ্গের প্রখ্যাত নট ও নাট্যকার হরিমাধব মুখোপাধ্যায়। তাঁরই পরিচালনায় ও নির্দেশনায় এই নাটকটি অঞ্চায়নের পর জেলার নাট্যমহলে বেশ সাড়া ফেলে দেয়। এরপর কলকাতার সিদ্ধার্থ চক্রবর্তীর পরিচালনায় 'জটায়ু', এবং কলকাতার পার্থ ব্যানার্জীর পরিচালনায় 'সিন্ধুনদের প্রহরী', 'স্বাজাত্য' ও একটি করপোরাস ড্রান্স্ ড্রামা, 'মারী ফারার' (যা ব্রেশট-এর কবিতা অবলম্বনে রচিত) এই তিনটি নাটকই মঞ্চস্থ হয়। এই নাট্যসংস্থার অন্যতম ও উল্লেখযোগ্য মঞ্চসফল অভিনেতা অভিনেত্রীদের মধ্যে রয়েছেন হিল্লোল চক্রবর্তী, চন্দন চক্রবতী, বিভূতিভূষণ সাহা, মানিক রায়, রঞ্জন মোদক, সংগ্রামী ভট্টাচার্য, শান্তা চক্রবর্তী, শ্রাবন্তী মুখার্জী, সুতপা দত্ত, স্নিগ্ধা চক্রবর্তী, জয়ন্তী সাহা, সঙ্ঘমিত্রা রায়চৌধুরী এছাড়াও আছেন দীপক চক্রবর্তী, শান্তনু দাস, শম্পা গুহ, সরিৎ দাস, শান্তনু মজুমদার, প্রদীপ কুণ্ডু, পার্থ দাশগুপ্ত, দীপেশ সাহা, সুশান্ত বণিক, মামন দাস এবং শুভাশীষ দাস আরও অনেকে উল্লেখযোগ্য।

এই নাট্যসংস্থা ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে থেকে ২০১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ১৭ বছরে মোট ১৪টি পূর্ণাঙ্গ ও একাঙ্ক নাট্য-প্রযোজনা করেন। এই গুরুত্বপূর্ণ নাট্য-প্রযোজনাগুলি হল— 'আদাব', 'গোধূলী বেলায়', 'জটায়ু', 'সিন্দু নদের প্রহরী', 'স্বাজাত্য', 'মারী ফারার', 'গণ্ডি চইরবেতি', 'অন্তরালের আলো', 'প্রকৃতির প্রতিশোধ', 'যখন অন্ধ প্রকৃতি', 'চণ্ডালিকা', 'কমলাসুন্দরী' ও 'ভীষ্ম'। অনন্য থিয়েটারের নাট্য-নির্দেশক নির্দিষ্ট একজন নন বরং অনেকেই ছিলেন। দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটের ত্রিতীর্থ নাট্যসংস্থার প্রাণপুরুষ ও বিশিষ্ট নাট্য-নির্দেশক হরিমাধব মুখোপাধ্যায় ছাড়াও রয়েছেন চন্দন চক্রবর্তী এবং অতিথি পরিচালক হিসেবে ছিলেন সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী, পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভাশীষ গঙ্গোপাধ্যায়। এদের প্রযোজিত নৃত্যনাটক 'মারী ফায়ার' ব্রেশ্‌টের কবিতা অবলম্বনে তৈরি একটি সম্পূর্ণ ভিন্নস্বাদের সফল নাট্য-প্রযোজনা। মোটকথা এই নাটকটি অনুভব বেদ্যনাটক, সর্বসাধারণের জন্য নয়। এই নাট্য-প্রযোজনার নাম ভূমিকায় শ্রাবন্তী মুখার্জীর মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, অত্যন্ত পরীক্ষামূলক নাট্য-প্রযোজনা এই 'মারীফারার' ও 'সিন্ধুনদের প্রহরী' সমগ্র উত্তরবঙ্গ তথা বাংলার বাইরে পাঞ্জাব, দিল্লীতে বেশ নিপুণভাবে মঞ্চস্থ করে বহুল প্রশংসিত হয় এবং যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে। এই সংস্থার সবচেয়ে বেশি মঞ্চস্থ নাটকগুলির মধ্যে

উল্লেখযোগ্য হল 'মারী ফায়ার' (২৩ রজনী), 'সন্ন্যস্ত' (১৬ রজনী) ও ময়মনসিংহ গীতিকা' অবলম্বনে রচিত পূর্ণাঙ্গ নাটক 'কমলা সুন্দরী' (১১ রজনী)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এদের সাম্প্রতিক নাট্য-প্রযোজনা 'কমলা সুন্দরী' ও 'ভীষ্ম নাটক' দুটি প্রখ্যাত নাট্য নির্দেশক শ্রী শুভাশীষ গাঙ্গুলীর নির্দেশে ও বিভূতিভূষণ সাহার পরিচালনায় বহু রাত্রি মঞ্চস্থ হয়।

অনন্য থিয়েটার নাট্য-প্রযোজনা করার পাশাপাশি বছর তিনেক নাট্য মেলার আয়োজন করেছেন এবং এই নাট্যমেলায় জেলা তথা সারা উত্তরবঙ্গ সহ ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ থেকে নাট্যদল এসে বেশ প্রাসঙ্গিক ও মনোজ্ঞ নাটক মঞ্চস্থ করে জেলার নাট্যপ্রেমী দর্শকদের ভীষণ আপ্লুত ও অনুপ্রাণিত করে যথেষ্ট সাড়া ফেলে দিয়েছে। এই নাট্যসংস্থাটির উদ্যোগে পরিচালিত ছোটদের 'থিয়েটার স্কুল' নিঃসন্দেহে প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী ভাবনা। জেলায় এইরকমের স্কুল অবশ্যই বিরল। কালিয়াগঞ্জ শহরের উত্তর চিড়াই পাড়ায় এই স্কুল গড়ে ওঠে। তারা ছোটদের সম্পর্কে ভেবে এই 'থিয়েটার স্কুল' তৈরি করেছেন এবং সেখানে নাটকের বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এখানে মুক্তাঙ্গনে খেলার ছলে নাটক শেখানো হয়। অর্থাৎ শিশু শিল্পীদের মনোজগতের অনুসন্ধানে এখনকার প্রশিক্ষকরা মগ্ন থাকেন। এই পরিশ্রমের ফলে অতি দ্রুত অনন্য' থিয়েটারের স্কুলে'র শিল্পীরা অনেক উল্লেখযোগ্য শিশু নাটক প্রযোজনা করে যথেষ্ট প্রশংসা ও খ্যাতি লাভ করে। এদের প্রশংসিত নাট্য-প্রযোজনাগুলির মধ্যে রয়েছে 'সুজন হরবোলা', 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল', 'তাসের দেশ', 'আলা ইজা', 'হীরু ডাকাত', 'পাঠশালা', 'দুষ্টু দর্জি', 'আলো', 'জুতা আবিষ্কার' প্রভৃতি। এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা অবলম্বনে সংস্থার নিজস্ব নাট্যকার শান্তনু মজুমদারের নাট্যরূপ 'জুতা আবিষ্কার' শিশু নাটকটি কলকাতার রাজ্য স্তরের শিশু-কিশোর নাট্য-উৎসবে অংশগ্রহণ করে বহুল প্রশংসিত হয়।

কালিয়াগঞ্জ থানার এই কনিষ্ঠ নাট্যসম্প্রদায় অনন্য থিয়েটার জেলাস্তরে সৃজনশীল নাটকের আরও বেশি করে মঞ্চায়নের উদ্দেশ্যে বাৎসরিক নাট্যোৎসব 'অনন্য নাট্যমেলা' আয়োজনও করে চলেছে। বর্তমানে এরা 'অনন্য' নামে একটি নাট্য পত্রিকা প্রকাশ করছে। অর্থাৎ নাটকের প্রচার সহ জনমানসে বিশেষ করে নাট্যভাবনা তৈরীর লক্ষ্যে অনন্য থিয়েটার নিয়মিতভাবে নাট্য-বিষয় নিয়ে নাটকের কাগজ 'অনন্য' প্রকাশ করে চলেছে। যা জেলার নাট্যচর্চার জগতে অবশ্যই স্মরণীয় দৃষ্টান্ত। মোটকথা উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত এক মফস্বল থানা সদরে অবস্থান করেও এমন সুদূরপ্রসারী ভাবনা অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। তবে আর একটি বিষয় বিশেষ করে উল্লেখ্য যে, অনন্য থিয়েটারই এ জেলার তথা সারা উত্তরবঙ্গের একমাত্র নাট্যদল যাদের তটি নাট্য-প্রযোজনা দিল্লীর রাষ্ট্রীয় নাট্যবিদ্যালয় আয়োজিত 'ভারত রঙ্গমহোৎসব'-এ অংশ গ্রহণ করে জেলা তথা সমগ্র বাংলার

নাট্যচর্চার জগতে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। অনন্য থিয়েটারের এই অসাধারণ নাট্য-প্রযোজনাগুলির মধ্যে রয়েছে ২০০২ খ্রিস্টাব্দ 'মারী ফারার', ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ 'অন্তরালের আলো' এবং ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ 'চোর চরণদাস' এছাড়াও অনন্য থিয়েটার জেলা তথা উত্তরবঙ্গের একমাত্র নাট্যসংস্থা, যারা Ministry of culture-এর আর্থিক সহায়তা ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে পেয়ে থাকে।[৬৭]

এই অনন্য থিয়েটার নাট্যগোষ্ঠীর নির্বাসনের সমসাময়িক কালে অর্থাৎ নব্বই-এর দশকে নতুন নাট্যদল 'অন্যজন' ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ গঠিত হয়ে প্রথম নাট্য-প্রযোজনা 'ঝালাপালা' মঞ্চস্থ করে পথচলা শুরু করে। এরপর এদের উল্লেখযোগ্য নাট্য-প্রযোজনার মধ্যে রয়েছে 'দয়ারামের দাড়িপাল্লা', 'পৃথিবীর মানুষ', 'ফুলি', 'হাঁদাভোদা', 'পালিয়ে বেড়ায়', 'পাগলা ঘোড়া', 'অদৃশ্য কাটা তার', 'না', 'যারা মানুষ নয়', 'এক টিভি নিউজ' প্রভৃতি। এই নাট্যসংস্থা বিভিন্ন নাট্যমেলার প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে নাটকগুলি মঞ্চস্থ করেছে। অন্যজন নাট্যসংস্থার-পরিচালক ও নাট্য-নির্দেশক ছিলেন আব্দুল আলি। তিনি নিজেও বহু নাটক রচনা করেছেন। অন্যজন নাট্য সংস্থার মঞ্চ সফল নাট্যশিল্পীরা হলেন আব্দুল আলি, রঞ্জন দে, উত্তম সূত্রধর, ফান্টা কর্মকার, বাপি মহাজন, দীপক দে, লালু দে, পিয়ূষ নন্দী, প্রকাশ কুণ্ডু, সঞ্চয় পাল, অরুণ পাল, গৌতম দত্ত, চায়না ঘোষ, আলো মহন্ত, শুভময় সাহা, নিশিকান্ত সাহা আরও অনেকে উল্লেখযোগ্য।

সম্প্রতি কালিয়াগঞ্জের নাট্যসংস্থাগুলির কর্তৃপক্ষের হাতে নতুন চেতনার নাটক আসছে এবং তাঁরা স্বাভাবিক ছন্দেই অতি মনোনিবেশ ও যত্নসহকারে মঞ্চস্থ করছে। তাঁদের এই নাট্য-প্রযোজনাকে কেন্দ্র করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা স্বতস্ফূর্তভাবে এগিয়ে চলছে এবং এর ফলে জেলার নাট্য-চর্চার ধারা গতিশীল হয়ে উঠেছে। এবং উত্তর দিনাজপুর জেলার নাট্যঐতিহ্য মফস্বল কেন্দ্রিক নাট্যচর্চার গণ্ডী অতিক্রম করে আজ গুণমানে সমাদর লাভ করছে। তাই সর্বোপরি একথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় যে কালিয়াগঞ্জ থানার অন্তর্ভুক্ত এই নাট্যসংস্থাগুলির সম্মিলিত ও সার্থক নাট্যপ্রয়াস জেলার নাট্যচর্চার সীমারেখা ভেদ করে পশ্চিমবঙ্গের নাট্যচর্চার জগতে জায়গা করে নিয়েছে।

উত্তরদিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ মহকুমার অন্তর্ভুক্ত হেমতাবাদ ও ইটাহার থানা দুটিও এই জেলার নাট্যচর্চায় সমতালে এগিয়ে এসে যথেষ্ট শক্তি জুগিয়েছে। হেমতাবাদ থানা রায়গঞ্জ মহকুমার নাট্যচর্চার দ্বারা অনেকটা আন্দোলিত হয়েছিল। এই থানা শহরের অধিবাসীরা ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে 'গৌরাঙ্গ স্মৃতি সংঘ' নাম নিয়ে অনেক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করেন। পরবর্তীকালে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে উক্ত নাম পরিবর্তন করে 'গৌরাঙ্গ স্মৃতি সংঘে'র সংস্কৃতিক ও কৃষ্টি মূলক বিভাগের ক্রিয়াকর্ম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে নতুন নামকরণ হয় 'রূপক শিল্পী সংস্থা'। তবে একথা বিশেষ করে বলে রাখা

প্রয়োজন যে, এই সংস্থার কর্তৃপক্ষের কেবলমাত্র মহিলা শিল্পীদের দ্বারা বহু নাটকের প্রযোজনা করেছেন। এই অঞ্চলটি মূলতঃ গ্রামীণ পরিবেশ নির্ভর হওয়ার কারণে গ্রামবাংলার জনসাধারণকে অভিনয়ের মাধ্যমে নতুন তথ্য পরিবেশন সহ নতুন চিন্তা-চেতনায় সমৃদ্ধ করে তোলার উদ্দেশ্যে এই সংস্থাটি স্থাপিত হয়। এমনকি গ্রামকেন্দ্রিক সংস্কৃতি চর্চার সঙ্গে শহরকেন্দ্রিক সংস্কৃতি চর্চার মেল বন্ধনের একটা পরোক্ষ উদ্দেশ্য পূরণের প্রয়োজনীয়তাও তারা অনুভব করেছিলেন।

এই 'রূপক শিল্পী সংস্থা' বিভিন্ন স্বাদের কয়েকটি নাট্য-প্রযোজনা করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাট্য-প্রযোজনাগুলি হল— 'কার শেষ', 'অমৃতস্য পুত্রাঃ', 'উল্কা', 'কর্ণার্জুন', 'পণ্ডিত মশাই', 'অগ্নিগর্ভ হেকেমপুর ও পরাণ মণ্ডলের ঘর গেরস্থী', 'কালোবাতির কান্না', 'ক্যানে কেন্নে' (আঞ্চলিক ভাষায়, নাট্যকার-নৃপেন্দ্রনাথ মহন্ত), 'সামান্য ক্ষতি' (নৃত্যনাট্য), 'দেবতার গ্রাস', 'বিষুবরেখা' প্রভৃতি। এছাড়াও অসংখ্য শ্রুতিনাটক মঞ্চস্থ করেছে। এই নাট্যসংস্থার মঞ্চসফল অভিনেতারা হলেন— মিহির দাশগুপ্ত, অমিতাভ সেনচৌধুরী, নৃপেন্দ্রনাথ মহন্ত, গণেশ দাশগুপ্ত, শ্যামল দাশগুপ্ত, স্বপন দত্ত, পীযূষ দত্ত, সুব্রত সিন্‌হা, অশোক নাগ, মীরা নাগ, মৌপালি চক্রবর্তী, রেবা দত্ত, কামাক্ষাপ্রসাদ দত্ত, উষসী দাশগুপ্ত, নিকীতা সাহা, সামৃদ্ধি দাশগুপ্ত প্রমুখ।

এই নাট্যসংস্থা কখনো কখনো আর্থিক অভাব অনটনের কারণে গ্রামে চাঁদা তুলে প্রযোজনার খরচ চালিয়েছেন। এমতাবস্থায় এই সংস্থার বেকার তরুণ যুবকেরা নিজেদের প্রচেষ্টায় নাট্য-প্রযোজনার খরচ চালাতে গিয়েও হিমসিম খেয়ে পড়েছেন। এর ফলে তাদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দের অভাবজনিত কারণে নাট্য-প্রয়াস কখনো কখনো শ্লথ হয়ে যায়। যতদূর জানা যায় এই সংস্থার একান্ত ইচ্ছা ও উৎসাহ থাকা সত্ত্বেও অভিনয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম বিশেষ করে সেট, পোষাক ও আলোর সু-ব্যবস্থা না থাকায় গুণমানে উপযোগী নাট্য-প্রযোজনা করা সম্ভব হয়নি। সম্প্রতি এই অঞ্চলে 'হেমতাবাদ সংস্কৃতি মঞ্চ' (২০০৪খ্রি:) এর উদ্যোগে ও স্বকীয় তৎপরতায় নাট্যচর্চা ও অন্যান্য সংস্কৃতিমূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। এই সংস্থার সম্পাদক মিহির দাশগুপ্ত। এদের অন্যতম অভিনেতারা হলেন অমিতাভ সেনচৌধুরী, পবিত্র চক্রবর্তী, নৃপেন্দ্রনাথ মহন্ত, প্রণব গুপ্ত, রণ সেন প্রমুখ। এই মঞ্চের উদ্যোগে আয়োজিত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিশু কিশোর ও তরুণ প্রজন্মের তৎপরতায় নাট্যচর্চা আজও ক্রিয়াশীল। যা এ অঞ্চলে অভাবনীয় সাড়া ফেলে দিয়েছে।[৬৮]

উত্তর দিনাজপুর জেলার নাট্যচর্চার অন্যতম অংশীদার ইটাহার থানা শহর রায়গঞ্জ থানার ২৪ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। ইটাহার থানা ক্রমশ গ্রামকেন্দ্রিক সংস্কৃতি চর্চার (যাত্রা ও পালাগান) বাতাবরণ থেকে বেরিয়ে এসে সত্তরের দশকে নাট্যচর্চা শুরু করে। এই থানার অন্যতম

ও উল্লেখযোগ্য নাট্যসংস্থা হল 'পঞ্চম বেদার্থী'। এই নাট্যসংস্থার উদ্যোগ নিয়ে বেশ কয়েকটি নাট্য-প্রযোজনা করে সাফল্য লাভ করে। তার মধ্যে 'একলব্য' নাট্য-প্রযোজনাটি এই অঞ্চলের দর্শক মহলে যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রশংসা লাভ করে। এর পর সাম্প্রতিককালে অর্থাৎ ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে ইটাহার সাহিত্য সংস্কৃতি সোসাইটির তরুণ নাট্য শিল্পীদের উদ্যোগে গড়ে ওঠে 'প্রচেষ্টা নাট্যসংস্থা'। এ নাট্যসংস্থার নেতৃত্বে রয়েছেন সুদীপ্ত মিত্র, অজয় চক্রবর্তী, সন্দীপ রায় প্রমুখ। তবে বর্তমান সম্পাদকের দায়িত্বে রয়েছেন অজয় চক্রবর্তী মহাশয়। এই নাট্যসংস্থা এই অঞ্চলে নাট্যচর্চার পাশাপাশি কালিয়াগঞ্জের নাট্যসংস্থাগুলি আহ্বানে সাড়া দিয়ে এবং সেই সঙ্গে এই জেলার বিভিন্ন জায়গায় নাট্যোৎসবে নাট্যপ্রযোজনা করে বহু প্রশংসা ও সুনাম অর্জন করেছেন। প্রচেষ্টা নাট্যসংস্থার অন্যতম নাট্য-প্রযোজনাগুলির মধ্যে রয়েছে— 'আদাব', 'বাঞ্ছারামের বাগান', 'কিনু কাহারের থিয়েটার' প্রভৃতি।

এছাড়াও এ সংস্থার প্রতিষ্ঠা লগ্নের সদস্য তথা সম্পাদক ও নাট্যনির্দেশক অজয় চক্রবর্তীর যুবসমাজের অবক্ষয় ও পরিণতির করুণ কাহিনী নিয়ে স্বরচিত নাটক 'ওরা কারা' মঞ্চস্থ হয় এবং দর্শক ধন্য হয়ে ওঠে। এই নাট্যসংস্থার উল্লেখযোগ্য নাট্যশিল্পীদের মধ্যে যাঁরা সংস্থার অভিনয়ে সমৃদ্ধি এনে দিয়েছিল, তাঁরা হলেন রাজু বসাক, প্রবীর সরকার, বিশ্বজিৎ মৈত্র, সুবীর বসাক, চৈতালী রায়, কাকলী ঘোষ প্রমুখ।[৬৯]

এই অঞ্চল সম্পূর্ণরূপে গ্রাম্য পরিবেশে অবস্থিত হওয়ার সুবাদে এখানকার মানুষের মধ্যে গ্রামীণ জীবনযাত্রা নির্ভর সংস্কৃতি প্রাধান্য পেলেও এখানকার নাট্যপ্রেমী শিল্পীরা আন্তরিক উৎসাহ ও তৎপরতার মধ্য দিয়ে আজও নাট্য- প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। তার ফলে এখানে নাট্যচর্চা অবশ্য ব্যাপকতা লাভ করতে না পারলেও নাট্যরস পিপাসু দর্শকদের মনোরঞ্জনের অনেক প্রতিকূলতাকে জয় করে নাট্য প্রযোজনা করেই চলেছেন। যা এই উত্তর দিনাজপুর জেলার নাট্যচর্চার ঐতিহ্যবাহী ধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখে প্রবহমান গতিতে এগিয়ে চলেছে।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা লাভ ও ভারতভূখণ্ড বিভাগের ফলে দিনাজপুর জেলাও দ্বিখণ্ডিত হয়। তখন সাবেক দিনাজপুর জেলার অবশিষ্ট ১০ থানা এবং দুটি মহকুমা-বালুরঘাট ও রায়গঞ্জের সমন্বয়ে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার উদ্ভব হয়। সেই সময় রায়গঞ্জ মহকুমা পূর্বতন দিনাজপুর সদর মহকুমার ভারতভুক্ত ৬টি থানা রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, হেমতাবাদ, ইটাহার, কুশমণ্ডী ও বংশীহারী নিয়ে গঠিত হয়েছে। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে দেখা যায় বংশীহারী থানার পশ্চমাংশ নিয়ে হরিরাম পুর নামে এক নতুন থানা গঠিত হয়ে রায়গঞ্জ মহকুমার অধীনভুক্ত হয়। দেশ ভাগের ফলে নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তরাংশের সঙ্গে অবশিষ্টাংশের ভৌগোলিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায়

১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে ভারত সরকার ফজল আলির নেতৃত্বে রাজ্যপুনর্গঠন কমিশন গঠন করলে পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে বিহার রাজ্যের বাংলা ভাষাভাষী কিছু এলাকা পশ্চিমবঙ্গ ভুক্ত করার দাবি ওঠে। ভাষাগত দাবি ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশের সঙ্গে অবশিষ্টাংশের সরাসরি সংযোগ সাধনের উদ্দেশ্যে বিহারের পূর্ণিয়া জেলাকে পশ্চিমবঙ্গভুক্ত করার খুব জোরালো দাবি ছিল। রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন ভাষাগত দাবিকে মান্যতা না দিয়ে সংযোগ সাধনের দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করে তদনুযায়ী পূর্ণিয়া জেলার কিছু অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গে হস্তান্তরের সুপারিশ করে। তখন লক্ষণীয় বিষয় হল, এই পরিপ্রেক্ষিতে সংসদে গৃহীত Bihar and West Bengal (Transfer of Territories) Act. 1956 অনুযায়ী পূর্ণিয়া জেলার ঠাকুরগঞ্জ, চোপড়া, ইসলামপুর, কিশানগঞ্জ, গোয়ালপুকুর ও করণ দিঘি থানার মোট ৭৩২.৮৮ বর্গমাইল এলাকা পশ্চিমবঙ্গ লাভ করে। এরপর জানা যায় যে, এই হস্তান্তরিত ভূখণ্ড ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১লা নভেম্বর তারিখে গেজেটের ৩৮৫৮ নং বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দার্জিলিং জেলাভুক্ত করা হলেও ঠিক পরে দিনই অর্থাৎ ২রা নভেম্বর তারিখে আর একটি গেজেটের ৩৮৭৫ নং বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ঐ ভূখণ্ড পশ্চিমদিনাজপুরের জেলার রায়গঞ্জ মহকুমাভুক্ত হয়। তবে এই হন্তান্তরিত ভূখণ্ড নিয়ে পরবর্তীতে ৪টি থানা গঠিত হয়— ১. হস্তান্তরিত ভূখণ্ডের যে অংশ পূর্ণিয়া জেলার চোপড়া ও ঠাকুরগঞ্জ থানার অংশ ছিল তা নিয়ে নতুন চোপড়া থানা গঠিত হয়েছে। ২. যে অংশ পূর্ণিয়া জেলার ইসলামপুর থানাভুক্ত ছিল তা নিয়ে ক্রমে নতুন ইসলামপুর থানা হয়েছে। ৩. যে অংশ নিয়ে গোয়ালপুকুর থানা ছিল এবং যে অংশ কিশানগঞ্জ থানাভুক্ত ছিল তা নিয়ে গোয়ালপুকুর থানা হয়েছে। ৪. আর যে অংশ করণদিঘি থানাভুক্ত ছিল তা নিয়ে নতুন করণদিঘি থানা হয়েছে। পরবর্তীতে ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে ২০ শে মার্চ পশ্চিমদিনাজপুর জেলাভুক্ত চোপড়া থানার যে অংশ মহানন্দা নদীর উত্তরে অবস্থিত ছিল তা দার্জিলিং জেলার ফাঁসিদেওয়া থানাভুক্ত করা হয়। ফলে মহানন্দা নদী পশ্চিম দিনাজপুর জেলার উত্তর সীমারেখা রূপে চিহ্নিত হয় এবং বিশেষ করে উল্লেখ্য যে, এই একই তারিখে অর্থাৎ ২০.০৩.১৯৫৯ তারিখে অপর এক সরকারী আদেশে ১১৭৭ নং বিজ্ঞপ্তি U/S. (S) of Cr.P.C. 1898, (Act.V of 1898) অনুযায়ী পূর্ণিয়া জেলা থেকে মহকুমা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নতুন ইসলামপুর মহকুমা হিসাবে ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারি গোয়ালপুকুর থানার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ নিয়ে নতুন চাকুলিয়া থানা গঠিত হয়ে তা ইসলামপুর মহকুমাভুক্ত হয়। কিন্তু জেলা বিভাজনের পালা এখানেই শেষ না হয়ে পুনরায় ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের ১লা এপ্রিল পশ্চিমদিনাজপুর জেলা দ্বিখণ্ডিত হয়ে উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর নামে দুটি স্বতন্ত্র জেলার উদ্ভব হয়। এর ফলে দেখা যায় জেলার উত্তর ও পশ্চিমাংশের নয়টি থানা নিয়ে গঠিত বর্তমান উত্তর দিনাজপুর জেলার অধীনে চোপড়া, ইসলামপুর, গোয়ালপুকুর,

করণদিঘি ও চাকুলিয়া এই পাঁচটি থানার সমন্বয়ে পুনরায় নতুন করে ইসলামপুর মহকুমা গঠিত হয়।

সরকারীকাজের সুবিধার জন্য হঠাৎ করে গড়ে ওঠা ইসলামপুর মহকুমা শহর ছিল মূলত: একটি গ্রামীণ পল্লীমাত্র। এর ফলে লক্ষ করা যায় সদ্য উদ্ভূত শহরের সঙ্গে এর মৌলিক বিভেদ ছিল প্রচুর। মোটকথা দীর্ঘদিন ধরে বিহার রাজ্যের অধীনভুক্ত অংশ হয়ে থাকার ফলে এখানে খাঁটি বাংলা সংস্কৃতিক পরিমণ্ডল খুব ধীরে তৈরি হয়। যতদূর জানা যায়, নবাগত ইসলামপুর মহকুমা অঞ্চলের অপরিচিত মানুষেরা কলকাতার যাত্রাদলের মাধ্যমে প্রথম বাংলা নাট্য— আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত হন। তারপর মহকুমা শহর হিসাবে ইসলামপুর গঠনের ফলে বিভিন্ন সরকারী অফিসের কাজে আগত বিশিষ্ট সংস্কৃতি প্রেমী ভদ্র মহোদয় ব্যক্তিবর্গেরাই উদ্যোগ নিয়ে প্রথমে নানারকম প্রতিকূল পরিবেশকে অতিক্রম করে থিয়েটার চর্চার মানসে নাট্যসংস্থা গড়ে তুলে নাট্যভিনয় শুরু করেছিলেন। এর ফলে দেখা যায় এই মহকুমা শহরের আমলা তথা অফিসার বৃন্দরাই প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনায় 'সুহৃদ সংঘ' নামে একটি ক্লাব গড়ে ওঠে এবং উক্ত ক্লাবের বারান্দায় অস্থায়ী মঞ্চ তৈরি করে এই নাট্যমোদিগণ এক সময় একত্রিত হয়ে নাটক মঞ্চস্থ করতে শুরু করেন। এইভাবে নাট্যচর্চার তথা নাট্যভিনয়ের উদ্দেশ্যে ক্রমপর্যায়ে গত ৫-১০ বছরের মধ্যে এখানে একে একে বেশ কয়েকটি নাট্যসংস্থা গড়ে ওঠে। এবং তারা উদ্যোগ নিয়ে ২৫শে বৈশাখ, লেনিন জন্মোৎসব, সুকান্ত জন্মোৎসব, বিভিন্ন পূজা যেমন— কালীপূজা, দুর্গাপূজা, সরস্বতীপূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রকম নাটক বেশ সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করতে লাগলেন।

উত্তর দিনাজপুর জেলায় ইসলামপুর মহকুমার নাট্যচর্চায় অংশগ্রহণ করে সক্রিয় ভূমিকা পালনের মধ্যে দিয়ে যে সবনাট্যদল এগিয়ে এসেছিল অতীতের সেই সব উল্লেখযোগ্য সৌখিন নাট্যদলগুলি হল— 'তরুণ নাট্যচক্র', 'পি অ্যাণ্ড টি রিক্রিয়েশন ক্লাব', 'ব্লক অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাব', 'যাত্রিক', 'উত্তরণ', 'শিল্পীচক্র' প্রভৃতি। উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর মহকুমার প্রথম পর্বের উল্লেখযোগ্য নাট্যসংস্থা 'তরুণ নাট্যচক্রে'র মঞ্চসফল পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাট্য প্রযোজনা 'স্বর্ণহরিণ', 'বিশ বছর আগে', 'শিশুর কুমারী', 'বঙ্গে বর্গী', 'সিরাজদ্দৌলা' প্রভৃতি মঞ্চস্থ করে যথেষ্ট দর্শক ধন্য ও প্রশংসিত হয়। এরপর 'যাত্রিক' নাট্যসংস্থার অন্যতম নাট্য প্রযোজনা গুলি হল— 'টিপুসুলতান', 'কারপাপে', 'উত্তরা', 'রক্তকরবী', 'কালিন্দী', 'লৌহ প্রাচীর', 'গোলাপ কাঁটা', 'বারো ঘন্টা' প্রভৃতি এতদ্ অঞ্চলে বেশ সাড়া জাগিয়ে তোলে। এই সময়পর্বের নাট্য-প্রযোজনায় অগ্রগণ্য ভূমিকা পালনে এগিয়ে এসেছিল বেশ কয়েকটি নাট্যসংস্থা। যথা—

পোস্ট অ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবে'র অন্যতম নাট্য-প্রযোজনা— 'এক পেয়ালা কফি'-সামাজিক পূর্ণাঙ্গ নাট্য-প্রযোজনা।

শিল্পীচক্রের মঞ্চসফল নাট্য-প্রযোজনা— 'বাকি ইতিহাস' সামাজিক পূর্ণাঙ্গ নাট্য-প্রযোজনা। 'উত্তরণ' নাট্যসংস্থার শ্রেষ্ঠ নাট্য-প্রযোজনা— 'রক্তে বোনা ধান' রাজনৈতিক পূর্ণাঙ্গ নাট্য-প্রযোজনা।

এছাড়াও 'গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন'-এর নাট্য-প্রযোজনা উল্লেখের দাবি রাখে। যথা— 'রক্তের বোনা ধান', 'অভ্যুত্থান', 'সোনালী স্বপ্ন', 'এক যে ছিল রাজা', 'আরও একজন নিহত' প্রভৃতি রাজনৈতিক ও সামাজিক পূর্ণাঙ্গ নাটক। এছাড়াও 'নেতাজী সংঘ', 'বৈতালিক', 'পাটাগোরা রিক্রিয়েশন ক্লাব' ইত্যাদি নাট্যসংস্থাগুলি এই পর্বের বিভিন্ন সময়ে নাট্য-প্রযোজনা করে থাকেন।

ইসলামপুর মহকুমায় সত্তরের দশক থেকে নিয়মিত এবং অনিয়মিত ভাবে নাট্য-প্রয়াসের মধ্য দিয়ে যে সব নাট্যসংস্থা গড়ে উঠেছে সেগুলি হল— বিপ্লবী সংঘ, বলাকা, রানার, শিল্পীসেনা, অগ্নিশিখা, শিল্পতীর্থ, স্পুটনিক ক্লাব প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই নাট্যসংস্থাগুলির মধ্যে যেসকল নাট্যসংস্থা নিয়মিতভাবে নাট্য প্রযোজনা করে চলেছেন— 'রানার', ইসলামপুর: এই নাট্যসংস্থাটি সুধীর বিশ্বাস ও চন্দন সেনগুপ্তের মতো নাট্যমোদি ব্যক্তির উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় গযে ওঠে। রানারের বলিষ্ঠ নাট্য-প্রযোজনা— 'আঁখের স্বাদ নোনতা', 'আজও হিটলার', 'স্বাধীনতার জন্য', 'হইতে সাবধান' প্রভৃতি। এই সংস্থার অন্যতম নাট্যশিল্পীরা হলেন— সুনীল ঘোষ, অশোক ঘোষ, আশু মণ্ডল, বাবু রায় প্রমুখ। বিপ্লবী সংঘ, ইসলামপুর, উত্তরদিনাজপুর: এই নাট্য সংস্থার শ্রেষ্ঠ নাট্য-প্রযোজনা 'সাজানো বাগান', 'বিলাসী', 'ইতিহাস কাঁদে', 'ফেরারী ফৌজ' প্রভৃতি। এই নাট্যসংস্থার উল্লেখযোগ্য নাট্যশিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন প্রভাত তালুকদার, চন্দন সাহা, প্রবীর বর্মন, তপন চক্রবর্তী প্রমুখ। এ সংস্থার সম্প্রতি নাট্যচর্চার চলমানতাকে ধরে রাখার প্রয়াসে প্রবল সক্রিয়তার সঙ্গে প্রতিবছর সৃজনশীল নাটকের মঞ্চায়নের লক্ষ্যে নাট্যোৎসবের আয়োজন করে এই অঞ্চলের নাট্যজগতে বেশ সাড়া জাগিয়ে তোলে এবং নাট্যপ্রেমী দর্শকদের নাট্যরস পিপাসা পরিতৃপ্ত করে বহুল প্রশংসা লাভ করে।

অগ্নিশিখা (১৯৮০খ্রি:), ইসলামপুর : এই সংস্থা প্রভাত তালুকদারের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে। বর্তমান সম্পাদক শম্ভু মজুমদার। এই নাট্য সংস্থাটির উল্লেখযোগ্য নাট্য-প্রযোজনা হল— 'শ্বাপদ', 'ইজ্জত', 'কিনু কাহারের থিয়েটার', 'আহারে মরণ', 'আখি পল্লব', 'দুর্ঘটনা', 'ফিংক্স্', 'প্রেম নয় তরোয়ারী', 'বৌদির বিয়ে' প্রভৃতি। এই নাট্যসংস্থা জেলার বিভিন্ন জায়গায় ও বাইরে কলকাতাতেও নাট্যমঞ্চস্থ করে প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হয়। অগ্নীশিখার মঞ্চসফল অভিনেতারা হলেন— দেবাশীষ মজুমদার (শম্ভু), মনিশঙ্কর দাস, উত্তম সরকার (দুলু), শ্যামল নন্দী, চিরঞ্জীব দাস, বিক্রম দাস, জ্যোতির্ময় সরকার, কার্তিক মণ্ডল, গৌতমী সাউ, মিমো ধর, শ্রেয়া দেবনাথ প্রমুখ। এরা নানা

প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে অবস্থান করেও আজও নাট্যপ্রয়াস করে চলেছেন। যা জেলার নাট্যচর্চায় নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

ইসলামপুর মহকুমা শহরে লক্ষ করা যায়, টিকিট কেটে নাটক দেখার রেওয়াজ তখনও চালু হয়নি এবং সেই সঙ্গে মঞ্চের ভাড়া দিতে হত না। সংগৃহীত তথ্যের নিরিখে জানা যায় এখানে নাট্য রসিকেরা নিজেদের মধ্যে চাঁদা সংগ্রহ করে ভীষণ প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাদের অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও অফুরন্ত তৎপরতার মধ্য দিয়ে নাট্য-প্রয়াস করেই চলেছেন। তবে এ কথা বলার অবকাশ থাকে না যে, নাট্যমোদীগণ চাকরি বদলি করার সুবাদে সংস্থায় একটা অস্থিরতার বাতাবরণ থেকে যায়। মোটকথা, নাট্যরস পিপাসু নাট্যপ্রেমী শিল্পীরা অফিসের নিয়মাবলীর অনুশাসনে বদলি হয়ে গেলে নাট্যসংস্থা ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে। আবার পাশাপাশি দেখা যায়, নতুন আগন্তুকদের নিয়ে নাট্যসংস্থাগুলি পুনরায় সাবলীলভাবে নাট্যপ্রযোজনার প্রচেষ্টা শুরু করেন। তবে লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে, তাদের প্রেরণায় বর্তমানে এই মহকুমা শহরের তরুণদের মধ্যে নাট্যচর্চায় আগ্রহ ও সাড়া জেগে ওঠে। এই মহকুমা শহরের সূচনার ফলে যেহেতু এখানে নাট্য আন্দোলনের সূচনা হয়েছে। সেহেতু একথা বলা যায় যে, ইসলামপুর শহরের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নাট্য আন্দোলনও ক্রমশ বৃদ্ধিমুখর হয়ে উঠেছিল। এমনকি আধুনিক নাট্য আন্দোলনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ইসলামপুরে সদ্যগঠিত মফস্বল শহরের নাট্যচর্চা আরো বলিষ্ঠ ও উৎসাহী পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায়। তবে এই মহকুমা শহরে কোন স্থায়ী মঞ্চ না থাকার সুবাদে এখানকার নাট্যসংস্থাগুলি পৌরসভা নির্মিত নেতাজী সুভাষ মঞ্চ পাবলিক হলে নাটক মঞ্চস্থ করে থাকে। তবে সম্প্রতি নাট্যসংস্থার নাট্যব্যক্তিত্বদের সমবেত প্রচেষ্টায় একটি মুক্ত মঞ্চ গঠনের প্রয়াস চলছে।

উত্তরদিনাজপুর জেলার ইসলামপুর মহকুমার অধীনে অবস্থিত চোপড়া, গোয়ালপুকুর করণদিঘি ও চাকুলিয়া প্রথম থেকেই গ্রাম নির্ভর থানা শহর হলেও ইসলামপুর মহকুমা শহরের নাট্যচর্চা তথা নাট্যভিনয়ের প্রবল উৎসাহ ও তৎপরতার দ্বারা আন্দোলিত হয়ে এই থানাগুলিতেও ক্রমান্বয়ে নাট্যচর্চা শুরু হয় এবং তাদের নাট্য-প্রয়াস ইসলামপুরের নাট্যচর্চায় অভাবনীয় জায়গা করে নিয়েছিল।

যতদূর জানা যায়, সত্তরের দশক থেকে ইসলামপুর মহকুমার অন্তর্ভুক্ত চোপড়া থানায় কয়েকটি নিয়মিত ও অনিয়মিত নাট্যসংস্থার আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই নাট্যসংস্থাগুলির মধ্যে 'আঙ্গিক নাট্য গোষ্ঠী', 'চোপড়া রিক্রিয়েশন ক্লাব' ছিল অন্যতম ও উল্লেখযোগ্য। চোপড়া রিক্রিয়েশন ক্লাবের প্রযোজনায় ও সংস্থার অন্যতম সদস্য মদন মণ্ডলের পরিচালনায় 'অমল ও দইওয়ালা', 'মংলী আর দুধ দেবে না' ইত্যাদি নাটক দর্শক সমাদর লাভ করে এতদ্ অঞ্চলে বেশ সাড়া জাগিয়ে তোলে।

সেই সঙ্গে বলা যায় আঙ্গিক নাট্যগোষ্ঠী বর্তমানেও ক্রিয়াশীল। সম্প্রতি চোপড়া অঞ্চলে পাঁচালী নাট্যগোষ্ঠী গড়ে ওঠে বিশিষ্ট নাট্যকর্মী যোগেশ বর্মনের হাত ধরে। এই সংস্থা বিভিন্ন সামাজি সমস্যা, কুসংস্কার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে নাট্যপ্রয়াস করে চলেছেন।[৭০]

এরপর স্বাভাবিকভাবে ইসলামপুর মহকুমার অধীনে অবস্থিত করণদিঘি থানা। উত্তর দিনাজপুর জেলার নাট্যচর্চায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে অগ্রণীভূমিকা পালন করেছিল। এই থানার অন্যতম নাট্যসংস্থা 'অন্বেষা নাট্যনিকেতনে'র 'ইতিহাস কাঁদে' নাট্য-প্রযোজনা দর্শকমহলে প্রশংসা লাভ করে এবং যথেষ্ট সাড়া জাগিয়ে তুলেছিল। করণদিঘী থানার অধীনে একটি বিশেষ সংস্কৃতি মনস্ক স্থান হল ডালখোলা। সত্তরের দশকে বিশেষ করে ১৯৭১-৭২ খ্রিস্টাব্দের দিকে ডালখোলায় 'ছন্দম' নামে একটি নাট্যসংস্থা প্রথম নাট্যচর্চা শুরু করে। কিন্তু পরবর্তীকালে এই সংস্থা নানা প্রতিকূলতার কারণে বন্ধ হয়ে যায়। এরপর বর্তমানে এতদ্ অঞ্চলের হিমাদ্রী মুখার্জীর নেতৃত্বে তরুণ নাট্যশিল্পীদের উদ্যোগে 'অনিকেত নাট্যসংস্থা' গড়ে ওঠে। এবং তারা নিজের সাধ্যমত তৎপরতায় আজও নাট্যচর্চা করে চলেছে। ইসলামপুর মহকুমার অধীনে চাকুলিয়া থানায় সাম্প্রতিক আব্দুল হাই-এর নেতৃত্বে 'গোদা সিমুল মাইনোরিটি শিল্পীগোষ্ঠী' গড়ে উঠে। তার পরিচালনায় ও নির্দেশনায় বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে ও নারীপাচারের বিরুদ্ধে বেশ কিছু নাট্য-প্রযোজনা সাধ্যমতো প্রচেষ্টা করে চলেছে।

উত্তর দিনাজপুর জেলার নাট্যচর্চা যে সমগ্র উত্তরবঙ্গের নাট্যচর্চার সঙ্গে সমতলে অগ্রসর হয়ে চলেছে তা নিশ্চিত করে বলা যায়। এই জেলাটি নাট্যচর্চার প্রয়োজনে শুধু নাট্য-প্রযোজনাই নয়, মৌলিক নাটক রচনাতেও যথেষ্ট তৎপরতার পরিচয় দিয়েছেন এর কারণ স্বরূপ প্রাসঙ্গিকভাবেই উঠে আসে উত্তর নিদাজপুরের রায়গঞ্জ নিবাসী ডা: বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচীর নাট্যসৃজন তথা নাট্যপ্রয়াসের উল্লেখযোগ্য ভূমিকার কথা। স্বনামধন্য নাট্যকার ও বিশিষ্ট নাট্য পরিচালক হরিমাধব মুখোপাধ্যায় এ সম্বন্ধে এক মন্তব্যে জানিয়েছেন— ''রায়গঞ্জ নিবাসী ডা: বৃন্দাবন বাগচি'র নাট্যানুরাগের কথা সুবিদিত। অভিনেতা, পরিচালক ছাড়াও তিনি একজন নাট্যকার। সুখের কথা এই যে বৃন্দাবন বাবুর নাট্যসম্ভার পুস্তক আকারে মুদ্রিত। কল্পবিজ্ঞানের উপর তিনি কিছু ছোট নাটকও লিখেছেন। এই নাটকগুলি সুলিখিত, অভিনয়যোগ্য কিনা, তা পরীক্ষিত হয়নি, হলেও সে সংবাদ আমার গোচরে নেই। বৃন্দাবনবাবু পুরুষ চরিত্র বর্জিত মহিলাদের অভিনয় উপযোগী দু একটি নাটক লিখেছেন। বাঙ্গালী যৌথ পরিবারে মহিলাদের অবস্থান, সমস্যা এবং তার সমাধান এসব নাটকে স্বাভাবিক সারল্য ও স্পষ্টতায় ফুটে উঠেছে।''[৭১] হরিমাধব বাবু এই মন্তব্যের সূত্র ধরে এই বিষয়টি পরিষ্কার যে, মঞ্চাভিনয় এবং নাট্যরচনা এ দুটি দিক দিয়ে উত্তরদিনাজপুরের নাট্যপ্রয়াস ছিল অবশ্যই সক্রিয়,

প্রবহমান ও গতিশীল। নাট্যকার ডা: বৃন্দাবন বাগচির নাট্যসৃজন পর্বসহ তাঁর নাট্যপ্রয়াসের বিবরণ সুস্পষ্ট রূপে এখানে তুলে ধরা হল। এ কথা বলার অবকাশ রাখে না যে, ডা: বাগচি একদিকে যেমন প্রতিষ্ঠিত অভিনেতা ঠিক তেমনিভাবে অন্যদিক দিয়ে স্বমহিমায় প্রখ্যাত নাট্যকার। ডা: বাগচির প্রথম প্রকাশিত সামাজিক পূর্ণাঙ্গ নাটক 'এক ডোরে বাঁধা' ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে 'ঐক্যের সন্ধানে ভারত' নাট্য-প্রতিযোগিতায় বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ নাটক-রচনা হিসাবে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত হয়। তাঁর মুদ্রিত 'কাটা মুণ্ডরা কথা কয় ও একাঙ্ক নাটক গুচ্ছ' নাট্যসঙ্কল গ্রন্থ (প্রকাশকাল ১৬ জুলাই, ১৯৬৯ খ্রি:, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় প্রকাশিত) বিভিন্ন নাট্যমঞ্চে মঞ্চ সফল নাট্য-প্রযোজনার স্বীকৃতি লাভ করেছিল। ডা: বাগচি সর্বভারতীয় একাঙ্ক নাট্য-প্রতিযোগিতা' (১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ, পুনা, মুম্বাই) মঞ্চে 'সোনার সাহারা' একাঙ্ক নাটকটিতে নিজে অভিনয় করে বেশ সুনাম অর্জন করেন। এই নাটকটি ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে শ্রেষ্ঠ একাঙ্ক নাট্য-প্রযোজনার পুরস্কার লাভ করে। রায়গঞ্জের মাতৃমণ্ডলী তার রচিত পুরুষ ভূমিকা বর্জিত সামাজিক পূর্ণাঙ্গ নাটক দুটি যথা— 'অগ্নিকন্যা' ও 'জীবন থেকে নেওয়া' বেশ মঞ্চ সফলতার সঙ্গে মঞ্চস্থ করে। তবে এখানে উল্লেখ্য যে, এই দুটি নাট্য-প্রযোজনা রায়গঞ্জ, বালুরঘাট ও শিলিগুড়ি প্রভৃতি স্থানের নাট্যমঞ্চে বহুবার অভিনীত হয়েছে এবং এই নাট্য-প্রযোজনা দুটি দর্শক মহলে উচ্চ প্রশংসিত হয়। ডা: বাগচির লেখা ফ্যাসিবাদ বিরোধী 'মার্শাল পিকু' নাটকটি 'কলকাতা ইউনিভার্সিটি হল' মঞ্চে পি.এল.টির দ্বারা মঞ্চস্থ হয়। রায়গঞ্জের মাতৃমণ্ডলীর প্রযোজনায় তার লেখা স্ত্রী ভূমিকা বিশিষ্ট সামাজিক একাঙ্ক নাটক 'সোনার হরিণ' বহুবার মঞ্চস্থ হয় এবং দর্শকদের উচ্চ প্রশংসা লাভ করে। ডা: বাগচির অসামান্য নাট্যকৃতির পরিচয় বহন করে 'কবি দাদুর পতুলগুলি' নামের সামাজিক একাঙ্ক নাটকটি। এই নাটকটি ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে রায়গঞ্জের 'রোদবদল নাট্যসংস্থা'র উদ্যোগে সর্বপ্রথম মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকটি ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে রচনার সুবাদে ডা: বাগচি শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসেবে 'দিশারী' পুরস্কারে সম্মানিত হন। শুধু তাই নয় এই নাটকটি জলপাইগুড়ির রবীন্দ্রভবন মঞ্চ, শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চ সহ বিভিন্ন মঞ্চে সফল নাটকের খ্যাতি অর্জন করে। এমনকি কলকাতার অবন মহলের শিশুশিল্পীদের দ্বারাও এই নাটকটি মঞ্চাভিনীত হয়। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জুলাই তাঁর রচিত মৌলিক প্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শনবাহী 'আকাশ ভরা তারা' নামের ঐতিহাসিক পূর্ণাঙ্গ নাটকটি প্রকাশিত হয়। ভারত সরকার কর্তৃক এই নাটকটি রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়।

তবে প্রসঙ্গক্রমে এ কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় যে, ডা: বাগচি তাঁর নাট্যপ্রতিভাকে শুধুমাত্র মঞ্চ নাটক-রচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তাঁর নাট্যপ্রতিভাকে নাটকের সার্বিক অঙ্গনে যথোপযুক্তভাবে তুলে ধরে প্রতিষ্ঠা লাভের অবিরত ও নিষ্ঠা সহ অকুণ্ঠ প্রয়াস করে চলেছেন। তাঁর

অতুলনীয় নাট্য-প্রয়াসের স্বাক্ষর স্বরূপ পথ নাটক (পাণ্ডুলিপি আকারে) 'এক ডোরে বাঁধা' এবং শ্রুতি নাটক 'ঘাঁটের কথা' বহু প্রশংসিত হয়। ডা: বাগচির রচিত এই শ্রুতি নাটকটি ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে রায়গঞ্জ করোনেশন উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা এবং 'রাইনা'র উদ্যোগে 'রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট হলে'র নাট্যমঞ্চে অভিনীত হয় এবং দর্শকদের মুগ্ধ করে জেলায় বেশ সাড়া জাগিয়ে তোলে।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ১৫ই আগস্ট স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের ভারত বিভক্তকরণের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা লাভের পরিপ্রেক্ষিতে বিহার প্রদেশের অধীন পূর্ণিয়া জেলা ভারতভুক্ত হলেও বঙ্গদেশের অধীন দিনাজপুর জেলা দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল। এর ফলস্বরূপ অখণ্ড বা বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার উত্তর ও পূর্বাংশের দুই-তৃতীয়াংশ পূর্ব পাকিস্তানের (অধুনা বাংলাদেশ) ভাগে পড়েছে এবং পশ্চিমাংশের এক-তৃতীয়াংশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যভুক্ত হয়। দিনাজপুর জেলার ভারতভুক্ত অংশ নিয়ে গঠিত হয়েছিল পশ্চিম দিনাজপুর জেলা। অর্থাৎ এই সময়ে সাবেক দিনাজপুর জেলার ৩০টি থানার মধ্যে অবশিষ্ট ১০টি থানা ভারতভুক্ত হয়ে পশ্চিম দিনাজপুর জেলা নামে পরিচিত লাভ করে। মোটকথা, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই জলাই এই জেলার দুটি মহকুমা বালুর ঘাট ও রায়গঞ্জ নিয়ে পশ্চিম দিনাজপুর জেলা গড়ে ওঠে। পূর্বতন বালুরঘাট মহকুমার চারটি থানা— বালুর ঘাট, কুমারগঞ্জ, গঙ্গারামপুর ও তপন নিয়ে নতুন বালুরঘাট মহকুমা তৈরি হয়। এবং ভারতভুক্ত অংশের সঙ্গে বালুরঘাট মহকুমা থানার আরও দুটি ইউনিয়ন বোর্ড এলাকা যুক্ত করে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মে নতুন হিলি থানা গড়ে ওঠে এবং তা বালুরঘাট মহকুমার অধীনে অন্তভুক্ত হয়। আর সেই সঙ্গে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী পূর্ণিয়া জেলার চারটি থানা চোপড়া, ইসলামপুর, গোয়ালপুকুর ও করণদিঘি তার সঙ্গে যুক্ত বলে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার-আয়তন বর্ধিত হয়। আরও জানা যায় ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে ২০ মার্চ পূর্ণিয়া জেলা থেকে হস্তান্তরিত এই চারটি থানাকে রায়গঞ্জ মহকুমা থেকে বাদ দিয়ে নতুন ইসলামপুর মহকুমা গঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারি গোয়ালপুকুর থানার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ নিয়ে গঠিত হয় নতুন চাকুলিয়া থানা, যা ইসলামপুর মহকুমা-অধীনভূক্ত হয়। এইভাবে নানা ভাঙ্গাগড়া ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অর্ধ চন্দ্রাকৃতিরূপে পশ্চিম দিনাজপুর জেলা গঠিত হয়। এই পশ্চিমদিনাজপুর জেলার বর্তমান আয়তন ২,০৫২ বর্গমাইল। ১৭টি থানা এবং মহকুমা তিনটি। জেলা সদর বালুরঘাট শহরে অবস্থিত। এর উত্তর সীমায় রয়েছে মহানন্দা নদী এবং অপর প্রান্তে পূর্ব সীমায় হিলি শহর অবস্থিত। পূর্ব প্রান্তস্থিত হিলি থেকে জেলার উত্তর সীমার দূরত্ব ২৭০ কিলোমিটার। জেলা সদর বালুরঘাট জেলার একপ্রান্তে অবস্থিত থাকায় ইসলামপুর ও রায়গঞ্জে স্থানান্তরিত করার দাবি জানায়। পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন

মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় জেলা সদর রায়গঞ্জে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশাসনিক ভবন কর্ণজোড়ায় নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এই স্বানান্তরের বিরুদ্ধে বালুরঘাট বাসী প্রবল আন্দোলন মুখর হয়ে ওঠার ফলে সিদ্ধান্ত কার্যকর করা স্থগিত থাকে। শেষ পর্যন্ত ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের ১লা এপ্রিল দেখা যায় জেলা দিখণ্ডিত করে এই সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। এই বিভাজন ঘটে (U/S. Bengali District Act. 1836 [21 of 1836] read with the Bengal Distric Act. 1864 [Bengal Act.IV of 1864] and U/S. 7 (2) of cr.p.c.. 1973. (2 of 1974) আত্মপ্রকাশ করে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা (Notification Date and No. 28.02.1992 $^{177\text{-L.R.}}/_{6m\text{-}7/92}$ আটটি থানা (বালুরঘাট, হিলি, কুমারগঞ্জ, গঙ্গারামপুর, বংশীহারী, তপন, কুশমণ্ডি, হরিরামপুর) কে নিয়ে গঠিত হয় (U/S. Bengal District Act. 1836 [21 of 1836] read with the Bengal Distric Act. 1864 [Bengal Act.IV of 1864] and U/S. 7 (2) of cr.p.c.. 1973. (2 of 1974)। সংগৃহীত তথ্যের নিরিখে জানা যায় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা U/S. (2) of cr.p.c.. 1973. (2 of 1974) অনুযায়ী বালুরঘাট ও গঙ্গারামপুর দুটি মহকুমায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই জেলার আটটি থানার মধ্যে বালুরঘাট, হিলি, কুমারগঞ্জ ও তপন থানা নিয়ে বর্তমান বালুরঘাট মহকুমা গঠিত হয়। বালুরঘাট মহকুমার সদর হল বালুরঘাট। আর গঙ্গারামপুর মহকুমা Notification Date and No. 18;12.1996 তারিখে 475/PAR (AR)-1.1.1997, U/S. 7 (3) of cr.p.c.. 1973. (2 of 1974) অনুযায়ী গঙ্গারামপুর, বংশীহারী, হরিরামপুর ও কুশমণ্ডি থানা নিয়ে গড়ে ওঠে। গঙ্গারামপুর মহকুমার সদর হল বুনিয়াদপুর।[৭২]

স্বাধীনতা-উত্তর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত বালুরঘাট মহকুমার-নাট্যচর্চার শুরুতেই এই বিষয়টি প্রাসঙ্গিক তা হল, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরবর্তী সময় থেকেই বালুরঘাট সদর এবং সন্নিহিত জনপদ তথা অঞ্চলে যে নাট্যচর্চা সম্প্রতি চলমান, তা প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের নাট্যচর্চার আবহকে অনুসরণ করেই। সেই কারণে প্রাচীন ও নতুন নাট্যভাব-ধারায় সমৃদ্ধ পারম্পর্য নিয়ে অখণ্ড পশ্চিমদিনাজপুর জেলার অধীনভুক্ত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নাট্যচর্চা প্রবহমানতার ধারা বেয়ে এগিয়ে চলেছে— যার স্বতস্ফূর্ত মূর্তরূপ বালুরঘাট মহকুমার সদর শহর— বালুরঘাটকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা 'বালুরঘাট নাট্যমন্দির'। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে দক্ষিণ দিনাজপুর সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বিশেষ করে এই জেলার সদর শহর, বালুরঘাটের সমৃদ্ধ নাট্যচর্চার কারণে অন্যতম প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। ঐতিহাসিক মেহরাব আলী তাঁর 'দিনাজপুরে রঙ্গমঞ্চের এক শতাব্দী' গ্রন্থে এই বিষয়ে যথার্থ বলেছেন— ''দেশবিভাগ পর্যন্ত নাট্যমন্দিরই ছিল বালুরঘাট শহরের একমাত্র নাট্যশালা। বিভাগোত্তর দিনে সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে বালুরঘাটে আরো দু-তিনটি

নাট্যশালা নির্মিত হয়। ... বালুরঘাট নাট্যচর্চাও উন্নতমানের ও হৃদয়গ্রাহী।"[৭৩] এই জেলার নাট্যচর্চার অতীত ও বর্তমান মূলত: এই নাট্যমন্দিরকে ঘিরেই প্রবহমান। কলকাতা থেকে বহু দূরে উত্তরবঙ্গের এক মফস্বল শহর বালুরঘাটে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে 'বালুরঘাট নাট্যমন্দির' প্রতিষ্ঠিত হয়ে নাট্যচর্চার বীজ বপন করে নাট্যানুশীলনের যাত্রা শুরু করেছিল এবং ক্রমান্বয়ে বালুরঘাটের এই প্রাচীনতম নাট্যপ্রতিষ্ঠান 'বালুরঘাট নাট্যমন্দির'কে কেন্দ্র করেই নাট্য-প্রয়াস শুরু হয়। প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে সাংস্কৃতিক ও নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে এই বালুরঘাট নাট্যমন্দির উজ্জ্বল ও নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল ঠিক তেমনিভাবে স্বাধীনতা-উত্তরকালে বালুরঘাট নাট্যমন্দির রাজধানী কেন্দ্রিক নাট্যচর্চার পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের সীমান্ত ঘেষা ছোট মহকুমা শহর বালুরঘাটে নাট্যচর্চার যে উত্তরণ ঘটিয়েছিল— তা ছিল এ জেলাবাসীর পরমগর্বের বিষয়। এই প্রসঙ্গে জেলার তথা বাংলার বিশিষ্ট নট ও নাট্যকার হরিমাধব মুখোপাধ্যায় মূল্যবান মন্তব্য করে বলেছেন— ''রাজধানীর পরিমণ্ডলের বাইরে, মফঃস্বল বাংলার নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে এ জেলা ইতিমধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে নিয়েছে।"[৭৪] তাই এই জেলার নাট্যচর্চার প্রাণকেন্দ্র বালুরঘাট নাট্যমন্দির সুদূর অতীতকাল থেকে মফস্বল কেন্দ্রিক নাট্যচর্চার প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী নাট্য-প্রয়াসের সমুজ্জ্বল স্বর্ণ স্বাক্ষর নিয়ে বর্তমানেও নাট্যচর্চায় যথেষ্ট সক্রিও ও তৎপর এমনকি নাট্যমন্দিরকে ঘিরেই বালুরঘাট নাটকের শহর বলে পরিচিত লাভ করে। বাংলার অন্যতম বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব ও নাট্যকার শ্রদ্ধেয় ব্রাত্য বসু বলেছেন— ''বালুর ঘাটের থিয়েটার খুব ঐতিহ্যবাহী। দেশভাগের পরে বালুরঘাট ছোট একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে প্রধানত উত্তরবেঙ্গ এবং পরে দক্ষিণ বঙ্গেও বিশেষ আকর্ষণ কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এই সাংস্কৃতিক চর্চার মূল মরকত মনিটি ছিল অবশ্যই থিয়েটার। নানা ধরনের নাট্যচর্চার নিরীক্ষায় এবং প্রকাশে দক্ষিণ দিনাজপুরের এই শহর বরাবরই ভাস্বর।"[৭৫] বালুরঘাটের নাট্যচর্চার প্রধান কেন্দ্রস্থল তথা সূতিকারগার এই নাট্যমন্দিরকে ভিত্তি করে বালুরঘাট সদর শহরে ক্রমে ক্রমে অসংখ্য ছোট বড় নাট্যসংস্থা সৃষ্টি হয়েছে। যথা— ত্রিশূল, তরুণতীর্থ, কচিকলা এ্যাকাডেমী প্রাচ্যভারতী নাট্যনিকেতন, পূর্বাশা, পদাতিক, সংকেত, প্রগতি, দর্পণ, যাত্রিক, অভিযাত্রী, আত্রেয়ী, ত্রিতীর্থ, দিশারী, লোকয়ণ, তূনীর, নাট্যতীর্থ, রূপান্তর, বালুরঘাট নাট্যকর্মী, সমবেত নাট্যকর্মী, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, বিংশশতাব্দীর ক্লাব প্রভৃতি নাট্যসংস্থা নতুন নবদ্যুতি নিয়ে অতি যত্নসহকারে ও আন্তরিকভাবে নাট্য-প্রয়াসের মধ্য দিয়ে নাট্যভিযানে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করে প্রবহমান গতিধারাকে অব্যাহত রেখে আজও নাট্যচর্চার ঐতিহ্যময় পথে এগিয়ে চলেছে। অর্থাৎ এই সংস্থাগুলির নিরলসভাবে বহু সার্থক নাট্য-প্রযোজনা জেলাকে ছাপিয়ে বাংলার বুকে চির স্মরণীয় হয়ে উঠেছিল। এবং প্রাসঙ্গিক ভাবেই জেলার মহকুমা সদর শহরের দুর্গাপূজার সময় বিশেষ করে পালবাড়ি, চকভবানী, কালিবাড়ি, নদীপার সার্বজনীন

দুর্গাপূজোয় অস্থায়ী মঞ্চ বেধে নাট্যাভিনয় ও তার পাশাপাশি নাট্যমন্দিরে স্বতঃউৎসারিত সাবলীল নাট্যভিনয়ের অনাবিল স্রোত ধারায় বালুরঘাটের আকাশে, বাতাসে, মাটিতে ও জীবনের স্তরে স্তরে নাট্যচর্চার যে জোয়ারের ঢেউ উৎপন্ন হয়েছিল তা কিন্তু বালুরঘাটের দিগন্ত ছড়িয়ে বিভিন্ন থানা শহর যথা— হিলি, কুমারগঞ্জ, তপনের মতো ছোট গ্রামীণ থানা শহর ও গ্রামগঞ্জে পরিব্যাপ্ত হয়ে অবারিত ধারায় বয়ে চলেছে।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশভাগের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা লাভের ফলে ওপার বাংলার পূর্ব দিনাজপুরের ড্রামাটিক ক্লাবের বেশ কিছু যশস্বী অভিনেতা বিশেষ করে আমিয় সেন, নাট্যপরিচালক অভিনেতা শিবপ্রসাদ কর, তুলসী চন্দ, মনু দাশগুপ্ত, বিমল দাশগুপ্ত, মনি সেন প্রমুখ দিকপাল নাট্যব্যক্তিত্বরা সদর শহর বালুরঘাটে এসে 'নাট্য মন্দির'-এ যোগদান করেন। তাঁদের সাহচর্য ও সহযোগিতায় বালুরঘটা নাট্যমন্দিরে নাট্যচর্চার প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে ও নতুন যুগের সূচনা করে। এমনকি বলা যায় নাট্যমন্দিরের সুবর্ণযুগের শুরু হল। নাট্যমন্দিরের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সফল জনপ্রিয় নাট্যকার মন্মথ রায়ের 'কারাগার', 'খনা', 'দেবাসুর', 'মমতাময়ী হাসপাতাল', 'জীবনটাই নাটক', 'অমৃত অতীত' প্রভৃতি পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক পূর্ণাঙ্গ নাটকগুলি অমিয় সেনের সার্থক ও সুযোগ্য পরিচালনার মধ্য দিয়ে বালুরঘাট নাট্যমন্দির যৌবনের দীপ্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এই সময়ের উল্লেখযোগ্য ও মঞ্চসফল সু অভিনেতা হিসেবে যাঁরা অংশগ্রহণ করেন, তাঁরা হলেন নরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ মুখোপাধ্যায়, জীবু রায়, শিবু কর (শিবপ্রসাদ), বিমল দাশগুপ্ত, জিতেন সমাজদার, মনি সেনগুপ্ত, অমিয় সেন, শান্তি রঞ্জন গুহ, নগেন তরফদার, তুলসী চন্দ, সহদেব চৌধুরী, শান্তি চক্রবর্তী প্রমুখের নিজ নিজ ক্ষেত্রে সাবলীল অভিনয় করে দর্শক-সমাজকে মুগ্ধ করেছিলেন। তাদের সক্রিয় তৎপরতা ও সম্মিলিত নাট্য প্রয়াসের মধ্য দিয়ে নাট্যমন্দির পশ্চিম দিনাজপুর জেলার নাট্যচর্চার এক উজ্জ্বল তীর্থক্ষেত্র হয়ে ওঠে। ১৯৪৭-১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বালুরঘাট নাট্যচর্চার প্রধান কেন্দ্রস্থল নাট্যমন্দিরের মঞ্চে 'টিপুসুলতান', 'মীরকাশিম', 'কেদার রায়', 'সাজাহান', 'চক্রধর', 'বাংলার প্রতাপ', 'শতবর্ষ আগে', 'প্রফুল্ল', 'ষোড়শী', 'সংগ্রাম ও শান্তি', 'রাষ্ট্রবিপ্লব' প্রভৃতি ঐতিহাসিক সামাজিক ও রাজনৈতিক পূর্ণাঙ্গ নাটকগুলি বেশ সফলতার সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়। এরপর ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের দিকে লক্ষ করা যায় অমিয় সেন সর্বপ্রথম নতুন আঙ্গিকে 'কালিন্দী', 'দুই পুরুষ' প্রভৃতি সামাজিক পূর্ণাঙ্গ নাটক পরিচালনা করে বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের নাট্যায়নে আধুনিকতার প্রবর্তন করেন। মোটকথা অমিয় সেন ছিলেন সেই সময়ের শ্রেষ্ঠ পরিচালক এবং অভিনয় সহ থিয়েটার সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা তাঁর কাজকর্মে ফুটিয়ে তুলে নাট্যমন্দিরকে

সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। তবে পঞ্চাশের দশকে বিশেষ করে 'কালিন্দী' নাট্য প্রযোজনাটি বালুরঘাট নাট্যমন্দিরকে নাট্যায়নের উজ্জ্বল আসনে অধিষ্ঠিত করে স্বর্ণ শিখরে পৌঁছে দিয়েছিল। এই 'কালিন্দী' নাটকে রামেশ্বরের ভূমিকায় শিবপ্রসাদ কর অসাধারণ দক্ষ ও সুনিপুণ অভিনয়ের সুবাদে স্মরণীয় অভিনেতা হিসেবে দর্শক মহলে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। মোটকথা এই 'কালিন্দী' নাটকে শিবপ্রসাদের সেই অভিনয়, সেই চলা, সেই চোখ, সেই দৃষ্টি দেখে দর্শকদের কাছে বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের মঞ্চে 'কালিন্দী' নাটক ভুলে যাওয়া অসম্ভব। এছাড়াও ছানা গুহ, ফনী মুখোপাধ্যায়, ভনা খাঁ, জীতেন সমাজদার, সদু তরফদার এই নাটকে যথেষ্ট প্রশংসনীয় অভিনয় করে জনসমাদর লাভ করেন। এই সময়ে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে, পুরুষ অভিনেতারাই তখন মহিলা চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করতেন। কিন্তু কোন অভিনেত্রী ছিল না। দেখা যায়, দু-চার রাত্রির বেশী কোন নাটকের অভিনয় তখন হত না। টিকিটের দাম অতি সামান্য হলেও কম বিক্রি হত। এমনকি আমন্ত্রিত দর্শকবৃন্দেরাই প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ করতেন। তারপর স্বাভাবিকভাবে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে তারাশঙ্করের এই 'কালিন্দী' নাটক প্রযোজনায় এক বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটল বালুরঘাটের নাট্যচর্চার জগতে— তা হলো সর্বপ্রথম অভিনেত্রী হিসেবে মহিলা শিল্পীরা মঞ্চে প্রথম প্রকাশে অভিনয় করেন। ছোট মহকুমা শহর বালুরঘাটে মফস্বলকেন্দ্রিক নাট্যচর্চায় এক যুগান্তকারী ঘটনা, যা তুমুল আলোড়ন ও উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলেছিল। এই পর্বের পথিকৃত স্বরূপ মহিলা অভিনেত্রীরা হলেন— গীতা চৌধুরী শুকু চ্যাটার্জী ও রুবি শিকদার প্রমুখ। এঁরা প্রথম অগ্রবর্তিনী হয়ে এক নতুন সম্ভাবনার সূচনা করেন বালুরঘাটের নাট্যচর্চায়। এঁদের সাহস ও প্রগতিশীল মানসিকতা নাট্যপ্রেমীদের কাছে অবশ্যই শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন লাভ করেছিল।

বালুরঘাট নাট্য মন্দির ষাটের দশক থেকেই আধুনিক নাট্য প্রযোজনা অভিমুখে ধাবিত হয়। তখন নাটকের অভিনয় করা, নাটক মনোনয়ন করা এবং সর্বোপরি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া বিষয়ে নতুনত্ব দেখা দেয়। পাঁচের দশকের শেষপর্ব থেকে ছয়ের দশক পর্যন্ত নাট্যমঞ্চে ধীরে ধীরে বিদ্যুৎ ও তার মাধ্যমে আলোকসম্পাত ঘটিয়ে আধুনিকতা সূচিত হয়। এই বিদ্যুতের আলোর দ্বারা বালুরঘাটের নাট্যালয়ের গুণগত পরিবর্তন সাধিত হতে দেখা যায়। এই সময় বিদ্যুতের আলো ব্যবহার করে সুইচ এর সাহায্যে ইচ্ছামতো আলো-আঁধার সৃষ্টি করে দৃশ্যাদি দেখানো শুরু হয়। পূর্বের চেয়ে কম পরিশ্রমের বিনিময়ে শুধুমাত্র একটু চেষ্টা করে মঞ্চে নদী, বন, সমুদ্র, পাহাড় বৃহৎ অট্টালিকা, Drawing room, বাগান, ঝড়, বিদ্যুৎ এক মুহূর্তে সবকিছু দেখানো সম্ভব হয়ে উঠেছিল। এর ফলে লক্ষণীয় বিষয় হল এইরকম নতুন পরিবেশে সকলেই নতুন উৎসাহ ও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নাট্যাভিনয় শুরু করলেন এবং কলকাতার সঙ্গে বালুরঘাটের তুলনা করার সাহস

দেখিয়েছিল। বালুরঘাটে সুযোগ্য নাট্যমন্দিরের নাট্যপ্রযোজনা গুলি হল— 'সেমসাইড', 'বৃষ্টি বৃষ্টি', 'এরা কারা', 'সেই মেয়ে' প্রভৃতি। ১৯৬০-১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নাট্যমন্দিরের উল্লেখযোগ্য আধুনিক নাট্যপ্রযোজনাগুলি হল— 'ক্ষুধা', 'উল্কা', 'ফেরারী', 'ফৌজ', 'বরযাত্রী', 'মানময়ী গালর্স স্কুল', 'চক্‌মকি', 'সূর্যতোরণ', 'এক পেয়ালা কফি', 'মেঘ মুক্তি', 'তাইতো', 'বিশ বছর আগে', শতবর্ষ পরে প্রভৃতি। এই নাট্য-প্রযোজনাগুলির সঙ্গে পুরনো দিনের নাট্য-প্রযোজনাগুলি যথা— 'পি.ডব্লিউ ডি.', 'খনা', 'দেবলাদেবী কেদার রায়', 'টিপু সুলতান' প্রভৃতিও মঞ্চস্থ হতে থাকে। এই সময়ে বেশ কিছু তরুণ নাট্যকর্মী সর্বশ্রী অমিতাভ সেনগুপ্ত (দুলু সেন), সনৎ সেন, সত্য তালুকদার, অবিনাশ দত্ত, প্রভাস সমাজদার, রেনুকা রায় প্রমুখরা পুরাতন নাট্যকর্মী শান্তিরঞ্জন গুহ, বিশু ঘোষ, ও অন্যান্যদের সঙ্গে যোগ দান করলে নানা বয়সের সক্ষম অভিনেতা সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নাট্যমন্দির শক্তিশালী ও মজবুত হয়ে ওঠে। নাট্যমন্দিরের মঞ্চ ব্যবস্থায় এই সময় থেকেই মঞ্চ পরিকল্পনা, বিদ্যুতের আলোক সম্পাত এবং সেই সঙ্গে সাজসজ্জা-রূপসজ্জার ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। অভিনেতা-পরিচালক বিনয়ভূষণ পাল (নালু) ছিলেন বিখ্যাত রূপসজ্জাকার ও মঞ্চপরিকল্পক এবং পরবর্তীকালে কালী হোড় মঞ্চের বিভিন্ন রকম দৃশ্য অঙ্কনে পারদর্শী ছিলেন। নাট্যমন্দিরের সফল প্রযোজনা উৎপল দত্তের 'ফেরারী ফৌজ' (১৯৬২খ্রি:), নাটকে দক্ষনাট্যশিল্পী শান্তিররঞ্জন গুহ এবং সনৎ সেন মহাশয়ের অভিনয় দক্ষতা এমন প্রশংসনীয় হয়েছিল যে মালদহ ড্রামাটিক ক্লাবের পরিচালনায় যখন বেনারসে উক্ত নাটকটি অভিনয়ের জন্য আমন্ত্রিত হয়, তখন তাঁরা নাট্যমন্দিরের দুই নাট্যশিল্পীকে স্ব-স্ব ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য সসম্মানে বেনারসে নিয়ে যান। এবং এই নাট্য-প্রযোজনাটিতে উত্তরবঙ্গের শ্রেষ্ঠ আলোক শিল্পী পুরুষোত্তম সোমানীর আলোক সম্পাত ছিল অভূতপূর্ব সংযোজন। অর্থাৎ আলোক সম্পাতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন পুরুষোত্তম সোমানী। এই নাটকটির চরিত্র ভূমিকায় শান্তিরঞ্জন গুহ ও সনৎ সেন ছাড়াও অমিতাভ সেন, নিরঞ্জন বিশ্বাস ও ড. বিশু ঘোষের অভিনয় দাগ কাটার মতো এবং নারী চরিত্রে শান্তি চ্যাটার্জী, রেনু রায় অনবদ্য— অভিনয় করেন। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে নাট্যমন্দিরের প্রযোজনা 'ছায়া নায়িকা' দুই রাত্রি হাউসফুল এর মর্যাদা লাভ করে দুই টাকা এবং এক টাকা প্রদর্শন দক্ষিণার বিনিময়ে আমন্ত্রিত অভিনয়ের ক্ষেত্রে এখন যাকে Call show বলা হয় তখন তার প্রচলন ছিল না। যতদূর জানা যায়, 'কঙ্কাবতীর ঘাট' নাট্য-প্রযোজনার সময় বালুরঘাট নাট্যমন্দির মহেন্দ্র গুপ্ত এবং মাধবী চট্টোপাধ্যায়কে (পরবর্তীকালে চলচ্চিত্রাভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায়) দুই রাত্রির জন্য যথাক্রমে ২০০ টাকা এবং ৫০ টাকা পারশ্রমিক দানের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে বালুরঘাটে নিয়ে এসেছিলেন। 'বরযাত্রী' নাটকে দেখা যায় প্রণব মুখোপাধ্যায়ের 'গণশা'র ভূমিকায় অভিনয় কিংবদন্তী হয়ে আছে। পরবর্তীকালে 'কাবুলিওয়ালা'

নাটকে রহমত চরিত্রের ভূমিকায় কিংবা 'গণদেবতা'তে দেবুর ভূমিকায় প্রণব মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় বালুরঘাটে অভিনয়জগতে এখনও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। শান্তিরঞ্জন গুহ, কানাই দত্ত, সত্যরঞ্জন (গোবিন্দ) তালুকদার, অমূল্য দাম, সুধীর দে প্রমুখ অভিনেতারা অসামান্য নিপুনতায় নারীচরিত্রে অভিনয় করে অসাধারণ নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখে গেছেন এবং মহিলা শিল্পীদের মধ্যে প্রথিতযশা ছিলেন সুকু চ্যাটার্জী। নাট্যমন্দিরের পুরুষ চরিত্রের অভিনয়ে অসামান্য চরিত্রাভিনেতা ছিলেন দেবল রায়, নিমু রায়, সুধীর দে প্রমুখ। এছাড়াও সেই সময়ের নাট্যমন্দিরের একজন নিয়মিত মহিলা চরিত্রাভিনেত্রী ছিলেন অবিনাশ দত্ত।

১৯৬৫-১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অনেক প্রতিভাবান শিল্পী নাট্যমন্দিরে সদস্যপদ গ্রহণ করেন। এদের মধ্যে বিশেষ করে অভিনয়ে উল্লেখযোগ্য নাট্যশিল্পী হলেন— নারু মিত্র, অরূপ ভট্টাচার্য, সুধীর দেব, বিশ্বনাথ চৌধুরী, ক্ষিতি গোস্বামী, গিরিশ সাহা, মানিক লাহিড়ী, মধু সাহা, প্রণব চক্রবর্তী (ঝান্টু), দীপক রক্ষিত, গৌরশঙ্কর অধিকারী, কমল সরকার, সরোজ সাহা, চিত্ত মোহন্ত, অনিলবরণ মুখার্জী, দেবরঞ্জন ভট্টাচার্য, মরণ সাহা, পরিতোষ দাম, অচিন্ত্য গোস্বামী, হরিমাধব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের শেষার্ধে হরিমাধব মুখোপাধ্যায় চাকুরিসূত্রে বালুরঘাটে এসে নাট্যমন্দিরের সঙ্গে যুক্ত হন। এই প্রসঙ্গে তিনি স্বগতোক্তি করে বলেছিলেন— ''বালুরঘাটে স্থিত হবার পর মূলত প্রভাস সমাজদারের অনুরোধে আমি নাট্যমন্দিরের সাধারণ সভ্য হই। অমিয় সেন তখন বালুর ঘাট ছেড়ে গেছেন। নাট্যমন্দিরের প্রবীন অভিনেতার কেউই পরিচালনার দায়িত্ব নিতে রাজি নন। সম্ভবত এই কারণেই নাট্যমন্দিরে আমার অন্তর্ভুক্তি।'' শৈশব থেকেই তাঁর মধ্যে থিয়েটারের প্রতি গভীর টান জমে ছিল। বলতে গেলে পারিবারিক সূত্রে থিয়েটার তথা নাট্যচর্চায় অনুপ্রাণিত হয়ে নাট্য-সংস্কৃতির মধ্যে বড় হয়ে ওঠেন। মোটকথা মুখোপাধ্যায় পরিবারে সংস্কৃতির ছোঁয়া বেশ পূর্ব থেকেই বিরাজ করছিল। তাঁর বাবা নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় সুগায়ক হিসেবে নাট্যমন্দিরের সঙ্গে বহুদিন যুক্ত ছিলেন। নাট্যমন্দিরের যুক্ত হয়ে হরিমাধবের পরিচালনায় প্রথম নাট্য-প্রযোজনা হল 'অমৃতস্য পুত্রাঃ'। এরপর মধুপর্ণী পত্রিকা কর্তৃক আয়োজিত দিনাজপুরের তথা বাংলার প্রথিতযশা নাট্যকার মন্মথ রায়ের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সম্মিলিত নাট্যশিল্পীদের নিয়ে নাট্যমন্দিরে হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের সার্থক নাট্যপ্রযোজনা 'মমতাময়ী হাসপাতাল'। এই বিষয়ে হরিমাধব মুখোপাধ্যায় বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের নাট্যোৎসব ২০১৬-র স্মরণিকায় 'মিদুর রোমন্থন' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন— ''কলকাতায় থাকাকালীন প্রচুর নাটক দেখতাম, শিখতাম, পড়তাম-সেটা ছিল নিজেকে তৈরি করে নেবার সময়, হয়ত সেই সুবাদেই আমি নাট্যমন্দিরের হয়ে কয়েকটি কাজ করি। 'অমৃতস্য পুত্রাঃ',

‘লৌহ প্রাচীর’, অমৃত অতীত’, ‘চার প্রহর’, ‘ছায়া নায়িকা’।” তবে মতাদর্শগত কারণে হরিমাধব মুখোপাধ্যায় অবশ্য বৎসর দুয়েকের মধ্যে বালুরঘাট নাট্যমন্দির ছেড়ে দেন। এই নাট্যমন্দির ছেড়ে দেওয়ার প্রসঙ্গে হরিমাধব মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন— ‘‘নাট্যমন্দিরে আমার নিযুক্তির অন্যতম প্রধান শর্ত ছিল কলাকুশলী আমার পছন্দ অনুযায়ী নির্বাচিত হবে এবং নাটক হবার সময় কোন প্রম্পটিং থাকবে না। কিছুকাল পরে আমি বুঝলাম কর্তৃপক্ষের সম্ভবত এসব মনঃপূত হচ্ছে না। সময়টা সম্ভবত ১৯৬৮। জানিনা কোন কারণে কি জন্য নাট্যমন্দিরে রাজনীতির অনুপ্রবেশ হল। এই হস্তক্ষেপে আহত বিব্রত আমি নাট্যমন্দিরের সাথে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলি।”[৭৬] সাময়িক বিপর্যয়ের পর বালুরঘাট নাট্যমন্দির আবার নবোদ্যমে নাট্যচর্চায় ব্রতী হয়।

১৯৭০-১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের উল্লেখযোগ্য ও সকল নাট্য-প্রযোজনা: ‘ফেরা’, ‘ছেঁড়াতার’, ‘ঝুমুর’, ‘গণদেবতা’, ‘লালন ফকির’, ‘সাজানো বাগান’, ‘সেমসাইড’, ‘লৌহকপাট’, ‘পথের দাবী’, ‘দানসাগর’, ‘জুলিয়াস ফুচিক’, ‘মারীচ সংবাদ’ প্রভৃতি। রতন ঘোষের ‘ফেরা’ নাটকে নাট্যমন্দিরের সুঅভিনেত্রী শ্রীমতি রেবা বন্দ্যোপাধ্যায় পাটনায় সর্বভারতীয় নাট্য-প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সম্মান লাভ করেন এবং ‘লক্ষ্ণৌ বেঙ্গলী ক্লাব’ আয়োজিত সর্বভারতীয় নাট-প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কারে অলঙ্কৃত হন।

১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে হরিমাধব মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু তালুকদার নানা বিষয়ে মর্তানৈক্যের ফলে বালুরঘাট নাট্যমন্দির থেকে বেরিয়ে এসে তাঁদের যৌথ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে ২৬শে আগস্ট ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে ‘ত্রিতীর্থ’, নাট্যসংস্থা গড়ে তোলেন। মূলত: হরিমাধব মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু তালুকদারের প্রস্তাব ক্রমে ‘ত্রিশূল’ ও তরুণতীর্থ’ নামে দুটি প্রতিষ্ঠিত নাট্যদল আধুনিক নাট্য-প্রযোজনা করার উদ্দেশ্যে বালুরঘাটে নাট্যমন্দির ছেড়ে বেশ কয়েকজন অভিনেতা মিলিত হয়ে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে আগস্ট প্রভাস সমাজদারের বাড়িতে ‘ত্রিতীর্থ’ নাট্যসংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নাট্যসংস্থার জন্মলগ্ন থেকেই বেশ কিছু বিশিষ্ট নাট্যশিল্পী ও নাট্যকর্মী বালুরঘাট নাট্যমন্দির ত্যাগ করে ত্রিতীর্থের সঙ্গে যুক্ত হন—শান্তিরঞ্জন গুহ, প্রভাস সমাজদার, সুধীর দে প্রমুখ নাট্যশিল্পী এবং মানস সেন, মানিক দাশগুপ্ত, অর্ধেন্দু সরকার, সুধন ভট্টাচার্য প্রমুখ নাট্যকর্মী। তবে অমিতাভ সেনগুপ্ত, সত্যরঞ্জন তালুকদার, অবিনাশ দত্ত, কানাই দত্ত, বাকু চট্টোপাধ্যায়, বিশু ঘোষ প্রমুখ নাট্যশিল্পীরা সকলের আগেই নাট্যমন্দির ছেড়ে এই নাট্যসংস্থার জন্য কাজ শুরু করেন। এর ফলে লক্ষ করা যায় এই সব নাট্যকর্মী এবং প্রতিভাবান নাট্যশিল্পীর অভাবজনিত কারণে নাট্যমন্দির সাময়িক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল। তবুও ঐতিহ্যবান নাট্যকেন্দ্র বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের তখনও বেশ কিছু প্রতিভাবান নাট্যশিল্পী ছিলেন। বিশিষ্ট অভিনেতা নাড়ু মিত্র ‘ছেঁড়া তার’ নাট্য-প্রযোজনাটিতে

রহিমুদ্দিনের ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। এছাড়াও দেবল রায়, নিমু রায়, প্রণব মুখোপাধ্যায়, গিরিশ সাহা, বেণুকা রায়, রেবা ব্যানার্জী প্রমুখ নাট্যশিল্পীরা অসামান্য প্রতিভার দ্বারা নতুন উদ্যমে নাট্যচর্চায় ব্রতী হয়ে নাট্যমন্দিরের পূর্বতন ঐতিহ্যকে ধরে রাখবার আপ্রাণ প্রয়াস চালিয়ে যান। 'ঝুমুর' নাট্য-প্রযোজনার মধ্য দিয়ে নাট্যমন্দির পুনরায়, তার হৃতগৌরব অনেকটাই উদ্ধার করে। গিরিশ সাহার পরিচালনায় নাট্যমন্দির তখন বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় নাট্যপ্রযোজনা করে। এই সময় ত্রিতীর্থের প্রাক্তন অভিনেতা সাধন মজুমদার এবং প্রভাষ সমাজদার আবার নাট্যমন্দিরে যোগদান করেন। সাধনবাবুর অভিনয় ধন্য 'গুলশন' তখন নাট্যমন্দিরের একটি উল্লেখযোগ্য ও উৎকৃষ্ট নাট্যপ্রযোজনা।

বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের কোন কোন নাটক নির্বাচনে, প্রযোজনায় বা কখনো মঞ্চায়নে কলকাতার অনুকরণ দ্বারা স্বতন্ত্র কোন চিন্তা দেখা যায়নি। কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে এই নাট্যসংস্থার— আগ্রহ, প্রেরণা, আকাঙ্ক্ষা জাগাতে অবদানও ছিল যথেষ্ট। পূর্ণাঙ্গ নাটকের সফল প্রযোজনার ক্ষেত্রে বালুরঘাট নাট্যমন্দির এক অনন্য নজির গড়েছিল। লক্ষ্ণৌ, পাটনা সহ দেশের বিভিন্ন শহরে বাংলা পূর্ণাঙ্গ নাটক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে এই নাট্যসংস্থা অভিনয়, প্রয়োগ ও উপস্থাপনার ক্ষেত্রে বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিল। নাট্যমন্দির প্রথম বাংলার বাইরে সর্বভারতীয় স্তরে বালুরঘাটের নাট্যচর্চার পরিচয় তুলে ধরে বহুল প্রশংসিত হয়ে ওঠে। অধ্যাপক অচিন্ত্যকৃষ্ণ গোস্বামী নাট্যমন্দিরের সম্পাদকের দায়িত্বে থাকাকালীন সময়সীমায় বিশে করে— ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে দিকে লক্ষ করা যায় বালুরঘাট নাট্যমন্দির প্রথম বাংলার বাইরে পাটনা শহরে সারা ভারত পূর্ণাঙ্গ বাংলা নাটক প্রতিযোগিতায় তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়াতার' নাটক প্রযোজনা করে সর্বভারতীয় স্তরের এই প্রতিযোগিতার সব কয়টি পুরস্কার অর্জন করে। এখানে উল্লেখ্য যে, 'পাটনা শিল্পী সমিতি' আয়োজিত 'পূর্ণাঙ্গ বাংলা নাটক প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করে বালুরঘাট নাট্যমন্দির অসাধারণ প্রশংসিত পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়ে শ্রেষ্ঠদল— বালুরঘাট নাট্যমন্দির, শ্রেষ্ঠ পরিচালক শ্রীবিমল দাশগুপ্ত, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা শ্রীঅমলেশ মিত্র (রহিমুদ্দিন চরিত্রে), শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী শ্রীমতি কণা সরকার (ফুলজান চরিত্রে)।[৭৭] এরপর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্ণৌ বাংলা নাটক প্রতিযোগিতায় 'ফেরা' নাটকের প্রযোজনা করে শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসাবে সনৎ সেন পুরস্কৃত হন। শ্রেষ্ঠ চরিত্র-অভিনেতা হিসাবে প্রণব মুখোপাধ্যায় ও শ্রেষ্ঠ চরিত্র-অভিনেত্রী হিসেবে রেবা বন্দ্যোপাধ্যায় পুরস্কৃত হন।

এই সংস্থা একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে যেখানে অংশগ্রহণ করেছে যেখান থেকেই রাশি রাশি পুরস্কার লাভ করেছে। বালুরঘাট নাট্যমন্দির হাওড়ায় অনুষ্ঠিত 'সারা বাংলা একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় 'তাহার নামটি রঞ্জনা' এবং 'কালোমাটির কান্না' এই দুটি নাট্য-প্রযোজনা করে

শ্রেষ্ঠ পরিচালক ও শ্রেষ্ঠ চরিত্র-অভিনেতা হিসেবে সনৎ সেন সম্মানিত হন। চরিত্র-অভিনেতা হিসাবে তৃতীয় স্থান লাভ করেন প্রণব মুখোপাধ্যায়, চরিত্র-অভিনেত্রী হিসাবে প্রথম স্থান অধিকার করেন রেবা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবং শ্রেষ্ঠ শিশুশিল্পীর পুরস্কার পান মাস্টার সমর চট্টোপাধ্যায়। পাটনাতে আয়োজিত 'পূর্ণাঙ্গ বাংলা নাটক প্রতিযোগিতা'য় 'তীর্থযাত্রী' নাট্য-প্রযোজনাটিও পুরস্কার লাভ করে। আরও জানা যায় যে, 'ছেঁড়া তার' নাট্য-প্রযোজনাটি ১৯৬৯-১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে নাট্যমন্দিরে এক নতুন দিগদর্শন হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে উত্তরবঙ্গের গ্রামে-গঞ্জে, শিলিগুড়ি, পূর্ণিয়া, ইসলামপুর, তপন প্রভৃতি স্থানের অসংখ্য নাট্যমঞ্চে উক্ত নাট্য প্রযোজনাটি মঞ্চস্থ হতে শুরু করে এবং দর্শকমহলে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়ে তোলে। নাট্যমন্দির কলকাতার শিশির মঞ্চে 'কালাবদর' নাটকটি প্রযোজনা করে ভীষণ ভাবে প্রশংসিত হয় এবং সুঅভিনেত্রী রুমা নন্দী দিল্লী থেকে সি-সি-আই পুরস্কারে ভূষিত হন। পরিচালক পরিতোষ দাস বিশেষভাবে প্রশংসা লাভ করেন। সাজানো বাগান ও দান সাগর, নাটকে সুঅভিনয়ের জন্য সারা উত্তরবঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ তলাপাত্র অভিনেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। সেই সঙ্গে দেবল রায়, আশীষ রায়, অজয় সাহা, দেবব্রত চক্রবর্তী, সুখেন্দু চৌধুরী অন্তু দাস, অজিত মহন্ত প্রমুখ অভিনেতা-অভিনেত্রী যথেষ্ট সুনামের সঙ্গে অভিনয় করে প্রভূত প্রশংসা পান। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় সাধারণ নাট্যশালার শতবর্ষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তখন দেখা যায় যে, বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের কর্তৃপক্ষরা পিছিয়ে না থেকে এই বছরের ৭-ই ডিসেম্বর 'নীলদর্পণ' নাট্য-প্রযোজনা করে এই দিনটিকে গৌরবের সঙ্গে উদ্‌যাপন করেন ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা যুব উৎসবে শিশির মঞ্চে মোট ১১৭টি নাট্যদলের মধ্যে নাট্যমন্দিরের 'অগ্নিগর্ভ হেকেমপুর ও পরান মণ্ডলের ঘর-গেরাস্থি' একাঙ্ক নাট্য-প্রযোজনাটি চতুর্থ স্থান অধিকার করেছিল। ১৯৫৪ থেকে ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের শেষার্ধে পর্যন্ত যাঁদের অভিনয়ে নাট্য মন্দিরের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মহিলা নাট্যশিল্পী গীতা চৌধুরী, সুকৃতি চ্যাটার্জী, শান্তি চ্যাটার্জি রেণু রায়, শান্তি খাঁ, পুস্প সমাজদার, রেবা ব্যানার্জী, রুমা নন্দী, সন্ধ্যা কর্মকার, বরুণা সান্যাল, নমিতা মিত্র, মালবিকা খাঁ, সুলেখা দেব, সঞ্চিতা রায়, বাণী আচার্য্য, শতদল ঘোষ, অঞ্জলী দাস, কণা সরকার, পন্ত বিশ্বাস, বন্দনা গোস্বামী, ঝর্ণা চ্যাটার্জী, অঞ্জু দাস, ছন্দা সাহা, জোনাকী লাহিড়ী, মীরা মজুমদার ও রীণা কর্মকার প্রমুখরা দর্শক মনে প্রভূত সাড়া ফেলে সাফল্যের সঙ্গে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।

এই সংস্থা মাঝে কয়েকটি নিজস্ব নাটকের প্রযোজনা করে উজ্জ্বল ব্যতিক্রমী স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন— যা সমগ্র বাংলার নাট্যচর্চার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরবঙ্গের সীমান্ত ঘেষা প্রান্তিক মহকুমা শহরের মফস্বলকেন্দ্রিক নাট্যচর্চার এক অতুলনীয় ও নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত। বালুরঘাট নাট্যমন্দির সুভাষ মজুমদার রচিত 'উপসংহার' (একাঙ্কিকা) নাট্যমন্দিরে প্রখ্যাত নট ও নাট্যপরিচালক অমিয়

সেন রচিত 'আগামীকাল' নাটকের মঞ্চসফল ও সার্থক নাট্য-প্রযোজনা করে। নাট্যমন্দিরের সফল অভিনেতা অমলেশ মিত্রের (নাড়ু মিত্র) রচিত 'লালন ফকির' (১৯৭২খ্রি:) নাটকটি বেশ কয়েক রজনী মঞ্চস্থ হয় ও দর্শকদের প্রশংসা পায়। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে জরুরী অবস্থার সময় লক্ষ করা যায় যখন বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নজরুল ইসলামের লেখার উপর সেন্সার প্রয়োগ করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, তখন সারা দেশের মানুষ এই গণতন্ত্র হত্যাকারী জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদীকণ্ঠে গর্জ্জে উঠেছিলেন ঠিক সেই সময় নাট্যমন্দির তার দায়বদ্ধতার কথা মাথায় রেখে প্রতিবাদ স্বরূপ শরৎচন্দ্রের জন্ম শতবর্ষকে সামনে রেখে অমলেশ মিত্রের নাট্যরূপ দেওয়া 'পথের দাবী' নাটক মঞ্চস্থ করে ব্যাপক জনসমাদর লাভ করে। এরপর তাঁর রচিত পঞ্চায়েত ব্যবস্থার, দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের বিরুদ্ধে নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের গল্প অবলম্বনে নাট্যরূপ 'কেউ কথা রাখে না' নাটকটি বেশ সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়ে দর্শকদের বেশ মুগ্ধ করে তুলেছিল। এই নাটকগুলির প্রযোজনায় ও মঞ্চায়নেও নাট্যমন্দিরের অবদান যথেষ্ট ছিল।

বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের সম্পাদনার কাজে মানিক লাহিড়ী যখন সুস্থ ছিলেন তখন নাট্যমন্দিরের নাট্য-প্রযোজনা 'বাঘিনী' ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে 'দিশারী' পুরস্কার অর্জন করে। এই সময়ে শিলিগুড়ি ও মালদহে একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় নাট্যমন্দিরের একাঙ্ক নাটক প্রথম স্থান অধিকার করে। এছাড়া 'ঝুমুর' নাটকটি দর্শকের মনোরঞ্জনের সুবাদে নাট্যমন্দিরে সবচেয়ে বেশি রাত্রি অভিনীত হয়। এবং এই নাটকে চরিত্রাভিনেতা নিরঞ্জন বিশ্বাস এবং তুলসী চন্দের অভিনয় এখনও দর্শক হৃদয়ে বেশ স্মরণীয় হয়ে আছে। নাট্যমন্দিরে নিজস্ব উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনা করে ৪বার একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে জেলার নাট্যচর্চায় সাড়া ফেলে দিয়েছেন। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে (১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৮০ বঙ্গাব্দে) বালুরঘাট নাট্যমন্দির সগৌরবে হীরক জয়ন্তী উৎসব পালিত হয় এবং বৃহত্তর জিনাজপুর জেলার তথা বাংলার স্বনামধন্য নাট্যকার মন্মথ রায়েকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এই হীরক জয়ন্তী উৎসবের স্মরণীয় ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল নাট্যমন্দিরের প্রথম পর্বের (১৯৯০-১৯৪৭ খ্রি:) নাট্য-প্রযোজনা প্রচারে কাজ কিভাবে পরিচালিত হত, তার নিদর্শনের নমুনা দেখানো হয়। একটি বড় কাঠের মধ্যে নাটকের নাম, টিকিটের দাম, প্রদর্শনীর সময় প্রভৃতি খোদাই করা থাকত। তাতে কালি লাগিয়ে কাগজে ছাপ দিয়ে প্রচার করা হত। এই খোদাই-এর কাজ নলিনী খাঁ নামে এক ব্যক্তি করতেন। এই সময় বালুরঘাটে কোনো ছাপাখানা ছিল না। সেই সঙ্গে জানা যায় ৭দিন ধরে নাট্যমন্দিরে প্রযোজনায় নাটক মঞ্চস্থ হত। বালুরঘাট নাট্যমন্দির ৭৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে ৭ ডিসেম্বর থেকে তিনমাস ব্যাপী নাট্যোৎসব শুরু করে। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে ২৫ ডিসেম্বর নাট্যকার মন্মথ রায়ের প্রথম একাঙ্ক নাটক 'মুক্তির ডাক' (বাংলা নাটকের প্রথম একাঙ্ক)

নাট্যমন্দির মঞ্চে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে মঞ্চস্থ হয়। অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ আচার্যের তত্ত্বধানে ইসলাম পুর 'শিল্পীচক্র' সংস্থা এই নাটকটি প্রযোজনা করে। এরপর ড: কৃষ্ণলাল ভট্টাচার্য 'মুক্তির ডাক' নাটকের ষাট বছর উপলক্ষে বাংলা একাঙ্ক নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বিষয়কে কেন্দ্র করে এবং নাট্যকার মন্মথ রায়ের একাঙ্ক সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তব্য তুলে ধরেন। তিনি আলোচনার সুবাদে খুব প্রসঙ্গিক মন্তব্য করে জানান— ''বাংলা নাটক যখন এক বন্ধ্যা সময়ে উপস্থিত হয়েছে। আমাদের নাটকের বিষয়বস্তুতে পুনরাবৃত্তি বড় বেশি চোখে পড়ে। নাট্যকারগণ বিভ্রান্ত, দ্বন্দ্বক্ষত এবং দৃঢ়সংবদ্ধ নাট্যদর্শনের অভাবে দুর্বল।

বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের সংবিধান বেশ কয়েকবার পরিবর্তিত হতে দেখা যায়। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে বালুরঘাট নাট্যমন্দিরে সূচনালগ্নে লিখিত সংবিধানে ম্যানেজার স্টেজ ম্যানেজার, সহকারী স্টেজ ম্যানেজার, মোশন, মাস্টার বিজিনেস ম্যানেজার প্রভৃতি পদ লক্ষ করা যায়। আবার দেশ বিভাগের পর পরিবর্তিত সংবিধান অনুসারে শুধুমাত্র সম্পাদকের পদ নির্দিষ্ট করা হয়। এরপর ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে সত্য চক্রবর্তী মানবেন্দ্র চ্যাটার্জী, অচিন্ত্যকৃষ্ণ গোস্বামী ও অরুপ ভট্টাচার্যের সম্মিলিত প্রয়াসে নতুন সংবিধান তৈরি হয় এবং তাতে সংযোজন হয় সভাপতি, কার্যকরী সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক প্রশাসনিক সম্পাদক ও সাংস্কৃতিক সম্পাদকের পদ। নাট্যমন্দিরে সূচনাপর্ব থেকে বর্তমান ক্ষেত্র-সমীক্ষার সময়কাল পর্যন্ত (২০১৫ খ্রি:) নাট্যমন্দিরের কার্যকরী কমিটি: ২৪.০৬.২০১৫ (সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট) কার্যকরী সভাপতি— মিহির দাস, সহ-সাভাপতি— সন্তোষ সাহা, সহ-সভাপতি— বিজন দাস, সাধারণ সম্পাকদ— অজিত কুমার মহন্ত, প্রশাসনিক সম্পাদক— মানস চক্রবর্তী ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক— কাঞ্চন সাহা। নাট্যমন্দিরের আজ পর্যন্ত (১৯০৯-২০১৫ খ্রি:) সর্বমোট সদস্য সংখ্যা ৫৫১ জন। বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের নিজস্ব প্রযোজনায় এই মঞ্চে ১৯০৯-২০১৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শতাব্দীকালের মধ্যে ১৬৯ নাটকের মঞ্চাভিনয় হয়েছে।

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, পূর্ণাঙ্গ, একাঙ্ক ও অনুনাটকের নাট্য-প্রযোজনার পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করা হল—

২. সাবিত্রী

৩. পাণ্ডব গৌরব

৪. বলিদান

৫. রাণী দুর্গাবতী

৬. প্রহ্লাদ চরিত্র

৭. সাবিত্রী সত্যবান

৮. দেবলা দেবী
৯. দেবাসুর
১০. শক্তির মন্ত্র
১১. বরুণা
১২. সুদামা
১৩. পরপারে
১৪. দুর্গাদাস
১৫. কংসবধ
১৬. বঙ্গের রাঠোর
১৭. উলুপী
১৮. রঘুবীর
১৯. মহুয়া
২০. পুনর্জন্ম
২১. দেবাসুর
২২. দেবযানী
২৩. সর্পযজ্ঞ ও ঊষা
২৪. বঙ্গে মুসলমান
২৫. জননী
২৬. বিজয়া
২৭. প্রফুল্ল
২৮. ষোড়শী
২৯. শুভযাত্রা
৩০. চন্দ্রনাথ
৩১. শাজাহান
৩২. তোমারই
৩৩. রেশমী রুমাল
৩৪. মরা হাতী লাখ টাকা
৩৫. রাষ্ট্রবিপ্লব
৩৬. তাইতো
৩৭. চক্রধর
৩৮. মাটির ঘর
৩৯. খানিভিলা
৪০. মানময়ী গালর্স স্কুল
৪১. কেদার রায়
৪২. মেঘমুক্তি
৪৩. সূর্য মহল
৪৪. জীবনটাই নাটক
৪৫. বিশ বছর আগে
৪৬. মমতাময়ী হাসপাতাল
৪৭. গণশার বিয়ে
৪৮. খনা
৪৯. উল্‌কা
৫০. কালিন্দী
৫১. আগামীদিন
৫২. মন্ত্রশক্তি
৫৩. কারাগার
৫৪. রাত্রিশেষ
৫৫. ক্ষুধা
৫৬. পলীন
৫৭. ধৃতরাষ্ট্র
৫৮. সারথি শ্রীকৃষ্ণ
৫৯. রূপোলী চাঁদ
৬০. ক্ষুদিরাম
৬১. দুই পুরুষ
৬২. স্বামী স্ত্রী
৬৩. জন্মদিন
৬৪. বাংলার প্রতাপ
৬৫. থামাও রক্তপাত
৬৬. পতিব্রতা
৬৭. সিঁথির সিঁদুর
৬৮. কঙ্কাবতীর ঘাট
৬৯. দুই মহল
৭০. ভাড়াটে চাই
৭১. কর্ণার্জ্জুন
৭২. ডাউন ট্রেন
৭৩. কাঞ্চন রঙ্গ
৭৪. প্রতিধ্বনি
৭৫. চোর
৭৬. চোরাবালি
৭৭. ফেরারী ফৌজ
৭৮. মেবারপতন
৭৯. ক্যাম্প থ্রি
৮০. কালপুরুষ
৮১. ময়ূর মহল
৮২. চার প্রহর
৮৩. টিপুসুলতান
৮৪. নিশাচর
৮৫. দমকল
৮৬. অমৃতস্য পুত্রাঃ
৮৭. ঝর্ণা
৮৮. ছায়া নায়িকা
৮৯. মায়াযুগ
৯০. বিন্দুর ছেলে
৯১. শতবর্ষ আগে

৯২. লৌহ প্রাচীর
৯৩. মহানিশা
৯৪. পাঞ্চাব কেশরী
৯৫. অভিষেক
৯৬. বৌদির বিয়ে
৯৭. পথের দাবী
৯৮. দত্তা
৯৯. পি.ডাব্লু.ডি
১০০. তটিনীর বিচার
১০১. বঙ্গেবর্গী
১০২. মিশর কুমারী
১০৩. সম্রাট সমুদ্র গুপ্ত
১০৪. বাংলার বোমা
১০৫. উত্তরা
১০৬. বভ্রুবাহন
১০৭. মারাঠা মোগল
১০৮. সীতা
১০৯. অমৃত অতীত
১১০. বিশ পঞ্চাশ
১১১. চাঁদ সদাগর
১১২. ধর্ষিতা
১১৩. বিবাদ নিবারণী মহৌষধ
১১৪. ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ
১১৫. সোনার হরিণ
১১৬. সেম সাইড
১১৭. বৃষ্টি বৃষ্টি
১১৮. কালো মাটির কান্না
১১৯. লৌহকপাট
১২০. অন্যছায়া
১২১. ফেরা
১২২. এরা কারা
১২৩. সেই মেয়ে
১২৪. সমুদ্র সন্ধানে
১২৫. আবর্জনা
১২৬. সিগারেট পাকানোর কৌটা
১২৭. পাপপুণ্য
১২৮. গণদেবতা
১২৯. ভাবীকাল
১৩০. সাহিত্যিক
১৩১. যা তারা পারেনি
১৩২. আমার মাটি
১৩৩. ঈশ্বরবাবু আসছেন
১৩৪. শয়তান স্ত্রী
১৩৫. তাহার নামটি রঞ্জনা
১৩৬. ছেঁড়াতার
১৩৭. সকলের জন্য
১৩৮. ঝুমুর
১৩৯. নয়ন কবিরের পালা
১৪০. নীলদর্পণ
১৪১. অরুনোদয়ের পথে
১৪২. জুলিয়াস ফুচিক
১৪৩. দানসাগর
১৪৪. সাজানো বাগান
১৪৫. মারীচ সংবাদ
১৪৬. কালাবদর
১৪৭. প্রস্তুতি
১৪৮. ফাঁস
১৪৯. যৌবন
১৫০. সূর্যশিকার
১৫১. রাজদর্শন
১৫২. বাঘিনী
১৫৩. খেলওয়ালা
১৫৪. তীর্থযাত্রী
১৫৫. গুলশন
১৫৬. শাস্তি
১৫৭. অগ্নিগর্ভ হেকেমপুর ও পরাণ মণ্ডলের ঘর গেরাস্থি (একাঙ্ক নাটক)
১৫৮. দর্পণ সাক্ষী
১৫৯. প্রদোষে প্রভাত
১৬০. ভুভার হরণ কর্পোরেশন
১৬১. অমৃত অতীত
১৬২. কেউ কথা রাখে না
১৬৩. দায়বদ্ধ
১৬৪. হজম শক্তি
১৬৫. দুই চোরের গল্প
১৬৬. রিয়েলটি
১৬৭. ওয়াশিং মেশিন
১৬৮. ক্যাপ্টেন হুররা
১৬৯. একটি মাথা দুটি ছাতা (অনুনাটক)[৭৮]

বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের বয়সের ভারে জীর্ণ হয়ে পড়ায় সংস্কারের প্রয়োজন হয়ে পরে। প্রণব চক্রবর্তী সম্পাদক হয়ে জীর্ণ প্রেক্ষাগৃহ ও মঞ্চের আমূল সংস্কারের প্রচেষ্টায় মন দেন। সরকারি সাহায্যে ভগ্নপ্রায় নাট্যমন্দির নবতর কলেবর পায়। ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিম দিনাজপুরের অন্তর্ভুক্ত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মহকুমাশহর বালুরঘাটে অবস্থিত এই ঐতিহ্যপূর্ণ নাট্যসংস্থা বালুরঘাট নাট্যমন্দির শুধুমাত্র এই নাট্যসংস্থার নয়, বালুরঘাটের নাট্যজগতে, অসংখ্য স্বনামধন্য ও সুদক্ষ কুশীলবদের অভিনয় ধন্য এবং বহু বিশিষ্ট মানুষজনদের স্বতঃস্ফূর্ত, আন্তরিক, ঐকান্তিক ও প্রবল তৎপর প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে আলোক উজ্জ্বল শতবর্ষ পূর্ণ করেছে, যা সারাবাংলার নাট্যচর্চার প্রেক্ষাপটে এক ঐতিহ্যময় নজিরবিহীন ও যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত।

সমগ্র উত্তরবঙ্গ সহ বাংলার নাট্যচর্চায় বালুরঘাট আজ বাস্তবিক পক্ষে নাট্যতীর্থ। বালুরঘাটের এই মহিমান্বিত গৌরবের উৎসে বর্তমান 'বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের' ঐতিহ্যবাহী ধারাবাহিক নাট্যচর্চা। মোটকথা এই নাট্যমন্দিরই ছিল এ জেলার নাট্যচর্চার ধারক ও বাহক, যা পরবর্তীকালে দিগন্তব্যাপী বিস্তার লাভ করে সমগ্র পশ্চিমবাংলায় ছড়িয়ে পড়ে সর্বভারতীয় খ্যাতি লাভে সমর্থ হয়। এই নাট্যমন্দির পৌরাণিক, ঐতিহাসিক নাট্য-প্রযোজনার-গতানুগতিক ধারার পাশাপাশি কালের বিবর্তনের ধারা বেয়ে সামাজিক নাট্য-প্রযোজনার ধারা স্বীকার করে অগ্রসর হয়েছে। এর ফলে সামাজিক, রাজনৈতিক নাট্য-প্রযোজনাও নাট্যমন্দিরের নাট্যচর্চায় যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করে। তাই হরিরাজ, সারিত্র নাট্য-প্রযোজনা দিয়ে পথ চলা শুরু করে রিজিয়া, বঙ্গেবর্গী মেবার পতন, টিপু সুলতান' যেমন নাট্যমন্দিরের প্রযোজনায় মঞ্চায়িত হয়, তেমনি ছেঁড়া তার, গণদেবতা, নীলদর্পণ, টিনের তলোয়ার, জুলিয়াস ফুচিক, দানসাগর, কালাবদর, মারীচ সংবাদ, সাজানো বাগান প্রভৃতি নাটকও মঞ্চস্থ হয়েছে। মোটকথা ১৯৭০-১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নাট্যমন্দিরে বহু মঞ্চসফল নাট্য প্রযোজনার জোয়ার বালুরঘাটকে নাটকের শহরের খ্যাতিতে ভূষিত করে তুলেছিল। বিশেষ করে ছেঁড়াতার, ঝুমুর, সাজানো বাগান, দানসাগর ইত্যাদি নাটকের অভিনয় রজনী প্রায় শততমতে পৌঁছে গিয়েছিল। সামগ্রিক মূল্যায়নের প্রেক্ষাপটে এসব প্রযোজনার মধ্যে নাট্যমন্দিরের মঞ্চে অভিনীত ঝুমুর, ছেঁড়াতার, লালন ফকির ইত্যাদি নাটকের প্রযোজনার ক্ষেত্রে মঞ্চ ভাবনা, উপাস্থাপন রীতি ও আঙ্গিকগত প্রয়োগে নাট্যমন্দির স্বতন্ত্র পরিচয় দিয়ে উজ্জ্বল নজির সৃষ্টি করেছে এবং গুণগত বিচারে এ নাটকগুলো জেলার নাট্যচর্চায় স্বাতন্ত্র্য ও আভিজাত্যের পরিচয় বহন করেছে।এ জেলা নাট্যচর্চার পীঠস্থান নাট্যমন্দির প্রসঙ্গে সম্পাদক শ্রী প্রণব চক্রবর্তী যথার্থ মূল্যায়ন করে বলেছেন— ''এই নাট্যমন্দির হল 'জনক প্রতিষ্ঠান'। এর সঙ্গে যুক্ত অনেক অভিনেতা পরবর্তী যুগে নতুন নাটকের

দল তৈরি করেছেন। বর্তমানে বালুরঘাট মহকুমার মানুষ যে নাটক ভালোবাসেন, নাটক সম্পর্কে তাদের অপরিসীম আগ্রহ এবং রুচি-এর মূলে রয়েছে এই নাট্যমন্দিরের দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা। বালুরঘাটের নাট্যমন্দির কৃত অভিনয়ের মানও উন্নত। বাংলা এবং ভারতবর্ষের বহুস্থানের প্রতিযোগিতায় এরা সাফল্যের সঙ্গে পুরস্কার নিয়ে এসেছেন।"[৭৯]

বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের সুদীর্ঘ নাট্য-ইতিহাসে বহুবার দুর্যোগপূর্ণ কালো মেঘের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। অর্থাৎ ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে নাট্যমন্দিরে আবার ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখা যায়। যতদূর জানা যায় তৎকালীন নাট্যমন্দিরের সম্পাদক প্রণব চক্রবর্তীর নিয়ন্ত্রণে নাট্যমন্দির চলাকালীন অবস্থায় নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম অসুবিধা দেখা দেয় এবং বেশ কিছু তরুণ প্রতিভাবান অভিনেতাদের নিয়ে নাট্যমন্দির ছেড়ে দিয়ে নতুন নাট্যসংস্থা 'নাট্যতীর্থ' প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর আশির দশকের মধ্যে নাট্যমন্দির ঠিকমতো সক্রিয় ও তৎপর হয়ে উঠতে ব্যর্থ হয়। মোটকথা নাট্যমন্দির মাঝেমধ্যে পূর্বের পুরনো নাট্য-প্রযোজনাগুলি হঠাৎ করে মঞ্চায়িত করেছে, তাই এই বিগত আশির দশকটিতে নাট্যমন্দির নিয়মিতভাবে নাট্য-প্রযোজনা করে উঠতে পারেনি। এর ফলে নাট্য-প্রযোজনার পূর্ব ঐতিহ্য বরং শ্লথ হয়ে পড়ে। এমনকি নব্বই-দশকের শেষার্ধে নাট্যমন্দিরের নাট্যপ্রযোজনার ক্ষেত্রে সেইরূপ রিক্ত ও শূন্যতার বাতাবরণ বজায় থাকে। সাম্প্রতিককালেও বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের নাট্য-প্রযোজনাগুলি যথা— সৌমিত্র বসুর পরিচালনায় 'ওয়াশিংমেশিন' ও দীপক রক্ষিতের পরিচালনায় ও নির্দেশনায় 'ক্যাপটেন হুররা' রবীন্দ্রনাথের কাহিনী অবলম্বন ধীরু মুখোপাধ্যায়ের নাট্যরূপ 'শাস্তি', নীলিমা সাহার পরিচালনায় 'একটি মাথা দুটি ছাতা' (অনু নাটক) প্রভৃতি গতানুগতিক পদ্ধতিকে অনুসরণ করেই মঞ্চস্থ হয়েছে। তাই বালুরঘাট নাট্যমন্দির আজ কেবল অতীতের নাট্যঐতিহ্যের গৌরবজ্জ্বল সাক্ষী হয়ে প্রবহমান ধারার অভিমুখে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে চলেছে।

ষাটের দশকের গ্রুপথিয়েটারের প্রেরণায় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার-সদর মহকুমা শহর বালুরঘাটের মফস্বল কেন্দ্রিক নাট্যচর্চায় কিছু নাট্যদল গঠিত হতে দেখা যায়। মোট কথা ষাটের দশকের প্রথম পর্বেই বালুরঘাটে গ্রুপ থিয়েটারের প্রচলন হওয়ায় তরুণতীর্থ ত্রিশূল, প্রাচ্যললিতকলা একাডেমী, কচিকলা একাডেমী, বিংশশতাব্দীকাল, প্রাচ্যভারতী নাট্যনিকেতন, চিরন্তন প্রভৃতি নাট্যদল গড়ে ওঠে। এই নাট্যদলগুলি নিয়মিত বিরতির ফাঁকে ফাঁকে অস্থায়ী মঞ্চ বেঁধে নাট্যাভিনয় করতেন।

১৭৯৫-১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা নাটক ও নাট্যমঞ্চের দুশো বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে একটি বিষয় পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে তা হল ইতিহাস রচয়িতারা বিশেষ করে ছোট নাট্যদল, ছোট নাট্যমঞ্চের ইতিহাস নির্মমভাবে উপেক্ষা করেছেন— যা সত্যিক ারের নাট্য-ইতিহাস রচনার

পরিপন্থী। তবে এই সকল তথাকথিত ছোট ছোট নাট্যদলকে কেন্দ্র করে সম্ভাবনাময় অনেক নাট্যব্যক্তিত্ব লুকিয়ে থাকে যা উপযুক্ত সময় ও অনুকূল পরিবেশের স্পর্শে বজ্রসম শক্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়। স্বাধীনোত্তর পর্বে উত্তরবঙ্গের সীমান্ত ঘেষা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অধীনভুক্ত মহকুমা বালুরঘাটের ছোট্ট শহর এবং তার সন্নিহিত আশেপাশের এমন কয়েকটি গ্রুপ থিয়েটারের উল্লেখ করা যায়, যারা চিরকালের জন্যে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এই সব নাট্যদলের পরিচালক এবং অভিনেতাদের মধ্যে অনেকেই আছেন, যাঁদের পরিচালনা এবং অভিনয় প্রতিভার গুণে আজ বালুরঘাট মহকুমা তথা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গণ্ডী ছাপিয়ে, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ ছড়িয়ে পড়েছে। এই রকম একটি গ্রুপ থিয়েটার সংস্থা মূলতঃ হরিমাধব মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু (মনি) তালুকদারের সক্রিয় তৎপরতা ও নিরলস প্রয়াসে গড়ে ওঠে। মোটকথা হরিমাধব মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু তালুকদার এবং জীবনকানাই মুখোপাধ্যায় প্রমুখ তরুণ নাট্যপিপাসু যাঁরা গতানুগতিকতার বাইরে গিয়ে নাটক করতে চান। যতদূর জানা যায় ১৮৫৭-১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে এই তিন নাট্যপাগল তরুণ যুবক 'ত্রিমূর্তি' নামে পরবর্তীকালে শ্রী মনোরঞ্জন কর্মকার, ব্রজবল্লভ সাহা, দেবল রায়, মানস ঘোষ, বাবলু রায়, অন্তিম তরফদার, বীরেশ গোস্বামী, অমল সরকার, শিশির কর্মকার প্রমুখ নাট্যপ্রেমী অত্যুৎসাহী তরুণ যুবক মিলে 'তরুণতীর্থ' নামে একটি 'নাট্যসংস্থা' গড়ে তোলেন। হরিমাধব মুখোপাধ্যায় স্বগতোক্তিতে জানিয়েছেন— ''কৈশোর কাল থেকেই আমার স্থাপিত দল তরুণতীর্থের আমি স্বঘোষিত, স্বর্নিবাচিত পরিচালক ও অভিনেতা।'' এই নাট্য সংস্থার কোন স্থায়ী মঞ্চ ছিল না। পুজোর ছুটিতে বিশেষ করে এই নাট্যসংস্থার কর্ণধার হরিমাধব মুখোপাধ্যায় যখন বালুরঘাটের বাইরে পড়াশুনা করতেন সেই সময় পাড়ার তরুণ যুবকদের নিয়ে নিজেদের লেখা নাটক ও অন্যান্য নাট্যকারের লেখা নাটক এরা মঞ্চ সফলের সঙ্গে অভিনয় করতেন। এই প্রসঙ্গে হরিমাধব মুখোপাধ্যায় আত্মস্মৃতিতে উত্তরবঙ্গ' গ্রন্থের 'বীক্ষমান স্মৃতি' প্রবন্ধে যথার্থ বলেছেন— ''আমি ইতিমধ্যে বড়দের সঙ্গে কিশোর বালকের ভূমিকায় হাত পাকাচ্ছি, ভয়ডর ভাঙ্গছে আমার। এই অভিজ্ঞতা সম্বল করেই হঠাৎ দল করে ফেললাম নাট 'তরুণতীর্থ'। আদর্শ স্কুলের মাঠে কিংবা বাড়ির সামনে নির্মল ব্যানার্জীর মাঠে স্টেজ বেঁধে অভিনীত হল 'বন্দী বীর', 'সিরাজের স্বপ্ন', 'বিদ্রোহী' এসব নাটক।''[৮০] মোটকথা তরুণতীর্থ অস্থায়ী মঞ্চ বেধে প্রচুর দর্শক সমাগমের মধ্যে নাট্যাভিনয় করেছিল। সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায় যে, তরুণতীর্থের তরুণরা নিজেদের প্রযোজনা ও নির্দেশনায় সদস্য নির্মলেন্দু (মনি) তালুকদারের রচিত 'ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি', নাটকটি বেশ সাড়ম্বরের সঙ্গে মঞ্চ বেঁধে অভিনয় করে দর্শক সমাদর লাভ করে। বালুরঘাটের নাট্যজগতে তরুণতীর্থ গুরুত্ব পেতে লাগল, পরে আরও বেশ কয়েকবার বিভিন্ন স্থানে এই নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। প্রসঙ্গক্রমে হরিমাধব মুখোপাধ্যায়

জানিয়েছেন— ''পড়ার ফাঁকে গোপনে নাট্যরচনার প্রস্তুতি চলতো। ... শেষ পর্যন্ত মনি একটা নাটক লিখে ফেললো। আমি বাহাদুরি করে কাঁটা ছেঁড়া সংযোজন পর্ব সমাধান্তে নাটকটিকে মঞ্চ উপযোগী করে তুললাম। নাম দেওয়া হল 'ছেঁড়া কাগজের জুড়ি'। আমরা বেশ উদ্দীপ্ত উত্তেজিত। নিজের দলের ছেলে নাটক লিখেছে। খুবই আত্মশ্লাঘা বোধ করছি মন্মথ রায়কে বাদ দিলে বালুরঘাটের দ্বিতীয় নাট্যকার নির্মলেন্দু— এরকম একটা প্রচার আমরা মুখে মুখে শুরু করে দিয়েছি। নাট্যমন্দিরের সঙ্গে আমরা টেক্কা দিতে চাই।"[৮১] এরপর তরুণতীর্থ স্বাভাবিকভাবে নির্মলেন্দু তালুকদার রচিত অন্যান্য নাটকগুলি যথা— 'আক্কেল সেলামী', 'পাপ ও পাপী' ও 'পঞ্চাশ হাজার টাকা' ইত্যাদি নাটকগুলি মাঠে মঞ্চ বেঁধে অভিনয় করে। এই সব নাটকগুলি গুণগত বিচারে প্রযোজনার মান তেমন উন্নত না হলেও নিজস্ব নাটক প্রযোজনার প্রচেষ্টাকে সামনে রেখে এই সব উদ্যোগ ছিল যথেষ্ট ধন্যবাদ এবং অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে।

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে দর্শক সমাজ তৈরি হতে শুরু করে এবং নাটকের চাহিদা বাড়ে। তখন দেখা যায় তরুণতীর্থ নিজেদের লেখা নাটক নিজেদের প্রযোজনায় ও নির্দেশনায় নাট্যমন্দির মঞ্চে মঞ্চস্থ করে। এইসব নাটক দেখার জন্য টিকিট কেটে দর্শকদের মধ্যে হুড়োহুড়ি লেগে যায়। তবে একটি বিষয় উল্লেখের দাবি রাখে তা হল, তরুণতীর্থের নাটক মঞ্চায়নে বালুরঘাটের দর্শক প্রথম দেখলেন সঠিক সময়ে অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ে ঘড়ির কাটা মেনে নাটক আরম্ভের নিদর্শন। সময়ানুবর্তিতা এই সংস্থার এক বড় সম্পদ। মোটকথা বালুরঘাটের নাটকে ঐতিহাসিক ছয়ের দশকের শুরু ঠিক এই ভাবেই। দর্শক উপচে পড়ছে প্রেক্ষাগৃহে এবং অবশ্যই টিকিট কেটে। তাই লক্ষ করা যায় স্থানীয় বিমান বন্দরের অফিসারের স্ত্রী বীথি সরকার এই নাট্যসংস্থায় যোগদান করলে তরুণতীর্থ তখন বেশ কয়েকটি সিরিয়াস নাটক যেমন 'বাসনার মৃত্যু', 'পাখীর বাসা', 'নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র', 'বিজ্ঞাপন' ইত্যাদি দর্শনীর বিনিময়ে পূর্ণপ্রেক্ষাগৃহে এবং নাটকে আসে আধুনিকতার ছোঁয়া। এই নাট্যসংস্থার নারী চরিত্রের ভূমিকায় সুদক্ষ অভিনেতারা হলেন— দিলীপ অধিকারী, সুবোধ সান্যাল, দুর্গেশ চ্যাটার্জী, ব্রজবল্লভ সাহা (পলু) এবং নিরুপমা সরকার ও মনি সরকার এই নাট্যসংস্থার দু'জন প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী ছিলেন। এরই মধ্যে 'হাইপার বোল', নাটকটি দর্শক মহলের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করে। জীবনকানাই মুখোপাধ্যায়ের সাবলীল ও চিত্তাকর্ষক অভিনয় দর্শকমণ্ডলীকে বিশেষভাবে আপ্লুত করে। তরুণতীর্থের 'শেষ থেকে শুরু', 'করুণা করো না' ইত্যাদি নাটকে দেবল রায়ের অভিনয় যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করে। এই নাট্যসংস্থার আরও কয়েকটি অন্যতম ও উল্লেখযোগ্য নাট্য-প্রযোজনাগুলি হল— চকমকি, সানিভিলা, ড: মিস্ কুমুদ, শেষ কোথায়, সংগ্রাম, কেম্‌কি, দায়ে পড়ে দার পরিগ্রহ, রজনীগন্ধা, বিলাসকুঞ্জ, বোডিং প্রভৃতি। এই নাকটগুলি হরিমাধব মুখার্জীর

পরিচালনায় ও নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হয়। তবে একথা স্বীকার করতে বাঁধা নেই যে, তরুণ তীর্থের নাট্যভাবনা, নাট্যপরিচালনা ও নাট্য নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বালুরঘাটের নাট্যচর্চার গতিপথে নতুনত্ব দেখা দেয়। এই সংস্থার নাট্যপ্রযোজনাগুলির মধ্যে বিশেষ করে পাখীর বাসা, শেষ থেকে শুরু 'নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র' এই নাটকগুলো দর্শকদের নতুন করে চিন্তাভাবনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে। চেকভ ও পিরানদেল্লো নাট্যকারের বাংলায় অনুবাদিত নাটক বোধ হয় বালুরঘাটের মতো মফস্বল ঘেষা ছোট্ট শহরে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে হরিমাধব মুখোপাধ্যায় বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের সভ্য হওয়ায় তরুণতীর্থের চিরঅবলুপ্তি ঘটে। মোটকথা তরুণতীর্থের প্রতিষ্ঠাতা ও অন্যতম সদস্য হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এবং নির্মলেন্দু তালুকদারের সম্পাদনায় এই নাট্যসংস্থা যথা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠে, ঠিক সেই সময় ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে তরুণতীর্থের অবলুপ্তির মধ্য দিয়ে পশ্চিম দিনাজপুর তথা সমগ্র উত্তরবঙ্গের বর্তমান গৌরবের ধন্য গ্রুপ-থিয়েটার সংস্থা ত্রিতীর্থ গড়ে ওঠে।

বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের গতানুগতিক পদ্ধতি অনুসরণ করে যে নাট্যায়নের প্রবণতা চলছিল তার বিরুদ্ধে প্রথম সরব প্রতিবাদী পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং নাটক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রেখে ১৯৫৯-৬০ খ্রিস্টাব্দে অবিনাশ দত্ত, কানাই দত্ত, সত্যরঞ্জন (গোবিন্দ) তালুকদার, নীনা চ্যাটার্জী, পঙ্কজ বিশ্বাস, সুধীর ঘোষ এবং আরও কিছু নাট্যশিল্পী নাট্যমন্দির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 'ত্রিশূল' নামে নতুন নাট্যসংস্থা গঠন করেন। এই নাট্যসংস্থা নির্মাণের মুখ্য ভূমিকায় মূলত: অবিনাশ দত্ত, কানাই দত্ত এবং সত্যরঞ্জন তালুকদার এই তিনজন মূল দায়িত্ব পালন করার সুবাদে উক্ত নাট্যসংস্থার তিনটি 'শূল' নামে অভিহিত হন। এই নাট্যসংস্থা প্রথম নাটক নিয়ে নতুন চিন্তা শুরু করার ফলস্বরূপ বালুরঘাটের নাট্যদর্শক ত্রিশূলের প্রযোজনায় কিছু ভালো নাটক দর্শন করার সুযোগ পেলেন এবং এই নাটকগুলো দর্শকদের মনে স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছিল। ত্রিশূল নাট্যসংস্থার প্রথম নাট্য-প্রযোজনা 'এবং ইন্দ্রজিৎ'। তারপর এই সংস্থা যথাক্রমে— 'বাকী ইতিহাস', 'মুক্তধারা', 'নানারঙের দিনগুলি', 'শেষ সংলাপ', 'রাক্ষস', 'প্রেম পরীক্ষা', 'প্রতিদিনের নায়ক', 'পাখীর বাসা' এই জেলার নাট্যচর্চার প্রবহমান গতি ধারায় স্বাতন্ত্র্য চিন্তা-চেতনার পরিচয় তুলে ধরেন। বিশেষ করে এই সংস্থার পরিচালক পার্থপ্রতিম বক্সীর পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' পূর্ণাঙ্গ নাট্য প্রযোজনা দর্শক মণ্ডলীর অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করে আজও বালুরঘাটের দর্শক তথা সবারই অন্তরে দাগ ফেলে দেয়।

ত্রিশূল ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে নাট্যমন্দির মঞ্চে একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এবং এই নাট্যসংস্থা প্রতিযোগিতামূলক নাট্য-প্রযোজনায় অংশগ্রহণ করেও পুরস্কার অর্জন করেছে।

ত্রিশূলের অভিনেত্রী আরতি হালদার এবং অভিনেতা নিমু রায় একটি বিশেষ একাঙ্ক নাট্য-প্রযোজনায় যথাক্রমে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী ও শ্রেষ্ঠ পার্শ্বচরিত্রের পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ করা যায় ত্রিতীর্থ নাট্যসংস্থার সঙ্গে ত্রিশূল নাট্যসংস্থার সংযুক্তিকরণের ফলে 'ত্রিশূল' নামের এই নাট্যসংস্থাটি চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

ষাটের দশকে এই জেলায় গ্রুপ থিয়েটারের সূচনা হওয়ার ফলে এই দশকেই বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের অন্যতম অভিনেতা সুধীর দে নিজস্ব উদ্যোগে 'প্রাচ্যললিত কলা একাডেমী' নামে একটা নাট্যসংস্থা গড়ে তোলেন ও সাধ্য মতো নাট্য প্রযোজনা করেছেন। পরবর্তী সময়ে এই নাট্যসংস্থায় অংশ গ্রহণ করেন নাট্যমন্দিরের প্রখ্যাত ও সু-অভিনেতা অমলেশ (নাড়ু) মিত্র। এরপর স্বাভাবিক ছন্দে বালুর ঘাটে কচিকলা একাডেমী, বিংশ শতাব্দী ক্লাব, প্রাচ্যভারতী নাট্যনিকেতন ইত্যাদি নাট্যসংস্থা তৈরি হয় এবং অস্থায়ী মঞ্চ বেঁধে কয়েকটি মঞ্চসফল নাট্য-প্রযোজনা করে দর্শকদের মুগ্ধ করে তুলেছিলেন। বালুরঘাটের নাট্যচর্চায় বিংশ শতাব্দী ক্লাব শরীরচর্চা, খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি নাটক মঞ্চায়নও করতেন। এরা বেশকিছু নাটক মঞ্চস্থ করে সুনাম অর্জন করে। উল্লেখযোগ্য মঞ্চসফল নাটকগুলি হল— 'বৌদির বিয়ে', '১৪ পাকে বাঁধা', 'রক্তে রোয়া ধান', 'থানা থেকে আসছি', 'ডাকঘর', 'জয়বেদ' প্রভৃতি। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সদর মহকুমা শহর বালুরঘাটের নাট্যচর্চায় 'প্রাচ্যভারতী' নাট্যনিকেতনের যথেষ্ট সুনাম ছিল। জানা যায় যে বাৎসরিক দুর্গাপুজোর পর বিজয়া সম্মিলনীকে কেন্দ্র করে প্রাচ্যভারতী যে সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তার সর্বাগ্রে নাটক মঞ্চস্থ করাকে প্রাধান্য দেওয়া হত। এই সংস্থার উল্লেখযোগ্য নাট্য প্রযোজনাগুলি হল: 'ছেঁড়া তমসুক', 'খ্যাতির বিড়ম্বনা' প্রভৃতি। এখানে প্রযোজিত নাটকে অভিনেতা অভিনেত্রী হিসাবে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেন— রাধাকমল মহন্ত, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, ডলি ঘোষ, সমীরকুমার সেনগুপ্ত, অজিত ঘোষ, ময়না সাহা, সন্তোষ ঘোষ প্রমুখ। এই সংস্থার মঞ্চের রূপসজ্জা ও মঞ্চ সাজানোর দায়িত্বে ছিলেন শীতলা চক্রবর্তী ও কালী হোড় প্রমুখ। এই নাট্যসংস্থাগুলির প্রযোজিত নাটকের সংখ্যা বেশি না হলেও বালুরঘাটের নাট্যচর্চার বিবর্তনের ইতিহাসে এঁদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা লক্ষ করা যায়। তবে লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে, সময়ের স্রোতে পরিকাঠামোগত ত্রুটি, সাংগঠনিক দুর্বলতা, ইগোর লড়াই তথা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মাথা চাড়া দেওয়ায় ছোট ছোট নাট্যদলগুলো ভাঙতে শুরু করে পরিশেষে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাই এই জেলার বালুরঘাটের নাট্যচর্চায় এই ছোট ছোট নাট্যদলের ক্ষেত্রেও উক্ত পরিণতি লক্ষ করা যায়। বর্তমানে 'প্রাচ্যললিত কলা একাডেমী নাট্যসংস্থাটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। সেই সঙ্গে কচিকলা একাডেমী ও প্রাচ্যভারতী নাট্যনিকেতন এই দুটি নাট্যসংস্থার নাট্য-প্রযোজনাও বন্ধ হয়ে গেছে। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে 'চিরন্তন' নাট্যসংস্থার

ব্যানারে প্রদোষ মিত্র, মিঠু চ্যাটার্জী, ভোলা সাহা প্রমুখ নাট্য শিল্পী মিলিত হয়ে প্রভাস সমাজদারের উদ্যোগে ও প্রদোষ মিত্রের নির্দেশনায় কিরণ মিত্র রচিত 'অন্ধকারায়' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। এরপর প্রদোষ মিত্রের নির্দেশনায় 'উত্তাল তরঙ্গ' নাট্য প্রযোজনাটিও বহুল প্রশংসিত হয়। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে নাট্যমন্দির আয়োজিত 'একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায়' চিরন্তন নাট্যসংস্থার 'অস্তমিত গান' প্রযোজনাটিও দর্শক সমাদর লাভ করে। নির্দেশনায় ছিলেন প্রদোষ মিত্র এবং তিনি দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কারে পুরস্কৃত হন। চিরন্তন নাট্যসংস্থার ব্যানারে প্রণব চক্রবর্তী নির্দেশিত আর একটি উল্লেখযোগ্য আধুনিক নাট্য-প্রযোজনা 'সকলের জন্য' বেশ সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়ে দর্শক ধন্য হয়ে ওঠে।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে লক্ষ করা যায় যে, গণনাট্য ধারা থেকে নব-নাট্যধারার দীর্ঘ পথ পরিক্রমার মধ্য দিয়ে বাংলার নাট্যজগতে সত্তর দশকের দিকে গ্রুপ থিয়েটার স্থায়ী আসনে উন্নীত হয়েছিল। নাট্য জগতের এই বিবর্তনের ধারা বেয়ে এই জেলাতেও আরো কয়েকটি নাট্যদল গড়ে ওঠে ও নাটক নিয়ে নতুন চিন্তা-চেতনা তথা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে নাট্যাভিনয়ে মনোনিবেশ করে নব উদ্যোগ ও তৎপরতার সঙ্গে নাট্যচর্চার কাজ শুরু করেন। জেলার এই গ্রুপ থিয়েটারগুলির মধ্যে অন্যতম ও উল্লোখযোগ্য নাট্যসংস্থাগুলি: 'ত্রিতীর্থ', 'লোকায়ণ' 'তূনীর' অভিযাত্রী লিটল থিয়েটার গ্রুপ, 'প্রগতি' রূপান্তর, যান্ত্রিক, পূর্বাশা, আত্রেয়ী, সংকেত, তর্পন, অগ্নিবীণা, দিশারী প্রভৃতি নাট্যসংস্থা।

১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে আগস্ট প্রভাস সমাজদারের বাড়িতে দুটি প্রতিষ্ঠিত নাট্যদল 'তরুণতীর্থ' ও 'ত্রিশূলে'র সঙ্গে বালুরঘাট নাট্যমন্দির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসে বেশ কিছু অভিনেতা-হরিমাধব মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু তালুকদার, শান্তিরঞ্জন (ছানা) গুহ, প্রভাস সমাজদার, সুধীর দে, অমিতাভ সেনগুপ্ত, সত্যরঞ্জন তালুকদার, অবিনাশ দত্ত, কানাই দত্ত, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (বাকু) চট্টোপাধ্যায়, বিশু ঘোষ, মানস সেন, সুনির্মল সরকার, জীবন কানাই মুখার্জী, পঙ্কজ বিশ্বাস, কানাই মজুমদার প্রমুখ অভিনেতারা মিলিত হয়ে আধুনিক নাট্য-প্রযোজনা করার উদ্দেশ্যে ত্রিতীর্থ নামে প্রগতিশীল নাট্যসংস্থার জন্ম দিলেন যা দক্ষিণ দিনাজপুরের গণ্ডী অতিক্রম করে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের নাট্যজগতের এক উজ্জ্বল আলোক শিখা রূপে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। 'ত্রিতীর্থে'র উদ্ভবের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে জেলার বিশিষ্ট নট ও নাট্যকার হরিমাধব মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন— ''নাট্যমন্দিরের সঙ্গে একটা মানসিক বিচ্ছেদ ইতিমধ্যেই তৈরী হয়েছে নানা কারণে। আমি নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম যে, বড় মাপের কিছু করতে হলে চাই সংঘবদ্ধ শক্তি এবং নাটকে এই শক্তির উৎস: অভিনেতা এবং অভিনেত্রী... এই ইচ্ছা এবং অস্থিরতার কথা খুলে বলি জ্যোতিরিন্দ্র

চ্যাটার্জী ওরফে বাকুদাকে। ... মূলত তাঁরই উদ্যোগে স্থানীয় টাউন ক্লাবের ঘরে একটা সভা ডাকা হয়। তরুণতীর্থ এবং ত্রিশূল এই দুই দল ছাড়া সে সভায় উপস্থিত ছিলেন তখনকার বালুর ঘাটের অনেক বিশিষ্ট অভিনেতা এবং অভিনেত্রী যারা নানা কারণে মানসিকভাবে নাট্যমন্দির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। এই সভায় সিদ্ধান্ত হয় তরুণতীর্থ এবং ত্রিশূল নিজ অস্তিত্ব বিলোপ করে একত্রিত হবে এবং এই পর্ব সমাধা হলে অন্যান্যরা যোগ দেবেন। বিতণ্ড বিস্তর বিতর্ক পেরিয়ে তরুণতীর্থ এবং ত্রিশূল এক হল। দ্বিতীয় সভাটি বসল শ্রী প্রভাস সমাজদারের বাড়িতে এবং এই সভাতেই জন্মলাভ করল ত্রিতীর্থ। সেটা ১৯৬৯ সাল। তরুণতীর্থ এবং ত্রিশূল এক হল। ত্রিতীর্থ নামটি সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হল। মণি এই নামকরণের একটি ব্যাখা দিল। ব্যাখ্যাটি এরকম যে অভিনেতা, দর্শক এবং নেপথ্য কর্মীদের যথার্থ আদর্শ সমন্বয়ে গড়ে ওঠে একটি সার্থক নাটক। ব্যাখ্যাটি সবারই মনঃপূত হল। ফলে ত্রিতীর্থ নামকরণে কারো আপত্তি থাকলো না।''[৮২] ত্রিতীর্থ গ্রুপ থিয়েটার সংস্থা তার প্রচার পত্রে ঘোষণা করেছে— ''ত্রিতীর্থ একটি নাট্যসংস্থা— অতি সাম্প্রতিককালের নাট্যচিন্তায় যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে— তাকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলতে চাইছে আধুনিক নাট্যচর্চার প্রয়াস। অগণিত দর্শক, মঞ্চশিল্পী আর নেপথ্য কলাকুশলীদের সম্মিলিত প্রয়াসেই গড়ে ওঠে ত্রিতীর্থ সঙ্গম। আমাদের প্রথম এবং শেষ কথা পরিচ্ছন্ন প্রযোজনা।''[৮৩]

মফস্বল বাংলার অপেক্ষাকারী নাট্যসংস্থাগুলির মধ্যে নাট্য আন্দোলনের অন্যতম সফল অংশীদার 'ত্রিতীর্থ'। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬ শে সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠালাভের ঠিক এক মাসের মধ্যে বালুরঘাট মুক্ত মঞ্চে শম্ভু মিত্রের 'পুতুল খেলা' নাট্য-প্রয়োজনার মধ্য দিয়ে ত্রিতীর্থ আত্মপ্রকাশ করে পথচলা শুরু করে। মোটকথা মালদহ জেলার বন্যা-ত্রাণ-সাহায্য কল্পে 'পুতুল খেলা' নাটকের মুক্তাঙ্গন প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে ত্রিতীর্থের নাট্যচর্চার সূচনা হয়। এই বিষয়ে বালুরঘাট তথা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার-খ্যাতনামা নট ও নাট্যকার হরিমাধব মুখোপাধ্যায় বলেছেন— ''১৯৬৯-এ ত্রিতীর্থের প্রতিষ্ঠা অনুঘটক হিসাবে এই পরিবর্তনের সূচনা করে। নাট্যচর্চায় নাট্যমন্দিরের একচেটিয়া অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভূমিকার অবসান হল। ত্রিশূল ও তরুণতীর্থ অধিকাংশ মাঠ ময়দানের বা কচিৎ কদাচিৎ মঞ্চে অভিনীত নাটকগুলো সীমিত অভিনয়ের কারণে নাট্যমন্দিরের কৌলিণ্য ব্যহত হয়নি। কিন্তু ত্রিশূল ও তরুণতীর্থের মিলন— ত্রিতীর্থের প্রতিষ্ঠার পর চিত্রপট আমূল বদলে গেলে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার আবহাওয়া তৈরি হয়ে গেল। ... নিরপেক্ষ নিরাবেগ বিচারে আমার মনে হয় শিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষত: performing art-এর ক্ষেত্রে এই টক্কর বালুরঘাটের নাট্যচর্চাকে সমৃদ্ধ করেছিল, সুনাম যশ বাড়িয়েছিল, বালুর ঘাট বৃহত্তর পশ্চিমবঙ্গের নাটকের জন্য মান্যতা সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল।'[৮৪] কিছু দিনের মধ্যেই অস্থায়ী মঞ্চ তৈরি করার কাজ শুরু হয়। জানা যায় 'পুতুল খেলা'র মহড়া শুরু

করে নাট্যমন্দির মঞ্চ ভাড়া করা হলে বন্যার জলে নাট্যমন্দির প্রেক্ষাগৃহ জলমগ্ন হয়। এর ফলে প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট দিনে এই নাটক মঞ্চস্থ হয়নি। পতিরামের জমিদার বীরেন ঘোষের প্রস্তাব অনুযায়ী বালুরঘাট চকভবানীতে তাঁদের পৈতৃক সম্পত্তির একটি খালি মাঠে (বর্তমানে যেখানে মিউনিসিপ্যাল মার্কেট বা ব্যাঙ্কের বাজার) বেশ দ্রুত কঠোর পরিশ্রম সহ বালুরঘাট এবং সন্নিহিত গ্রামের মানুষ জনের সাবলীল ও অপ্রত্যাশিত সহযোগিতায় একটি অস্থায়ী মঞ্চ তৈরি হয়। বীরেন ঘোষের বড়দা স্বর্গত জমিদার গোবিন্দ ঘোষের স্মৃতি অনুযায়ী এই মুক্তমঞ্চের নাম হয় 'গোবিন্দ অঙ্গন'। গোবিন্দ বাবুর অকাল প্রয়াত পুত্র সংস্থার সুহৃদ ও অভিনেতা কল্যাণ ঘোষের নামানুসারে মঞ্চের নাম হয় 'কল্যাণ মঞ্চ'। নাট্যমন্দির ছেড়ে আসা ঐকবদ্ধ একদল নাট্যপ্রেমী মানুষের অপরিসীম পরিশ্রম, নিষ্ঠা, ঐকান্তিক প্রচেষ্ঠা, অপরাজেয় মনোবল এবং শক্তির উজ্জ্বল নিদর্শন হিসেবে এই মুক্তমঞ্চ গড়ে উঠে— যা বালুর ঘাট তথা জেলার নাট্য ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। এই নাট্যসংস্থার সদস্যসহ বিশিষ্ট অভিনেতারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে বাঁশ সংগ্রহ করা থেকে শুরু করে কাপড়ের দোকান ঘুরে ঘুরে চটের টুকরো সংগ্রহ করা ও পতিরাম থেকে চটের বস্তা বয়ে নিয়ে এসে পুষ্প সমাজদার ও প্রভাস সমাজদারের মাঠে বসে সবাই মিলে সেই টুকরো ছেঁড়া চট সেলাই করে বহু বর্ণ আচ্ছাদিত বিরাট মাপের একটি সামিয়ানা তৈরি করেন।

শনিবার ও রবিবার এই দুইদিন অভিনয়ের জন্য ধার্য ছিল। দর্শকদের বেঞ্চে বসে থিয়েটার দেখার জন্য আদর্শ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও নাট্যপ্রেমিক সুধীর বাকুকে আবেদন করা হলে তিনি উক্ত আর্জি মঞ্জুর করেন। শনিবার চারটে নাগাদ স্কুল ছুটি হলে অবিনাশ দত্তের নেতৃত্বে সংস্থার সদস্যরা সকলে একটি করে বেঞ্চ বয়ে নিয়ে আসত মঞ্চ পর্যন্ত। রবিবারে নাটক সমাপ্ত হওয়ার পর মেক্ আপ তুলেই আবার সেই বেঞ্চ যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়া হত। আরও জানা যায় তারই নেতৃত্বে অভিনয়ের দিন সকালে বহু বর্ণে রঞ্জিত অজস্র সেলাই খোদিত আচ্ছাদনটি খাটানো হত আবার রাত্রে অভিনয়ের যবণিকা পড়লে খুলে নেওয়া হতো। এইভাবে তৈরি অস্থায়ী মঞ্চে বেশ কয়েকবার দর্শকপূর্ণ অবস্থায় বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে 'পুতুল খেলা' নাটকটি অভিনীত হয়। পুতুলখেলা 'ত্রিতীর্থ' সংস্থার একটি সার্থক প্রযোজনা। এই নাটকে বুলার ভূমিকায় বীথি সরকারের অভিনয় এক অনবদ্য অবিস্মরণীয় সৃষ্টি, তা বালুরঘাটের দর্শক ধন্য হয়ে দর্শকচিত্তে আজও অমলীন হয়ে আছে। হরিমাধব মুখোপাধ্যায় তাঁর ভবিষ্যৎ নাট্য-পরিচালনার বিশিষ্ট প্রয়োগ রীতির কিছু নিদর্শন এই পুতুল খেলা নাট্য-প্রযোজনার মাধ্যমে দর্শকদের সম্মুখে তুলে ধরেন।

ত্রিতীর্থের নাট্য প্রযোজনার অর্থ হল একটি নাটকের সার্থক মঞ্চায়ন। এমনকি দুরূহ নাটক প্রযোজনার দুঃসাহসিকতায় মফঃস্বল বাংলায় একটি বিশিষ্ট নাম ত্রিতীর্থ। এই সংস্থা নাট্য-প্রযোজনার

ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় সম্মান ও খ্যাতি অর্জন করেছে এবং নাট্য সংস্কৃতিতে ভালোবেসেই বালুরঘাটের মানুষ ও দর্শকরাও যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। এই প্রসঙ্গে বাংলার বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব ও নাট্যকার ব্রাত্য বসু বলেছেন— ''দক্ষিণ দিনাজপুরের মূল নাট্যকেন্দ্রটি অবশ্যই বালুরঘাটের। প্রধানত ত্রিতীর্থ দল এবং হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের আত্যন্তিক প্রয়াসে বালুরঘাটে এক শ্রেণীর দর্শক গড়ে ওঠেন যাঁরা থিয়েটারের নতুন নিরীক্ষা অনায়াসে বুঝতে সক্ষম।''[৮৫] তাই একথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় যে, ত্রিতীর্থ নাট্যসংস্থা গড়ে ওঠার পর বালুরঘাটের নাট্যচর্চায় একটা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন অবয়ব ফুটে ওঠে। বালুর ঘাটে দর্শক মহল দেখতে পেলেন মননশীল, পরিশীলিত ও আধুনিক নাটক, নাটকের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি হলো মানুষের। বালুরঘাটে ত্রিতীর্থ তাঁদের নাট্য-প্রযোজনাগুলির মধ্য দিয়ে বালুরঘাট শহরে ছাড়াও গ্রামগঞ্জের সাধারণ মানুষের মধ্যেও নাটক দেখার এমন একটি সুস্থ সংস্কৃতি প্রিয় অভ্যাস গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন জন্যই একসময় তাঁরা নিজস্ব রঙ্গমঞ্চ গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। যা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে এক অপূর্ব ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। 'ত্রিতীর্থ'-এর পরবর্তী নাট্য-প্রযোজনা রিচার্ড ন্যাসের 'বৃষ্টি বৃষ্টি' নাটক দেখতে দর্শকদের ভিড়ে জমজমাট থাকত মুক্তমঞ্চ। এই নাট্য-প্রযোজনায় কানাই দত্ত যাদুকরের ভূমিকায় বিশেষ প্রশংসনীয় অভিনয় করেন। ত্রিতীর্থ ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের দিকে 'দৃষ্টি' একাঙ্ক নাটক সহ মোট আটটি নাট্য-প্রযোজনা করে বালুরঘাটের নাট্যজগতে সাড়া ফেলে সমগ্র উত্তরবঙ্গের নাট্য জগতে এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। 'এবং ইন্দ্রজিৎ', 'প্রতিদিনের নায়ক', 'অমৃতস্য পুত্রাঃ', 'বিশে জুন', 'শের আফগান', 'রাজযোটক' (একাঙ্ক), 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র' এবং 'বিজ্ঞাপন' প্রভৃতি ছিল এই নাট্যসংস্থার সকল নাট্য-প্রযোজনার উজ্জ্বল নাট্যকৃতিম্ভার। এই সময় ত্রিতীর্থের সু অভিনেত্রী ও প্রখ্যাত মহিলা নাট্যশিল্পী বীথি সরকার স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে এই নাট্যসংস্থার সহ অভিনয়ে শূন্য বেহাল অবস্থা সামাল দিতে গৃহবধূ রমা তালুকদার 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাট্য-প্রযোজনায় 'মানসী' চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেন। 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' এবং 'বিশে জুন' এই নাট্য-প্রযোজনা দুটিতে দীপিকা সেন সহ-অভিনেত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করেন। 'শের আফগান' নাট্য-প্রযোজনায় প্রথমে অমিতাভ সেন (দুলু) এবং পরে হরিমাধব মুখোপাধ্যায় মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেন। সত্তরের দশকে ত্রিতীর্থের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাট্য-প্রযোজনা 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র' লক্ষ্ণৌ বেঙ্গলী ক্লাব আয়োজিত সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় সব বিষয়ে প্রথম পুরস্কারের সম্মানে সম্মানিত হয়। এই নাটকে মেয়ের ভূমিকায় রুণু দাশগুপ্ত শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সম্মান লাভ করেন। অমিতাভ সেন বাবার ভূমিকায় এবং পরিচালকের ভূমিকায় হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ও যথেষ্ট প্রশংসনীয় অভিনয় করেন। সেই সঙ্গে এই নাট্য-প্রযোজনাটি শিলিগুড়িতে এবং কাটিহারে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। এই

দশকে ত্রিতীর্থের হাস্যকৌতুক নাট্য-প্রযোজনা 'বিজ্ঞাপন' চয়নিকা গুহরায় নামে এক প্রতিভাময়ী অভিনেতাকে আবিষ্কার করে যে ত্রিতীর্থের পরবর্তী সময়কালে অসংখ্য নাট্য-প্রযোজনায় দুরূহ নারী চরিত্রে সক্ষম অভিনয় করেছেন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে দুটি একাঙ্ক সহ 'ছুটির খেলা' নামে একটি সামাজিক পূর্ণাঙ্গ নাটক ত্রিতীর্থ মঞ্চস্থ করে। এই নাটকে করবী রায় নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেন। কলিকাতায় যখন শম্ভু মিত্র 'ইবসেন' মঞ্চস্থ করেন, ঠিক সেই সময়েই লক্ষ করা যায় মফস্বল শহর বালুরঘাটেও ত্রিতীর্থের প্রয়োজনায় ইবসেন মঞ্চস্থ হয়েছিল। মোটকথা ত্রিতীর্থ উত্তরবঙ্গের সীমান্ত লাগোয়া মহকুমা সদর শহর বালুরঘাটে থেকে মফস্বল কেন্দ্রিক নাট্যচর্চার মধ্য দিয়ে রাজধানী কলকাতাকে টেক্কা দেওয়ার চেষ্টা করে সাফল্য লাভ করেও সারা বাংলাব্যাপী বিস্তার লাভ করে। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে মঞ্জুরী আমের মঞ্জরী, তিনবিজ্ঞানী এবং ভাঙ্গাপট প্রভৃতি নাট্য-প্রযোজনার মধ্যে দিয়ে ত্রিতীর্থ যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে 'কালামন্দিরে' সাতদিনের জার্মান নাট্য উৎসবে 'তিন বিজ্ঞানী' ও 'ভাঙাপট' অভিনয় করে কলকাতাকে হারিয়ে দিয়ে ত্রিতীর্থ সারা বাংলা জুড়ে ব্যাপক সুনাম ও খ্যাতি অর্জন করে।[৮৬] এমন কি কলকাতার 'কলামন্দিরে' বালুরঘাট ত্রিতীর্থ নাট্যসংস্থার 'তিন বিজ্ঞানী', 'ভাঙাপট', নাট্য-প্রযোজনা দুটি দেখে কলকাতার সংবাদপত্র, সাপ্তাহিক পত্রিকা বেশ প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠে ছিলেন। এই বিষয়কে কেন্দ্র করে 'সাপ্তাহিক দেশ' পত্রিকা লিখেছিলেন— 'কলামন্দিরে কোলকাতার হার'। আবার 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় লিখেছিলেন— Good acting is not monopoly of calcutta।[৮৭] বালুরঘাটের কৃতি সন্তান নীহার ভট্টাচার্য জার্মান নাট্যকার-ক্লাইস্টের Der Zerbrochene krug' নাটক অবলম্বনে নাট্যরূপ দেন 'ভাঙাপট'। আর জার্মান নাট্যকার ডুরের ম্যাটের Three Physicist নাটক অবলম্বনে তিন বিজ্ঞানীর নাট্যরূপ দেন নীহার ভট্টাচার্য। এই নাট্য-প্রযোজনা দুটিতে চয়নিকা গুহরায় সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের অভিনয় করে তাঁর অভিনয় প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। 'ভাঙাপট' নাটকটি দেশের বিভিন্ন মঞ্চে অভিনীত হয়েছে। প্রতিক্ষেত্রেই অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে। এই 'ভাঙাপট' নাটকটির প্রযোজনা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে জেলার বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও নাট্যকার অধ্যাপক অজিতেশ ভট্টাচার্য তাঁর 'বালুরঘাটের নাট্যচর্চায় ত্রিতীর্থ এবং অন্যান্য' প্রবন্ধে বলেছেন— ''অভিনয় অনুবদ্য। কী ব্যক্তিগত অভিনয়, মঞ্চ পরিকল্পনা কিংবা শব্দ প্রক্ষেপ— যে দিক দিয়েই বিচার করা যায় না কেন, ভাঙাপট অসামান্য প্রযোজনা। ইতিমধ্যেই দর্শক-সংকুল পঁচিশ রজনী অভিনয়ের মধ্যে এটা অবিসংবাদিত ভাবে প্রমাণিত।''[৮৮]

বালুরঘাট নাট্যমন্দির জেলার নাট্যচর্চা তথা নাট্যসংস্কৃতির সূতিকাগার হওয়া সত্ত্বেও ত্রিতীর্থ নাটক নির্বাচন, নাট্যভাবনা ও নির্দেশনায় এক নতুন মাত্রা যোগ করে জেলার চৌহদ্দি ছেড়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন উত্তরবঙ্গের সীমানা ছাড়িয়ে রাজ্য রাজধানীর অঙ্গনে বারে বারে এবং নিশ্চিতভাবে

তারও বাইরে। গতানুগতিক পৌরাণিকি ও ঐতিহাসিক নাটকের পাশাপাশি গণচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ত্রিতীর্থের নাট্যপ্রযোজনা 'দেবীগর্জন' দর্শকের মনে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল।

তাই ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে 'দেবীগর্জন' ত্রিতীর্থে সবচেয়ে বেশি রজনী অভিনীত নাট্য-প্রযোজনা। এমনকি সমকালীন সমক্ষে কলকাতায় প্রযোজিত বিভিন্ন বিখ্যাত ব্যক্তিগত নাটকের সমমানের প্রযোজনা ছিল এই দেবীগর্জন নাটকটি। এই প্রসঙ্গে দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'অভিনয়' পত্রিকায় নির্বাচিত নাট্য সমালোচনা অংশে ত্রিতীর্থের 'দেবীগর্জন' নাট্য-প্রযোজনার সম্বন্ধে সু-প্রশংসা তুলে ধরা হয়েছে এই ভাবে— ''ত্রিতীর্থের নিষ্ঠা ও দক্ষতার অসাধারণতায় বিশেষ এক অঞ্চল-সীমার মাঝে বেদনা-শোষণ ও সংগ্রাম মুখর গ্রামজগতের ছবিখানি এমনই মরমী রূপ নিয়েছিল যে তা সীমার গণ্ডী ভেঙে সারাদেশের প্রতিনিধিত্বের আসন বিছিয়ে বিজন ভট্টাচার্যের নাটক অবলম্বন করে ত্রিতীর্থ শিল্পীরা সবার পরশে পবিত্র করা প্রযোজনার মাধ্যমে নাট্যকারের অপূর্ব একক প্রয়াসের সার্থক পরিপূরক হয়ে উঠেছিলেন।

অবন মহলের নতুন মঞ্চের আলোক নিয়ন্ত্রণগত কিছু ত্রুটি প্রেক্ষাগৃহের শব্দ পরিবেশগত কিছু বিভ্রাটের বাইরে নট-নির্দেশক হরিমাধব মুখোপাধ্যায় হৃদয়-বুদ্ধির সুষম স্পর্শে এক কারু-খচিত উদ্দীপক প্রযোজনা উপহার দিয়েছিলেন। ঘনকালো অন্ধকার চিরে একটা আলোর বিচ্ছুরণ, সঙ্গে ডুম-ডুডুম ঢাকের বাদ্যি। শুরু হয়ে যায় সুখ-দুঃখ-পীড়ন আর জোটবদ্ধ পরিতি রোধের সারি সারি আলেখ্য। সেই সঙ্গে ব্রেখ্‌টকে লুকিয়ে, তাঁকে না দেখিয়েই আমাদের ঘামকান্নার হৃদয়-দোলা, বুদ্ধি-বিচারে প্রতিহিংসাপরায়ন হয়ে ওঠা কলকাতার বাবু সমাজ প্রযোজিত ব্রেখ্‌টীয় নাটকের বাঁধায় পড়ে অন্ধকারে বৃথা হাতড়ে বেড়ানো নয়।... বাঙালীর নাট্যচর্চার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-গভীরতার এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। 'নীলদর্পন', 'নবান্নে'র দেশের তৃতীয় তীর্থ রূপে প্রতিভাত হয় ত্রিতীর্থের 'দেবীগর্জন' নাটক... একে শ্রেষ্ঠ মফঃস্বল প্রযোজনার পুরস্কার দিতে পেরে 'অভিনয়' পত্রিকা যে স্বভাবতই গৌরান্বিত তাকে সন্দেহ কি?''[৮৯] আবার ত্রিতীর্থের 'দেবীগর্জন' নাট্য-প্রযোজনাটি সম্পর্কে দৈনিক বসুমতী (ছুটির পাতা, রবিবার) অভিমত প্রকাশ করেছে এইভাবে— ''একটা সময় ছিল যখন দেবীগর্জন হলেই হাউসফুল। মুক্তাঙ্গন মঞ্চেও একই দৃশ্য দর্শকদের মাথার উপর, মঞ্চে ছেঁড়া ফাটা ত্রিপল। অভিনয় চলছে। বৃষ্টি শুরু হয়েছে। দর্শকরা ছাতা মাথায় নাটক দেখেছেন। এতটুকু বিরক্তি প্রকাশ করেন নি। এ এক বিরল অভিজ্ঞতা। এক সময় দেবীগর্জন মাঠে ঘাটে শহরে রাজধানীতে, পশ্চিমবাংলার বাইরে— বিহার, উত্তর প্রদেশে, অসমে অভিনীত হয়েছে। আজ পর্যন্ত কোন জায়গায় এ নাটক ভাল লাগেনি এমন কথা শুনিনি। ১৯৭৬-এ দিশারী পুরস্কার পায় 'দেবীগর্জন' শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা ও পরিচালকের জন্য। ওই বছর উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে দিলীপ চৌধুরী এবং বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের

উদ্যোগে ‘দেবীগর্জন’ অভিনীত হয়। অভিনয় শেষে অধ্যাপক, ছাত্র এবং দর্শকবৃন্দের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দনের কথা আজও মনে পড়ে।” শততম রজনীর উপরে অভিনীত এই নাটক এখনও মাঝে মাঝে মঞ্চস্থ হয়। এরপর ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে ‘শিশুপালে’ নাট্য-প্রযোজনাটি ত্রিতীর্থের সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকের নাট্য-প্রযোজনা। দেশে জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতকে ভিত্তি করে নাটকটির অভিনয় বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৭৫ খ্রি: ত্রিতীর্থের নাট্য-প্রযোজনা প্রায় বন্ধ্যা দেখা দেয়। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে ত্রিতীর্থের নাট্য-প্রযোজনাগুলি বন্দী সম্রাট, বল্লভ পুরের রূপকথা, কর্ণকুন্তী সংলাপ প্রভৃতি। ‘বন্দী সম্রাট’ জেলার নাট্যকার শুভ্রাংশু শেখের মৈত্রের রচিত নতুন দৃষ্টিভঙ্গির ঐতিহাসিক নাটক। ‘কর্ণকুন্তী সংলাপ’ নাট্য-প্রযোজনাটিতে তিনু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুষমা ভৌমিকের অভিনয় সু প্রশংসিত হয়। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে এই সংস্থা ‘পরবাস’ নাটকটি প্রযোজনা করে। আবার ১৯৭৬-৭৭ খ্রিস্টাব্দে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে বালুরঘাটে এসে একদিনের জন্য গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণকে কেন্দ্র করে স্থানীয় আঞ্চলিক ভাষায় সত্যরঞ্জন তালুকদারের লেখা অবলম্বনে ১৫ মিনিটের উপযোগী করে হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের নাটক ‘নতুন আলো’ রেকর্ড করা হয়। এবং আকাশবাণীর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নাটকটির প্রচার হয়। কলকাতার আগেই ব্রেখটের গ্যালিলিও (লেখক ব্রেখ্ট, অনুবাদক নীহার ভট্টাচার্য ও সুভাষ চট্টোপাধ্যায়, নাট্যকার হরিমাধব মুখোপাধ্যায়) ত্রিতীর্থ ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে বালুরঘাটে মঞ্চস্থ করেছে। অর্থাৎ কলকাতাকে পেছনে ফেলে বালুরঘাটের ত্রিতীর্থ এই নাটকটি প্রযোজিত করে। এই প্রসঙ্গে ‘গ্রাম থিয়েটারের তিন দশক: উত্তরবঙ্গ’ প্রবন্ধে দীপায়ন ভট্টাচার্য যথার্থ মূল্যায়ন করে বলেছেন— “তৎকালীন কলকাতার 'talk of the town' দ্য লাইফ অফ গ্যালিলিও গ্যালিল্যেই— শম্ভু মিত্র বনাম বহুরূপী দ্বৈরথ মুখরিত করে তুলেছিল— সেই নাটকও প্রথম মঞ্চস্থ করে বালুরঘাট ত্রিতীর্থ ১৯৭৮ এ, অন্যতম মুখ্য উত্তরবঙ্গীয় থিয়েটার।”[৯০] ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে প্রযোজিত ‘ক্ষুরস্য ধারা’ ত্রিতীর্থের বলিষ্ঠ নাট্য-প্রযোজনা। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে ত্রিতীর্থ নাট্যসংস্থার নাট্য-প্রযোজনা মহাশ্বেতা দেবীর ‘জল’ হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের পরিমার্জনায় অসামান্য মঞ্চ সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। ১৯৮২ থেকে ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত প্রায় এক দশক ধরে ত্রিতীর্থের শ্রেষ্ঠতম নাট্য-প্রযোজনা অভিজিৎ সেনের ‘দেবাংশী গল্পের’ উপন্যাসের কাহিনী অবলম্বনে হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের লেখা নাটক ‘দেবাংশী’। এই নাট্য-প্রযোজনাটিতে তিনু বন্দ্যোপাধ্যায় অবিস্মরণীয় অভিনয়-প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। এরপর ত্রিতীর্থ ‘বিছন’ নাটকটি হিন্দি ভাষায় প্রযোজনা করে মফস্বল বাংলায় নাট্যচর্চার ধারায় আর একটি নতুন পথের দিক নির্দেশ করে কাণ্ডারীর ভূমিকা পালন করেছ। ‘চিরকুমার সভা’ রবীন্দ্র নাট্যচর্চার সারস্বত দৃষ্টান্ত স্বরূপ ত্রিতীর্থের নাট্যানুশীলনের একমাত্র ফসল হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

ত্রিতীর্থের নিরলস ও অদম্য ইচ্ছাশক্তি, নাট্যশিল্পের প্রতি গভীর ভালোবাসার স্বতঃস্ফূর্ত নাট্যপ্রয়াসের পাশাপাশি এই নাট্যসংস্থার মঞ্চকৃতি উত্তরবঙ্গের মঞ্চ আঙ্গিকে একটি বলিষ্ঠ স্বাক্ষর উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। এর প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ লক্ষ করা যায় এমন বেশ কিছু প্রতিভাবান নাট্যশিল্পী, নাট্যকার এবং নাট্য পরিচালকের জন্ম, বিকাশ ও বৃদ্ধি হওয়ার এবং নাট্য পরিণতিতে সমগ্র উত্তরবঙ্গে ব্যাপক নাট্যচর্চার প্রসার ও উৎকর্ষতার উজ্জ্বল নিদর্শন তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে। একথা উল্লেখের দাবি রাখে যে, ত্রিতীর্থের অধিকাংশ নাট্য-প্রযোজনাই তার নিজস্ব নাট্যকারদের লেখা মৌলিক বা রূপান্তরিত নাটক— পাণ্ডুলিপির সার্থক মঞ্চায়ণের উপর ভিত্তি করে বাস্তবায়িত হয়েছে। এছাড়া কয়েকটি নাটক অবশ্য ইতিমধ্যে মুদ্রণের যোগ্যতাও অর্জন করেছে। ১৯৭২ খ্রি: ত্রিতীর্থের নাট্যকার নীহার ভট্টাচার্য জার্মাণ ভাষা রপ্ত করার সুবাদে ত্রিতীর্থের জন্য দুটি বিশ্বখ্যাত জার্মান নাটক রূপান্তরিত করেন— 'তিন বিজ্ঞানী' এবং 'ভাঙাপট' ত্রিতীর্থের সু অভিনেতা সত্যরঞ্জন তালুকদার উক্ত 'ভাঙাপট' নাটকটি উত্তরবঙ্গের গ্রামীণ কথ্য ভাষায় (পশ্চিম দিনাজপুরের আঞ্চলিক ভাষায়) রূপান্তরিত করেন। এবং এই নাটকটি ত্রিতীর্থ খুব সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করে। পরবর্তীতে নীহার ভট্টাচার্য ত্রিতীর্থের মঞ্চায়নের জন্য গ্যালিলিও অনুবাদ করেন এবং 'মঙ্গলাচরণের বিবাহ' নামে আর একটি জার্মান নাটক রূপান্তরিত করেন। ত্রিতীর্থের সদস্য সুভাষ চট্টোপাধ্যায় আলবেয়ার কামুর 'দ্য জাস্ট' রূপান্তরিত করেন। সেই সঙ্গে শুভ্রাংশু শেখর মৈত্র তাঁর মৌলিক নাটক 'বন্দী সম্রাট', রূপান্তরিত নাটক 'অর্থ মনর্থম' ত্রিতীর্থকে উপহার দেন। নির্মলেন্দু তালুকদার ত্রিতীর্থের জন্য 'ওম' এবং 'ঠাকুর্দা' নামে দুটি নাটিকা লিখেছেন। হরিমাধব মুখোপাধ্যায় অভিজিৎ সেনের গল্পের কাহিনী অবলম্বনে লেখেন দেবাংশী, মহাশ্বেতা দেবীর গল্প অবলম্বনে লেখেন 'জল', স্বর্ণকমল ভট্টাচার্যের সূত্র ধরে 'তেভাগার' উপর লিখলেন 'মন্ত্র শক্তি' নাটক। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প অবলম্বন করে 'বন্দুক', আশাপূর্ণা দেবীর গল্প সূত্রে 'অনিকেত', শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গল্পের কাহিনি অবলম্বনে 'সন্ন্যস্ত' এবং মৌলিক নাটক 'খারিজ' লেখেন।

রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা' ও 'বিনেপয়সার ভোজ' অবলম্বনে 'অর্ধচন্দ্র' ও 'ভোজন দক্ষিণা', শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশ কাহিনী সূত্রে 'অগ্নিশুদ্ধ', সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহের 'বহিপীর' গল্প অবলম্বনে 'পীরনামা' লেখেন। রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটক দিনাজপুরের স্থানীয় আঞ্চলিক উপভাষায় লেখেন প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দে পাঠ করা হয় এবং পরবর্তীকালে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজনে বালুরঘাট ক্ষণিকালয় আমন্ত্রিতদের সামনে এই নাটকটি পঠিত হয়।[৯১] এ প্রসঙ্গে হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের একটি মূল্যবান মন্তব্য এখানে তুলে ধরা হল— ''দলের প্রয়োজনেই আমি নাট্যরচনায় হাত দিই। এই কাজ করতে গিয়ে উত্তরবাংলার পরিবেশ,

পরিপার্শ্বে মানুষ সম্পর্কে সচেতন থাকার চেষ্টা করেছি। উত্তরবঙ্গ আমার ধাত্রী দেবতা, এ সত্য যে আমি কখনও ভুলিনি আমার সীমিত সংখ্যক রচনা তার প্রমাণ দেবে।"[৯২]

১৯৯৬-১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ত্রিতীর্থ উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে, শহরের মঞ্চেও সামাজিক পূর্ণাঙ্গ নাটক 'খারিজ' সফলতার সঙ্গে মঞ্চস্থ করে। অভিনেতা-পরিচালক হিসাবে হরিমাধব মুখোপাধ্যায়, অভিনেতা হিসাবে তিনু বন্দ্যোপাধ্যায় দিশারী এক অন্যান্য পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। এমনকি দলগতভাবেও ত্রিতীর্থ অসংখ্য পুরস্কারে সম্মানিত হয়। সেই সঙ্গে শ্রেষ্ঠ নাট্য-প্রযোজনার জন্য ত্রিতীর্থ নাট্য একাডেমীর প্রশংসাপত্র পেয়েছে।

ত্রিতীর্থ নাট্যবিষয় নিয়ে মাঝে মাঝে নানা সেমিনারের আয়োজন করে। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে ২৭শে নভেম্বর বালুরঘাট গোবিন্দাঙ্গন কল্যাণ মঞ্চে নাটক সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়, সে আলোচনাসভায় যোগ দেন চেতনার অরুণ মুখোপাধ্যায় নাট্যতীর্থের দীপক রক্ষিত এবং সাংবাদিক শুভ জায়ারদার। অরুণ মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করে বলেছেন— ''নাট্যদর্শনের ক্ষেত্রে গ্রুপথিয়েটারের দ্বন্দ্ব জনিত পরিস্থিতি আছে।" স্থানীয় নাট্যরসিক ও নাট্যমোদি দর্শক তথা জনগণের নাট্য পিপাসা মেটানোর জন্য বহিরাগত নাট্যদল নিয়ে এসে এবং নাট্য-প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় পরিচালনা করার মাধ্যমে নতুন নতুন প্রতিভার অন্বেষণের প্রয়াস করে থাকে। ত্রিতীর্থ প্রতিবৎসর ২৬শে আগস্ট বর্ষপূর্তি উৎসব বেশ যত্নসহকারে উদ্‌যাপন করে। এই অনুষ্ঠানে ত্রিতীর্থ প্রতি বৎসরই জেলা এবং জেলার বাইরে প্রতিভাসম্পন্ন বিশিষ্ট নাট্যকর্মী এবং নাট্যভিনেতাদের সংর্বধনা জ্ঞাপন করে। ত্রিতীর্থ নাট্যসংস্থার তিনজন নাট্যকার রয়েছেন। এর ফলে স্বাভাবিক ভাবেই এই নাট্যসংস্থা নিজস্ব পছন্দ মতো নাটক সহজে বেছে নিতে পারে। এছাড়াও নিজস্ব মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ, প্রায় স্বয়ং সম্পূর্ণ আলোর সরঞ্জাম, একজন নির্দিষ্ট নাট্যপরিজালক ও কিছুটা আর্থিক সচ্ছলতা থাকায় এই নাট্যসংস্থাকে নিশ্চিন্তভাবে নাট্যচর্চার সুযোগ করে দিয়েছে। ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে ত্রিতীর্থ রজত জয়ন্তী উৎসব পালন করেছে। যা সমগ্র বাংলার সমগ্র নাট্যচর্চার প্রেক্ষাপটে একটি মফস্বল নাট্যসংস্থার কাছে এটি অবশ্যই যথেষ্ট সম্মান ও গৌরবের বিষয়। হীরেন্দ্রকুমার রায়, গ্রুপ থিয়েটার, ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আগস্ট-অক্টোবর' ৮৪ তে ত্রিতীর্থের 'দেবাংশী' নাট্য-প্রযোজনার উপর যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ অভিমত প্রকাশ করেছেন— ''ত্রিতীর্থ, বালুরঘাট, এর আগে বেশ কয়েকবার তাঁদের নতুন প্রযোজনার সম্ভার নিয়ে হাজির হয়েছেন শহর কলকাতার দর্শকের কাছে। তাঁদের বলিষ্ঠ প্রযোজনাগুলিকে এখানকার মানুষ নিয়েছেন মনে প্রাণে। ফলে কলকাতার দর্শকের কাছে বালুরঘাটের ত্রিতীর্থ আজ আর অপরিচিত নাম নয়, 'দেবাংশী'র মূল বক্তব্য এমন কিছু জটিল নয়, একটা সরল গল্প ধরে নাটক এগিয়েছে। দেবতা যখন কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি হন, তখন সে মানুষে উন্নীত হয়। আসলে 'দেবাংশী'

(দেবতার অংশ) মানুষের সংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করে তাকে সচেতন করে তুলতে চেয়েছে। অতিপ্রাচীন কাল থেকে আমাদের রক্তের সঙ্গে আজকের বাস্তববাদের সংঘাত ঘটে, আর তখনই 'দেবাংশী' হয়ে ওঠে নাটক— যার দর্পণে ফুটে ওঠে দেবত্ব থেকে মনুষ্যত্বে উত্তরণের এক সুস্পষ্ট চলচ্ছবি।"

দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'অভিনয়' পত্রিকা, চতুর্থ বর্ষ, সংখ্যা-৬, সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৭৪, নির্বাচিত নাট্য-সমালোচনা অংশে নিজস্ব প্রতিনিধির পক্ষ থেকে ত্রিতীর্থের কলকাতায় নাট্য-প্রযোজনার বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করে জানিয়েছেন— ''বালুরঘাটের 'ত্রিতীর্থ' তাঁর প্রযোজনাগুলির মাধ্যমে সত্য-শিব-সুন্দরের এক অপরূপ তীর্থ-প্রতিমা গড়ে দিয়ে গেলো কলকাতার নাট্যামোদী জনতার মানব-মন্দিরে। এদের সাম্প্রতিকতম রেপাটরিতে ছিলো পর্বের প্রযোজনা নীহার ভট্টাচার্য রূপান্তরিত ডুরেনম্যাটের 'তিন বিজ্ঞানী' ও ক্রাইষ্টের 'ভাঙাপট' আর সেই সঙ্গে ডুরেনম্যাটের অনুসরণে রচিত 'মঙ্গলাচরণের বিবাহ' এবং নবান্ন-স্রষ্টা বিজন ভট্টাচার্যের মৌলিক সৃষ্টি 'দেবীগর্জন'। প্রেম-অপ্রেম তত্ত্বের 'মঙ্গলাচরণের বিবাহ' ত্রিতীর্থ গোষ্ঠীর প্রযোজনার ছাপ নিয়েও সেই সব দর্শকদের তেমন প্রভাবিত করতে পারেননি, যাঁরা পূর্ববর্তী 'ভাঙাপট' ও 'তিন বিজ্ঞানী' দেখে ইতিপূর্বেই আপ্লুত হয়েছেন, 'ত্রিতীর্থে'র কাছে যাদের দাবী ইতিমধ্যে আরও বেড়ে গেছে। কিন্তু অবন মহলে 'দেবীগর্জন'-এ যা পাওয়া গেছে, তা আমাদের প্রত্যাশা মিটিয়ে পাল্টা দাবীর মুখোমুখি করে তুলেছে।" ত্রিতীর্থ শুরু পর্বে অর্থাৎ ১৯৬৯-১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নাটক-প্রযোজনার ক্ষেত্রে কলকাতার কিছু মঞ্চসফল নাটকের পুনঃপ্রযোজনা করলেও ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ করা যায় এই নাট্যসংস্থা তার নিজস্ব নাটক 'ভাঙাপট' এবং তিন বিজ্ঞানী'র কলকাতার কলামন্দিরে জার্মান নাট্য উৎসবে মঞ্চস্থ করে সারা বাংলা জুড়ে ব্যাপক সাফল্য লাভ করে। এবং ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বেশ কয়েকটি নিজস্ব নাটক যথা 'মঙ্গলাচরণের বিবাহ', 'বন্দীসম্রাট', 'শিশুপাল', 'ক্ষুরস্যধারা', 'গ্যালিলেও', 'জল' ইত্যাদি নাট্য-প্রযোজনা এই নাট্যসংস্থাকে আত্মনির্ভর করে তোলে এবং দল হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

'আজ রবিবার ছুটির পাতা' (দৈনিক বসুমতী) কলমটিতে পত্রকার বালুঘাট, ত্রিতীর্থের প্রযোজিত 'জল' নাটক সম্পর্কে নাট্যনির্দেশক হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের অভিমত তুলে ধরেন— ''... জলের মঞ্চটি একেবারে শুরুতে একটু বর্ণাঢ্য করার কথা ভেবেছিলাম। কিছু জিনিসপত্র সে ভাবেই তৈরি করা হতে থাকে। কিন্তু মহড়ার সময় ভাবনাটারপরিবর্তন ঘটে। ফলে একেবারে আড়ম্বরহীন সাদমাটা মঞ্চ পরিকল্পনা করা হয়। ... মঞ্চের ডানদিকে একটি উঁচু বেদী, বাঁ-দিকে দুটো নিচু বেদী— একটি দর্শকের মুখোমুখি আর একটা ডানদিকের বেদীর মুখোমুখি। Back Stage-এ

একটা উঁচু Platform রাখা হতো নদীর পাড় বোঝানোর জন্য। Platform-এর মাঝখানে ভাঙা সিঁড়ি— সেই সিঁড়ি দিয়ে মঞ্চের নিচে নেমে যাওয়া যায়। অনেকটা দূরে— একটি দৃশ্যপটে আঁকা পাহাড় বালিয়াড়ির স্তূপ এবং চরসা নদীর বিস্তীর্ণ চর। দৃশ্যপটটি অপূর্ব এঁকেছিলেন বিশ্বনাথ মহন্ত। 'জল' মহাশ্বেতার একটি ইঙ্গিত ছিল— অন্ত্যজ সমাজের মেয়েরা প্রতিদিন চরসা'র বালি খুঁড়ে গর্ত করে রেখে আসে— সারারাত সেই গর্তে একটু একটু করে জলে জমে। কাকভোরে মেয়েরা নদীর চরে সেই জল আনতে যায়। এটি মেয়েদের রান্নাবান্না করার মতো দৈনন্দিন কাজ। আমার প্রযোজনার সময় এই বিষয়টিকে একটি Ritualistic Pattern দিয়েছিলাম। প্রথম অঙ্কে বারবার কলসী মাথায় সারিবদ্ধ মেয়েদের সঙ্গীত সহ দেখানো হত। মহাশ্বেতার লেখা একটি গানের কলি আমি Refrain কিংবা Motif-এর মতো বারবার ব্যবহার করেছি—'দে জল, দে জল, দে জল'। কখনও এইকলিটি মেয়েরা মঞ্চে গাইতো, কখনো আবহে সম্মিলিত অথবা একক কণ্ঠে কলিটি গীত হত— এই গানের কথা এবং সুরটি সাধারণ হলেও এর মধ্যে এমন একটা 'Melancholy' ছিল, এমন একটি আর্তি ছিল যা বিশেষ নাট্য মুহূর্ত তৈরি করতে খুবই সাহায্য করত। এ মঞ্চ পরিকল্পনায় গ্রামের মেয়েদের কলসী মাথায় উঁচু পার থেকে ক্রমে ক্রমে নদীর চড়ায় নেমে যাওয়াটাই খুব বিশ্বাসযোগ্য মনে হত। কিছু ছোট ছোট ঝোপঝাড়ের Cut out মঞ্চের বিভিন্ন জায়গায় লাগিয়ে দেওয়া হত— এর মাঝখান দিয়ে হাঁটলে দুটো জিনিস স্পষ্ট হত। প্রথমত, চলাফেরার একটি সর্পিল গতি। ... জলের প্রথম অঙ্কের শেষ দৃশ্য ১০ জন মেয়ে কলসী মাথায় গান গাইতে গাইতে এ পথ দিয়ে নদীর পাড়ের সিঁড়ি ভেঙে যখন আস্তে আস্তে চরসার চরের দিকে এগিয়ে যেত— মনে হত অনেক পথ পেরিয়ে অনেক দূরে কোথায় তারা চলেছে জলের সন্ধানে। অবশ্য মঞ্চ পরিকল্পনার এই Format টি ত্রিতীর্থ মঞ্চ ছাড়া আমরা অন্যকোথায় এভাবে দেখাতে পারতাম না।"

'জল' নাটকটির মঞ্চায়নে ত্রিতীর্থের নাট্য-নির্দেশকের মঞ্চ-পরিকল্পনার সূক্ষ্ম জটিল ভাবনা যেমন এই পত্র-কলমে নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে, তেমনি উক্ত মঞ্চায়নে আবহ সংগীতের দিকটিও কতটা মঞ্চানুগ হয়েছে, তারও মূল্যায়ন এই পত্র-কলমে প্রকাশ লাভ করেছে— ''আবহ সঙ্গীতের ব্যাপারে মহাশ্বেতার নিজের লেখা কয়েকটি গান আমাকে খুব সাহায্য করেছিল। গানগুলোর সুর করেছিলেন পুলক সেনগুপ্ত। বেছে বেছে এই গানগুলোর কলি কখনও কণ্ঠে, কখনও যন্ত্রসঙ্গীতের মাধ্যমে নাটকের বিভিন্ন অংশে প্রয়োগ করার ফলে বাঞ্ছিত নাট্য মুহূর্ত তৈরি হত।"

'জল' নাটকটির মঞ্চ-সফলতা, সফল চরিত্রায়ণ এবং মঞ্চায়নের নান্দনিক মুহূর্ত সম্পর্কে উক্ত নাট্য-নির্দেশকের অভিজ্ঞতা উক্ত পত্র-কলমে পত্রকার তুলে ধরেছেন— ''... জলের প্রথম অভিনয়ের অভিজ্ঞতা খুবই আশাপ্রদ হল দর্শকরা নাটকটির প্রশংসা করলেন। ... ১৯৮১, জানুয়ারি

শেষে উৎসবের আয়োজন করা গেল। সমালোচক ছাড়া আমরা মহাশ্বেতাকে আলাদা নিমন্ত্রণ করলাম। মহাশ্বেতা বালুঘাটে এসে 'জল' প্রযেজনা দেখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। সমালোচকদের 'জল' ও (বালুরঘাটের স্থানীয় নাট্যকার নীহার ভট্টাচার্যের)'গ্যালিলেও' দুটি প্রযোজনাই ভালো লাগে। ... এরপর 'জল' ত্রিতীর্থ মঞ্চে এবং উত্তরবাংলার কয়েকটি জায়গায় অভিনীত হয়। সর্বত্রই প্রযোজনা দর্শকদের প্রশংসা লাভে ধন্য হয়। এরপর ১৯৮২ সালে নবীন কিশোর ও রাজু রমণ (ম্যাক্স মুলার ভবন) জ্ঞানমঞ্চে আমাদের জন্য ৬দিনের একটি উৎসব আয়োজন করেন। সেখানে 'জল' অভিনীত হয়। পত্র-পত্রিকায় জলের খুব ভালো সমালোচনা হয়। প্রায় সকলের অভিনয়ই প্রশংসিত হয়। বিশেষ করে সুভাষ চট্টোপাধ্যয়ের মাস্টার, নির্মলেন্দু তালুকদারের সন্তোষ, তিনু ব্যানার্জির ধুরা, চয়নিকা গুহরায়ের ফুলমণি, গৌতম সেনের এস ডি ও সর্বত্র সংশয়হীন প্রশংসা পায়। গ্রুপ থিয়েটারের কর্ণধাররা 'জলের' কাজ পরিকল্পনা এবং অভিনয়ের সম্পর্কে উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করেন। ১৯৮০ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত 'জলের' নিয়মিত অভিনয় হয়েছে। ... ১৯৮৯-তে থিয়েটার ওয়ার্কশপের উৎসবে কলকাতায় 'জল' করি। আনন্দের কথা সাতদিন আগেই হাউসফুল হয়ে গিয়েছিল। অনেক নাট্যামোদী টিকিটের অভাবে সেদিন প্রবল ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও আকাদেমিতে জল দেখতে পারেননি। সত্যি কথা বলতে কি জলের মতো এত Spectacular Production গ্যালিলেও ছাড়া ত্রিতীর্থ করেনি। ৪/৫টি প্রধান চরিত্র গুরুত্বে প্রায় সমতুল্য— এত Colourful, Varied mass composition আমি আগে তো নয়ই, এখনও করতে পারেনি। জলের শুরুটা যেমন Un conventional', শেষটা তেমনি আবার শুরুর Contrast। 'জল' শুরু হয় আধো অন্ধকারে — মঞ্চ জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় সমস্ত অন্ত্যজ সমাজ উর্দ্ধনেত্রে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। একটা সম্মিলিত দীর্ঘশ্বাস নিচু গ্রাম থেকে উঁচুতে ওঠে আবহে করুণ কণ্ঠে গীত হয় একটি কলি— 'আকাশে আগুন ঢালে জমিন গোঁসায়, কুথা জল, কুথা জল— পরাণ শুখায়'। মঞ্চে উপস্থিত চরিত্রগুলির সম্মিলিত কণ্ঠে ফুটে ওঠে একটা দারুণ আর্তি— 'দে জল, দে জল, দে জল, দে জল'। ড: সুধীর করণ বলেছিলেন—'এমন নগ্ন বাস্তব এবং করুণ দৃশ্য আমি মঞ্চে আগে দেখিনি।' ... প্রথম জল ডাকার দৃশ্য। মঘাই হাতে ফুল বেলপাতা নিয়ে গান গেয়ে গেয়ে জল ডাকছে, পেছনে অন্ত্যজ শ্রেণী। আরও পেছনে শহরের দুই Engineer। সন্দোষ, জিতেন এবং উৎসুক জনতা। গ্রীষ্মের দাবদাহে— অনেক পথ চলেছে মঘাই— গান গেয়ে গেয়ে। এর ফাঁকে সন্তোষ, জিতে Engineer-দের কিছু Information দিচ্ছে— এই দুটি পর্ব একই সঙ্গে মঞ্চে আনা খুবই দুঃসাধ্য ছিল। কিন্তু মঞ্চ— সেখান থেকে বাঁধ, বাঁধ থেকে নদীর চড়া, আবার মঞ্চ— একটি সর্পিল পরিক্রমণ-এর কোরিওগ্রাফি করে দুটো ব্যাপারই দেখানো হয়েছিল এবং তৃপ্তির বিষয় দর্শকের

কাছে তা বিশ্বাসযোগ্য হয়েছিল। আর একটি মুহূর্ত— অন্ত্যজ শ্রেণী বাঁধ বাঁধছে— সবাই মাথায় বয়ে আনছে পাথরের টিবা। জিতেন ছাতা মাথায় কাজ তদারক করছে। হঠাৎ সন্তোষ ছাতা মাথায় মঞ্চের মাঝে এসে দাঁড়ায়, কয়েকজনকে ডেকে কথা বলে। একই সঙ্গে এ দুটো কাজ চলতে থাকে। ... আশার কথা 'জল' এখনও দর্শক দেখতে চান। আমরাও করতে চাই। বারবার করতে চাই।" (পত্রকার 'আজ রবিবার ছুটির পাতা', দৈনিক বসুমতি, 'নেপথ্যকথা: ত্রিতীর্থের জল'।)

এমনকি সাম্প্রতিক মূল্যায়নের প্রেক্ষাপটে ও গুণগত বিচারে এসব নিজস্ব নাটকের প্রযোজনা ত্রিতীর্থকে স্বাতন্ত্র্য আভিজাত্যে উত্তরণ ঘটায় এবং মঞ্চ ভাবনা, উপস্থাপনা রীতি ও প্রয়োগে নতুন চিন্তা-ভাবনার সুস্পষ্ট ছাপ পরিলক্ষিত হয়।

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে সর্বভারতীয় পূর্ণাঙ্গ নাটক প্রতিযোগিতায় 'নাট্যকারের সন্ধানে দুটি চরিত্র। অভিনয় করে হরিমাধব মুখোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা ও শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে 'দেবীগর্জন' নাটকের শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা ও পরিচালনার জন্য হরিমাধব মুখোপাধ্যায় দিশারী পুরস্কার (উত্তরবঙ্গ বিভাগ)-এ সম্মানিত হন। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের ১১ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত রাজ্য-নাট্যোৎসবে গিরিশ মঞ্চে (কলকাতা) 'বিছন' নাটকের অভিনয় এবং বিশিষ্ট অভিনেতা হিসেবে হরিমাধব মুখোপাধ্যায় পুরস্কার লাভ করেন। এরপর তিনি কাঞ্চনজংঘা পুরস্কার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃশ্য ও চারুকলা একাডেমী পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছেন। ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে নান্দীকারের জাতীয় নাট্যমেলায় বিশেষ সম্মান লাভ করেন। দক্ষিণ দিনাজপুর তথা বংলার স্বনামধন্য ও যশস্বী নট-নাট্যকার, নাট্য-নির্দেশক ও পরিচালক হরিমাধব মুখোপাধ্যায় ২০০৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে 'সঙ্গীত নাটক একাডেমি' পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে মহামান্যা রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাটিল হরিমাধব মুখোপাধ্যায়কে তাঁর সৃজনশীল নাট্যকর্ম তথা সারা জীবন ধরে নাট্য অবদানের জন্য বিশেষ পুরস্কারের দ্বারা সম্মানিত করেছেন। এর ফলে বালুরঘাট তথা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নাট্যচর্চা বাংলা নাট্যচর্চার ধারায় তথা বাংলা নাটকের ইতিহাসে স্বীকৃতির মর্যাদা লাভ করে। এরপর বর্তমান রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ২০১২ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারিতে হরিমাধব মুখোপাধ্যায় 'বঙ্গবিভূষণ' পুরস্কার লাভ করেন।[১৩৩] ১৯৬৯ -২০১৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত 'ত্রিতীর্থ নাট্যসংস্থা' প্রযোজিত ও পরিচালিত নাট্য-প্রযোজনার পরিসংখ্যান সংক্রান্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হল—

১. পুতুল খেলা
২. বৃষ্টি বৃষ্টি
৩. এবং ইন্দ্রজিৎ
৪. প্রতিদিনের নায়ক (একাঙ্ক)
৫. অমৃতস্য পুত্রাঃ
৬. বিশে জুন
৭. শের আফগান
৮. রাজযোটক

৯. নাট্যকারের সন্ধানে
ছ'টি চরিত্র
১০. বিজ্ঞাপন
১১. করুণা ক'রো না
১২. সঙ্কট (একাঙ্ক)
১৩. চোখের আলো (একাঙ্ক)
১৪. ছুটির খেলা
১৫. মঞ্জরী আমের মঞ্জরী
১৬. তিন বিজ্ঞানী
১৭. ভাঙ্গাপট
১৮. দেবী গর্জন
১৯. শিশুপাল
২০. মঙ্গলা চরণের বিবাহ
২১. বহুরূপী (একাঙ্ক)
২২. বন্দীসম্রাট
২৩. নতুন আলো
(বেতার নাটক)
২৪. বল্লভপুরের রূপকথা
২৫. কর্ণ কুন্তী সংলাপ
২৬. পরবাস
২৭. পচিশ পঁচাত্তর (বেতার নাটক)
২৮. গ্যালিলেও
২৯. ক্ষুরস্য ধারা
৩০. জল
৩১. তুঘলক
৩২. দেবাংশী
৩৩. ওম (একাঙ্ক)
৩৪. কচি সংসদ (একাঙ্ক)
৩৫. বিছন (হিন্দি)
৩৬. কেমনে তারে মিছা বলা
যায় (একাঙ্ক)
৩৭. চিরকুমার সভা
৩৮. মন্ত্রশক্তি
৩৯. অনিকেত
৪০. ঠাকুরদা (একাঙ্ক)
৪১. বিপুলৌষধি
৪২. অর্থম অনর্থম
৪৩. বোধোদয় (একাঙ্ক)
৪৪. উপলব্ধি (একাঙ্ক)
৪৫. পণন
৪৬. অন্তর্ধান
৪৭. পত্রশুদ্ধি (প্রথম একাঙ্ক
পরে পূর্ণাঙ্গ)
৪৮. মাতৃতান্তিক
৪৯. প্রপন্না
৫০. উত্তরণ
৫১. চৌর্যাপদ (একাঙ্ক)
৫২. আক্কেল সলামী (একাঙ্ক)
৫৩. অসমাপিকা
৫৪. লুকোচুরি
৫৫. অন্যমনস্ক চোর
৫৬. করকূহক
৫৭. যদি এমন হত (বালুরঘাট
উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের দ্বারা
অভিনীত)
৫৮. সরল অংক

৫৯. বীজমন্ত্র
৬০. অচিন সখা (শ্রুতিনাটক)
৬১. পীরনামা
৬২. ভাঙাপট (পুনর্নির্মিত)
৬৩. অর্ধচন্দ্র (পূর্ণাঙ্গ)
৬৪. অগ্নিশুদ্ধি
৬৫. ভগীরথের মূর্তি
৬৬. ভুলো চোর
৬৭. বানপ্রস্থ
৬৮. পোকা মাকড়ের কুটুম
৬৯. ভোজন দক্ষিণা
৭০. ব্যাপিকা বিদায়
৭২. নিকট গঙ্গা [৯৩]

ত্রিতীর্থ পূর্বের প্রযোজিত নাটকগুলি নতুন অভিনেতা ও অভিনেত্রীর দ্বারা নতুন ভাবে মঞ্চস্থ করছে। আবার নতুন নতুন নাটকও যথেষ্ট নিপুনতায় মঞ্চসফল করেও অভিনীতি হচ্ছে। ত্রিতীর্থের নিজস্ব স্বনামধন্য ও বিশিষ্ট নট-নাট্যকার হরিমাধমব মুখোপাধ্যায় গোবিন্দ অঙ্গনে অনুদিত নাটক 'ভাঙাপট' নাট্য-প্রযোজনা সম্পর্কে বলেছেন— "Onece master piece, a block-buster redone-why? perhaps my fad for fun and laughter a laughter-so fresh without interding to hurt any one-hope those who want to laugh may find it likeble. As a director of the past actors I can assert that the new production is notareplica of the past. Only the giant of actress like chhanada, satyada, Satinda , Bishuda, Probhasda are no more who with their acting ability are irreplaceable. I realy miss them. But the young stars are also dependable actors who will. I am sure will prove their worth. Hope the viewers will find them acceptable. My appeal to the viewers is to encourage them to go on." ত্রিতীর্থ তাদের প্রেক্ষাগৃহের করুণ অবস্থার মধ্যেও আজও সমানভাবে নাট্যপ্রযোজনা করে চলেছে। ত্রিতীর্থ নাট্যসংস্থা ২০১৪-২০১৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যে নাট্য-প্রযোজনাগুলি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করে দর্শকদের কাছে সুপ্রশংসিত হয়, সেগুলি হল— হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'বাণপ্রস্থ' ও 'ভোজন দক্ষিণা', ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের ২৬ আগস্ট গোবিন্দ সরকারের পরিচালনায় 'পোকামাকড়ের কুটুম', ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের ২৩ শে আগস্ট হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'ব্যাপিকা বিদায়' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মোটকথা নাট্যচর্চার ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে ত্রিতীর্থ অবশ্যই উদাহরণযোগ্যও বটে। এইসব নাট্য-প্রযোজনার মধ্য দিয়ে ত্রিতীর্থ এ জেলার নাট্যচর্চার সাবলীল প্রবহমান গতিকে

সঞ্চারিত করে আজও অটুট ও অব্যাহত রেখে নাট্যচর্চা তথা নাট্যাভিনয়ের ধারাকে বলিষ্ঠ ও চলমান রেখেছেন, যা জেলা তথা মফস্বল বাংলার নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে নজিরবিহীন পথ প্রদর্শক হয়ে অব্যাহত ধারায় এগিয়ে চলেছে। মোটকথা জেলার নাট্যচর্চা তথা নাট্যাভিনয় ও নাট্যমঞ্চকে বিশেষ মর্যাদার আসনে বসিয়ে স্বমহিমায় উজ্জ্বল করে তুলেছে। ফলে দিনাজপুরের নাট্যচর্চা বাংলার নাট্যচর্চার জগতে গৌরবের আসন অলংকৃত করেছে।

সত্তরের দশকের প্রথম পর্বে বালুরঘাট শহরে আরও কিছু নাট্যসংস্থার বিভিন্ন নাট্য-প্রযোজনা দর্শক মহলে যথেষ্ট আলোচিত হয়ে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত অভিনেতা সুজিত ভট্টাচার্য ও আরও কয়েকজন অভিনেতা এই সংস্থা একত্রিত হয়ে 'লোকায়ন' নামে নবীনতম গ্রুপ থিয়েটার সংস্থা গড়ে তোলেন। এই সংস্থা অভিনয়ে এবং মঞ্চ পরিকল্পনায় অভিনবত্ব আনার তীব্র প্রয়াসে রত ছিল। এরা নিজেরাই নাটক লিখেছেন যেমন— 'চেতনা', 'দি গ্রেট ম্যাজিশিয়ান'। এই সংস্থা প্রযোজনায় সুজিত ভট্টাচার্য রচিত ও নির্দেশিত 'চেতনা' নাটকটি নাট্যমন্দিরে মঞ্চসাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। এবং এই নাটকের সাবলীল অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করে তুলেছিল। মোটকথা নাটকটি বক্তব্যে এবং অভিনয়ে উন্নতমানের প্রয়াস। 'দি গ্রেট ম্যাজিশিয়ান' নাটকে বর্তমান যুব-মানস প্রতিফলিত হয়েছে এবং উচ্চারিত হয়েছে যুগসংকটের বীজমন্ত্র। এরপর 'লোকায়ন' যথেষ্ট মুন্সিয়ানার সঙ্গে সুজিত ভট্টাচার্যের নির্দেশনায় ও পরিচালনায় সর্বশেষ প্রযোজনা অগ্নিগর্ভ লেনা উপস্থাপনা করে দর্শকমহলে বহুল প্রশংসিত হয়। এই নাট্য-প্রযোজনায় চরিত্র ভূমিকায় ছিলেন প্রদোষ মিত্র, সুজিত ভট্টাচার্য, শিবানী চক্রবর্তী, কৃষ্ণা চক্রবর্তী, দিলীপ চক্রবর্তী প্রমুখ। এই নাট্যসংস্থা নতুনের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বিশ্বাসী ছিল। এমনকি লোকায়ন নাট্যসংস্থা খুব কম সময়ের মধ্যে তার দর্শক তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে, যা ছিল বালুরঘাট তথা জেলার নাট্যচর্চায় অভাবনীয় ও চমৎকার বিষয়। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে ১৫ই সেপ্টেম্বর বালুরঘাট শহরের কয়েকজন নাট্যপ্রেমী তরুণ গতানুগতিক নাট্যধারার চিন্তা ও চেতনার পথ থেকে সরে এসে গড়ে তুললেন 'তূণীর' নাট্যসংস্থা যা ছিল সে সময়ের উপযোগী একটি গ্রুপ থিয়েটার সংস্থা। এই নাট্য-সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সদস্যরা হলেন— সুজিত ভট্টাচার্য, জয়ন্ত বিশ্বাস, প্রদোষ মিত্র, কৃষ্ণা চক্রবর্তী দেশাশিষ চক্রবর্তী। কল্যাণ দাস, শোভন সমাজদার প্রমুখ। এঁদের মধ্যে সুজিত ভট্টাচার্য ছিলেন কর্ণধার তথা কেন্দ্রমণি। তবে অধুনালুপ্ত 'লোকায়ন' নাট্যসংস্থা থেকে এবং যাত্রিক থেকে কল্যাণ দাস ও জয়ন্ত বিশ্বাস এসে 'তূনীর' নাট্যসংস্থায় যোগদান করেছিলেন। এই নাট্যসংস্থা ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে সুজিত ভট্টাচার্যের পরিচালনায় 'শতাব্দীর পদাবলী' নামে প্রথম নাট্য-প্রযোজনা করে। তূনীরের পরবর্তী নাট্য-প্রযোজনা হল— 'ছুটির ফাঁদে', 'গিনিপিগ', 'দেওয়ালে পিঠ রেখে' প্রভৃতি। এই নাট্য-প্রযোজনাগুলির পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন

সুজিত ভট্টাচার্য। এরপর এই সংস্থার প্রযোজনায় প্রদ্যোষ মিত্রের নির্দেশনায় ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে 'অগ্নিগর্ভ' হেকেমপুর মঞ্চস্থ হয়। এই গ্রুপ থিয়েটার সংস্থা চার বৎসরের মধ্যেই অর্থাৎ ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে অবলুপ্ত হয়। এর কারণ স্বরূপ জানা যায়, এই সংস্থার পরিচালক সুজিত ভট্টাচার্যের অকাল প্রয়াণের ফলের তূনীরের অকাল অবলুপ্তি ঘটে। সুজিতের মৃত্যুর পর তাঁর প্রাণপ্রতিম সংস্থার সদস্যগণ ওরই লেখা 'চেতনা' বিদেহী নাট্যপ্রেমীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য মঞ্চস্থ করেন।

তূনীর গ্রুপ থিয়েটার সংস্থা ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তূনীরের মঞ্চসফল নাট্য-প্রযোজনা— পাঁকাল', একা একা, গোধূলী বেলায়, শেষরক্ষী, সন্ন্যস্ত প্রভৃতি সামাজিক পূর্ণাঙ্গ ও একাঙ্ক নাট্য-প্রযোজনা। তূনীর নাট্যসংস্থা এই নাটক-প্রযোজনাগুলির মাধ্যমে নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের জয়বাদ্য ঘোষণা করে প্রমাণ করেছে যে তার সুর আলাদা। এই নাট্যসংস্থা একটা বিষয়ে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয় এই মর্মে যে, ভালো নাট্যপ্রযোজনার জন্য নিজেদের প্রতিভাকে কাজে লাগাতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে সংস্থার নাট্যশিল্পী ও নাট্যকার ভাস্কর চট্টোপাধ্যায় 'শেষরক্ষী' (অনুবাদিত) নাটক লেখেন এবং এই নাটকটি সংস্থার মঞ্চসফল নাট্য-প্রযোজনার মধ্য দিয়ে নিঃসন্দেহে দর্শকদের প্রশংসাধন্য হয়ে উঠেছিল। এরপর তূণীর জেলার বিশিষ্ট নাট্যকার হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের 'সন্ন্যস্ত' নাট্য-প্রযোজনা করে যথেষ্ট সফল্য লাভ করে। এই নাট্যপ্রযোজনাগুলির চরিত্র ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। জয়ন্ত বিশ্বাস, প্রদোষ মিত্র, ভাস্কর চট্টোপাধ্যায় জিষ্ণু নিয়োগী প্রমুখ। তূণীর নাট্যসংস্থার মোট ২০ জন নাট্যশিল্পীর মধ্যে ৬ জন মহিলা শিল্পী ছিলেন। জেলার ছোট এই নবীন নাট্যসংস্থা শেষলগ্নে শুভ্রাংশু শেখর মৈত্রের রচিত 'পদ্মাবতীর কথা' নাটকটি ভবেন্দু ভট্টাচার্যের বলিষ্ঠ পরিচালনায় ও নতুন আঙ্গিকে প্রযোজনা করে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে। সম্প্রতি ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের ২৬ শে অক্টোবর মোহর চক্রবর্তীর পরিচালনায় 'জলপোকা' নাট্য-প্রযোজনা করে 'তূণীর' ব্যাপক প্রশংসিত হয় ও বিশেষ খ্যাতির অধিকারী হয়ে ওঠে। যার ফলে এই নাট্যসংস্থা জেলার নাট্যচর্চার প্রবহমান গতিকে ক্রিয়াশীল রাখতে তৎপর ভূমিকা পালন করে চলেছে। 'অভিযাত্রী' নাট্যসংস্থা, লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ, প্রগতি নাট্যসংস্থা, রূপান্তর নাট্যসংস্থা, যাত্রিক নাট্যসংস্থা, পূর্বাশা নাট্যসংস্থা, আত্রেয়ী নাট্যসংস্থা তাদের নাট্য-মঞ্চায়নের প্রয়াসের মধ্য দিয়ে বালুরঘাটের নাট্যচর্চার ইতিহাস তথা উত্তরবঙ্গের নাট্যচর্চার ইতিহাসেও বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই সফল গ্রুপ থিয়েটার সংস্থা থেকে জেলার বিশিষ্ট ও উল্লেখযোগ্য অভিনেতাগণ দেবল রায়, সুনীল খাঁ, পরিতোষ দাস প্রমুখেরা উঠে এসেছেন। 'অভিযাত্রী' নাট্যসংস্থা, বালুরঘাট— এই নাট্যসংস্থাটি নাট্যপ্রযোজনা 'এ আমি চাইনি' দর্শক মহলে যথেষ্ট সাড়া ফেলে দেয়। 'প্রগতি' গ্রপ থিয়েটার সংস্থাও সীমিত সাধ্যের মধ্যে অবস্থান করে বালুরঘাটসহ দক্ষিণ দিনাজপুরের ঐতিহ্য

মণ্ডিত নাট্য-ইতিহাসে নিজেদের মঞ্চায়ন গৌরবের স্বর্ণোজ্জ্বল নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছেন। প্রগতির সফল ও উল্লেখযোগ্য নাট্য-প্রযোজনা 'গরমভাত', 'নৈশভোজ', 'কলকাতার হ্যামলেট', 'রণক্ষেত্রে আছি', 'হিমালয়ের চেয়ে ভারি' প্রভৃতি দর্শকধন্য হয়ে আছে। এই নাট্যসংস্থার একঝাঁক তরুণ নাট্যকর্মী বালুরঘাটের নাট্যচর্চা তথা নাট্যভিনয়ে তাদের সক্রিয় তৎপরতা ও আপ্রাণ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন— যাতে করে প্রবহমান নাট্যধারায় তাঁদের নাম ইতিহাসের পাতায় স্থান করতে সক্ষম হয়। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে বালুরঘাট 'রূপান্তর' নাট্যসংস্থার আবির্ভাব ঘটে। এই নাট্যসংস্থার অন্যতম ও উল্লেখযোগ্য প্রযোজিত নাটক: 'রামের পালা', 'শূন্য শতকিয়া', 'মুচকী মঙ্গলকাব্য', 'অরুনোদয়ের পথে', 'বিবসনা', 'বৃহন্নলা', 'ইতিহাস কাঁদে', 'অমিতাক্ষর', 'সাজানো বাগান শুকিয়ে যায় না', 'জিওদ্রানো ব্রুনো', 'নগুয়েন ভেনত্রয়' (পথ নাটিকা) প্রভৃতি।

১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে ৫ই অক্টোবর বালুরঘাটের আত্রেয়ী, নাট্যসংস্থা আত্মপ্রকাশ লাভ করে। এই নাট্যসংস্থার প্রথম নাট্যপ্রয়াসের নিদর্শন হিসেবে জ্যোতির্ময় বসুর সামাজিক একাঙ্ক নাটক 'আলোয় ফেরা', শ্রেষ্ঠ নাট্য-প্রযোজনার স্বীকৃতি অর্জন করে। এরপর সামাজিক একাঙ্ক-নাটক 'দুর্গাবধকাব্য' নাট্য-প্রযোজনা 'মালদহ জেলা একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা'য় শ্রেষ্ঠ নাট্যপ্রযোজনার স্বীকৃতি পেয়েছিল। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে আত্রেয়ী নাট্যসংস্থার মনোজমিত্রের সামাজিক পূর্ণাঙ্গ নাটক 'কেনারাম বেচারাম' নাট্য-প্রযোজনাটির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ ঘটে। আত্রেয়ী নাট্যসংস্থা এই নাট্য-প্রযোজনার মাধ্যমে সদর মহকুমা শহরে অভূত-পূর্ব প্রশংসা লাভ করে। উক্ত নাট্য-প্রযোজনা উত্তরবঙ্গ সংবাদ পত্রিকায় প্রশংসিত হয় এবং সারা উত্তরবঙ্গে 'আত্রেয়ী' নাট্যসংস্থা বিশেষভাবে পরিচিতি লাভ করে। বালুরঘাট শহরে দর্শক সাধারণের অনুরোধে এই নাট্য-প্রযোজনাটি বেশ কয়েকবার অভিনীত হয়। আত্রেয়ীর উল্লেখযোগ্য নাট্য-প্রযোজনাগুলি হল: 'নরক গুলজার', 'পদ্মানদীর মাঝি', 'ডাইন' প্রভৃতি ১০ টি সামাজিক পূর্ণাঙ্গ নাটক এবং ১৫টি সামাজিক একাঙ্ক নাটকের প্রযোজনা। সংগৃহীত তথ্যসূত্রে জানা যায় যে, এই গ্রুপ থিয়েটার সংস্থার সম্পাদক তথা পরিচালক ছিলেন বিপ্লব গোস্বামী ও কৃষ্ণা কর্মকার। এছাড়াও বাবু মিত্র, স্বপন সরকার, উৎপল দাস, প্রদীপ মিত্র প্রমুখ এই নাট্যসংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই নাট্যসংস্থার নাট্যশিল্পীদের মধ্যে প্রথমপর্বে ৮জন অভিনেতা এবং ২জন অভিনেত্রী ছিলেন। তারপর সংস্থার অভিনেতা তথা পুরুষ শিল্পীর সংখ্যা হয় ২৮ জন এবং অভিনেত্রী তথা মহিলা শিল্পীর সংখ্যা ৩ জন এসে পৌঁছায়। সংকেত নাট্যসংস্থা, বালুরঘাট— এই নাট্যসংস্থাটির মঞ্চসফল নাট্য-প্রযোজনা: 'কলকাতার হ্যামলেট' দর্শক মহলে বহুল প্রশংসিত হয়। 'হিউম্যান রাইট্স্ কনসাস্ থিয়েট্রিক্যাল গ্রুপ' (পরে এই সংস্থার নামকরণ হয় 'দর্পণ') দর্পণ নাট্যসংস্থা, বালুরঘাট— এই নাট্যসংস্থাটির প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাট্য-প্রযোজনা 'রামধাক্কা' বেশ সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হওয়ার ফলে

বালুরঘাটের দর্শকদের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগিয়ে তোলে। 'অগ্নিবীণা', বালুরঘাট— এই নাট্যসংস্থার অন্যতম নাট্য-প্রযোজনাগুলি হল— 'ভূমিকম্পের পরে', 'মৃতজনের প্রাণ', 'নিহত শতাব্দী' প্রভৃতি। এছাড়াও অন্যান্য নাট্যসংস্থাগুলিও নিজেদের সক্রিয় তৎপরতা ও উদ্যোগে অসাধারণ সাফল্যের সঙ্গে নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। তাঁদের এই নাট্য-প্রয়াসের ফলে বালুরঘাট তথা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গণ্ডী অতিক্রম করে সমগ্র উত্তরবঙ্গের নাট্যচর্চার জগতে এই সংস্থাগুলি স্বমহিমায় জায়গা করে নিতে সমর্থ হয়েছে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সদর মহকুমা শহর বালুরঘাটের নাট্যচর্চায় আশির দশকের প্রথম পর্বের অন্যতম ও উল্লেখযোগ্য নাট্যসংস্থা রূপে 'নাট্যতীর্থ' আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে মূলত নাট্যমন্দিরের সদস্যপদ ত্যাগ করে বেশ কয়েকজন অভিনেতার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নাট্যতীর্থ নামে একটি নতুন নাট্যসংস্থা তৈরি হয়। অর্থাৎ ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর নাট্যতীর্থ গড়ে ওঠে নাট্যমন্দির থেকে বেরিয়ে আসা দক্ষ অভিনেতা দেবল রায়, প্রণব চক্রবর্তী, দীপক রক্ষিত, আশিষ রায়, অজয় সাহা, পরিতোষ দাস, শ্যামা তলাপাত্র, দেবব্রত চক্রবর্তী, স্বপন নিয়োগী, মণিগুহ বকসী, সুখেন্দু চৌধুরী, শ্যামল চ্যাটার্জী, জীবেশ দাস প্রমুখ নাট্যপ্রেমীদের অক্লান্ত প্রয়াস ও সক্রিয় উদ্যোগে এবং প্রণব চক্রবর্তীর (ঝান্টু) নেতৃত্বে ও ব্যবস্থাপনায় 'নাট্যতীর্থে'র পথ চলা শুরু হয়। এই সংস্থার নামকরণ গ্রুপ থিয়েটারের আদর্শে গড়ে ওঠে। নাট্যতীর্থের দশ বৎসরের নাট্যচর্চার ফাঁকে ফাঁকে আরও বেশ কিছু নতুন নাট্যশিল্পী এখানে যোগদান করে মনোনিবেশ সহকারে নাট্যচর্চায় ব্রতী হয়েছেন। নবাগত এই নাট্যশিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সুনীল খাঁ, প্রভাস সমাজদার প্রমুখ। উত্তরবঙ্গের সীমান্ত ঘেষা একটি ছোট শহর বালুরঘাটের গ্রামীণ পরিবেশে এই নাট্যসংস্থার অপ্রত্যাশিত সংখ্যায় মহিলা শিল্পী রয়েছেন, যা মফস্বল বাংলার নাট্যচর্চায় অবশ্যই গৌরবের বিষয়। এই মহিলা শিল্পীদের মধ্যে মোনা দাস, মিলন, সুপ্রিয়া, ডলি চক্রবর্তী, শচিস্মিতা কুণ্ডু, প্রীতি সরকার, ববি চক্রবর্তী প্রমুখেরা নাট্যতীর্থের বিভিন্ন নাটকের অভিনয়ে অংশগ্রহণ করে অপরিসীম প্রশংসা লাভ করেছেন।

প্রথম দিকে এই নাট্যসংস্থার নিজস্ব কোন মঞ্চ ছিল না। তাই এই নাট্যসংস্থা নাট্যমন্দিরের মঞ্চে তাদের প্রযোজিত নাটক মঞ্চস্থ করত। পরবর্তীতে নাট্যতীর্থ স্থানীয় জেলা পরিষদ থেকে সুরেশ রঞ্জন পার্কের উত্তর দিকে ৫ কাঠা জমি লিজে পাওয়ার ফলে উক্ত জমির উপর স্থানীয় নাট্যামোদী জনসাধারণের আর্থিক সাহায্য এবং সরকারী সাহায্যে সাড়ে চারশত আসন বিশিষ্ট নিজস্ব মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ তৈরি করে। নাম হয় বালুরঘাট নাট্যতীর্থ, মন্মথ মঞ্চ। নাট্যকার মন্মথ রায়ের স্মৃতি বিজড়িত বালুরঘাটে তারই জন্মশতবর্ষে মঞ্চটিকে নাট্যতীর্থ মন্মথ মঞ্চনামে চিহ্নিত করেছেন। অর্থাৎ নাট্যতীর্থ ২০১১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ অক্টোবর নিজস্ব বাতানুকুল মঞ্চের উদ্বোধন করে। এই

নাট্যতীর্থের মঞ্চ নিয়ে বালুরঘাটে সর্বমোট ৫টি স্থায়ী মঞ্চ (প্রেক্ষাগৃহ যুক্ত) রয়েছে। তাই একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, উত্তরবঙ্গের বালুরঘাটের মতো একটি ছোট মফস্বল শহরে ৫টি স্থায়ী মঞ্চের উপস্থিতি— নাট্যচর্চার উৎকর্ষতাকেই প্রমাণ করে এবং সেইসঙ্গে জেলার নাট্যচর্চার অতীত ঐতিহ্যের পরিচয় উজ্জ্বল রূপে প্রতিভাত হয়েছে।

নাট্যতীর্থের প্রথম নাট্যাভিনয় হয়েছিল পতিরামে। এই নাট্য সংস্থাটি নির্মিত হওয়ার একমাসের মধ্যেই অর্থাৎ ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দের ৯ই নভেম্বর রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শ্রী বিনয় কুমার সাহা মহাশয়ের সম্বর্ধনা উপলক্ষে 'অগ্নিগর্ভ হেকেমপুর' ও 'পরাণ মণ্ডলের ঘর গেরস্থি' নামে দুটি একাঙ্ক নাটক মঞ্চস্থ করে বেশ দর্শক সমাদর ও বহু প্রশংসা লাভ করে। এই নাট্য-প্রযোজনা দুটি বালুরঘাটের পার্শ্বস্থ পতিরাম নামে একটি জনবহুল গ্রামের অস্থায়ী মঞ্চে যথেষ্ট সফলতার সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়। নাট্যতীর্থের প্রযোজনায় ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দানসাগর, কালাবদর, কানামামা, সাজানো বাগান, ডাক্তার ফস্টাস, য্যায়সা কি ত্যায়সা প্রভৃতি সামাজিক পূর্ণাঙ্গ নাট্য-প্রযোজনা এবং হাজার স্বপন, হরেকৃষ্ণ প্রভৃতি সামাজিক একাঙ্ক নাট্য-প্রযোজনাগুলি নাট্যতীর্থের নিজস্ব মঞ্চসহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন নাট্যমঞ্চে অভিনীত হয়। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে নাট্যতীর্থ কলকাতার শিশিরমঞ্চে 'কানামামা' নাট্য-প্রযোজনাটি মঞ্চস্থ করে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যথা স্টেটস্‌ম্যান, আনন্দবাজার, দেশ প্রভৃতিতে প্রশংসিত হয়ে আলোচনার শিরোনামে স্থান লাভ করে জেলার নাট্যচর্চার ধারাকে গৌরবান্বিত করে তোলে। এরপর ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের ১০ ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়ি বেতার কেন্দ্র থেকে নাট্যতীর্থের 'কালাবদর' নাটকটি সম্প্রচারিত হয়। মোটকথা ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নাট্যতীর্থ মোট তিনবার একাঙ্ক ও পূর্ণাঙ্গ নাট্যোৎসবের আয়োজন করে বালুরঘাট তথা উত্তরবঙ্গের নাট্যামোদি দর্শক সাধারণের মধ্যে নাট্যচর্চার সাড়া জাগিয়ে তোলে। এই সংস্থা সারাদিন ধরে নাট্যোৎসবের আয়োজনের মধ্য দিয়ে এক অভিনব পদ্ধতিতে নাট্যচর্চায় ব্রতী হয়ে নাট্যচর্চার ইতিহাস গড়ে তোলেন। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের ২৬-২৮ নভেম্বর ত্রিতীর্থ জেলার তথা বাংলার স্বনামধন্য ও প্রখ্যাত নাট্যকার মন্মথ রায় রচিত প্রথম একাঙ্ক নাটক 'মুক্তির ডাক'কে কেন্দ্র করে 'একাঙ্ক নাটকের হীরক জয়ন্তী উৎসব' তিন দিন ধরে পালন করে। তিনদিনে ৭টি একাঙ্ক নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। এই মহতী উৎসবের জন্য ত্রিতীর্থ নিখরচায় তাদের মঞ্চ ব্যবহার করার অনুমতি দেয়। এই নাট্যোৎসবে সোদপুরের ক্রান্তিকাল নাট্যগোষ্ঠীর 'যুযুধান' নাট্য-প্রযোজনাটি সবদিক থেকে শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দেয়। এই বিষয়ে মধুপর্ণীর সম্পাদক অজিতেশ ভট্টাচার্য প্রাসঙ্গিক মন্তব্য করেছেন— ''বিষয়বস্তু, অভিনয়, ট্রিটমেট সব দিক থেকেই উন্নত নাট্যকল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং শিবু রায়ের দক্ষতা এতই সহজ এবং সাবলীল যে

কখনো মনে হয়নি এদের মধ্যে কেউ অভিনয় করেছেন।" কলকাতার অরুণ মুখোপাধ্যায়ের 'চেতনা নাট্যগোষ্ঠী'র নাট্য-প্রযোজনা 'উল্কি'। তাদের এই নাট্য-প্রযোজনাটি এককথায় স্মার্ট প্রেডাকশন' তবে যেয়োর ভূমিকায় মিহির ব্যানার্জীর অভিনয় যাত্রা সুলভ। মামির ভাই-এর ভূমিকায় শিবশঙ্কর অসাধারণ অভিনয় করেছেন, মামির ভূমিকায় মঞ্জু ব্রহ্মচারী এবং তপনার ভূমিকায় স্বপ্না মিত্রের অভিনয় ব্যাপক প্রশংসিত হয়। ''নাট্যতীর্থের 'হরেকৃষ্ণ' কৌতুক ও ব্যঙ্গরস সমৃদ্ধ শ্যামল সেনগুপ্তের এই একাঙ্ক সুঅভিনয়ের গুণে ইপ্সিত নাট্যরস সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। পেল্লাক, সুবল ও মুকুন্দ দত্তের ভূমিকায় যথাক্রমে শ্যামা প্রসাদ তলাপাত্র, দীপক রক্ষিত ও আশিস রায় চমৎকার অভিনয় করেছেন।" মধুপর্ণী পত্রিকার সম্পাদক অজিতেশ ভট্টাচার্য, এই এভিমত জ্ঞাপন করেন। এরপর পর 'সংকেত' নাট্যসংস্থার একাঙ্ক নাটক 'ঝড়ের ঘোর'— নাট্যকার চন্দন সেন। টিম ওয়ার্কে আন্তরিকতা লক্ষ করা যায়। কয়েকজন অভিনেতার অভিনয় মনে রাখবার মতো। 'উত্তরবঙ্গের রাষ্ট্রীয় পরিবহন রিক্রিয়েশন ক্লাব-এর ইসলামপুর শাখার 'তৃতীয় কণ্ঠ' (রচনা রতনকুমার ঘোষ), অত্রেয়ী নাট্যসংস্থার 'দুর্গাবধকাব্য' (রচনা নিখিল কুণ্ডু) এবং রবীন্দ্রনাথের 'জুতা আবিষ্কার কবিতার উপর ভিত্তি করে একাঙ্ক নাটক 'আজব নগরের কাহিনী' (তপন চক্রবর্তীর নাট্যরূপ) তেমন মঞ্চ সাফল্য লাভ করতে পারেনি। এরপরে ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে 'নাট্যতীর্থ নাট্যোৎসব ৮৬' শিরোনামে ৭ দিনের বিশাল এক নাট্যোৎসব আয়োজন করে। এই নাট্যোৎসব কলকাতার থিয়েটার ওয়ার্কশপ, বহরমপুরের ছান্দিক, মালদার রূপরঙ্গম, রায়গঞ্জের মহিলা নাট্যদল, বালুরঘাটের ত্রিতীর্থ এবং কোচবিহারের স্টেট ট্রান্সপোর্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব অংশগ্রহণ করে। নাট্যতীর্থের এই নাট্যোৎসবে দর্শক আপ্লুত হয়ে এক সর্বাঙ্গ সুন্দর উৎসবে পরিণত হয় এবং জেলা তথা সমগ্র বাংলায় এক ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। স্বাভাবিকভাবে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে ১৮-২০ মে তিন দিন নাট্যতীর্থের ১০ম বর্ষ পূর্তি উদ্‌যাপিত হয় নাট্যোৎসবের মধ্য দিয়ে। এই নাট্যোৎসবে জেলার বিশিষ্ট নাট্যসংস্থা ত্রিতীর্থ, তূণীর, প্রগতি নাট্যসংস্থা অংশগ্রহণ করে উৎসবকে উজ্জ্বল ও মহিমান্বিত করে তোলে। সকাল ৭টা থেকে দুপুর ৩টা এবং রাত ৭টা থেকে পর্যায় ক্রমে কালাবদর, দানসাগর ও কানামামা— এই তিনটি নাট্য-প্রযোজনা করে নাট্যতীর্থ জেলার নাট্যচর্চায় একটি নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। নাট্যতীর্থের মতে নৃত্য-নাট্য সঙ্গীত এই তিনটিই একই সংস্কৃতিক ধারার অন্তর্ভুক্ত। এই বিশ্বাসের দরুণ নাট্যতীর্থে নাট্যচর্চার পাশাপাশি নৃত্য এবং সঙ্গীতচর্চার সুব্যবস্থা করে যথেষ্ট তৎপর ভূমিকা পালন করে।

নাট্যতীর্থ নাট্য-প্রযোজনার মধ্য দিয়ে নাট্য-কৃতির সমুজ্জল পরিচয় তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে নাট্যসাহিত্য এবং নাটকের উপর দর্শন-মননের দিকটিকেও আলোকিত করার জন্য 'নাট্যচিন্তা নাট্যতীর্থ' নামে একটি ত্রৈমাসিক নাট্যবিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ করে জেলা তথা উত্তরবঙ্গের নাট্যচর্চায়

এক অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির জনৈক পদাধিকারী সচিব একটি সেমিনারে মন্তব্য করে জানিয়েছিলেন যে, এই রাজ্য থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন অসংখ্য নাট্য-পত্র পত্রিকাগুলির মধ্যে যে দুটি খুব অল্প সময়েই সারা পশ্চিমবঙ্গের নাট্যকর্মীদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে, সে দুটি নাট্য-পত্রিকাই সুদূর মফস্বল থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা দুটির মধ্যে একটি হল 'আননায়ুধ'— বীরভূমের সিউড়ির 'আনন' নাট্যগোষ্ঠীর উদ্যোগে পরিচালিত, আর অন্যটি একদা পশ্চিমদিনাজপুর সম্প্রতি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সদর মহকুমা শহর বালুরঘাট থেকে প্রকাশিত 'নাট্যচিন্তা নাট্যতীর্থ'।

১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই নাট্যসংস্থার সর্বমোট নাট্য-প্রযোজনার সংখ্যা ১৫টি। নাট্যতীর্থের নাট্যপ্রযোজনার পরিসংখ্যান তুলে ধরা হল—

পূর্ণাঙ্গ নাটক	**নাট্যকার**	**পরিচালক**	**অভিনীত সংখ্যা**
১. দান সাগর ১৯৮২	দেবাশীষ মজুমদার	দীপক রক্ষিত	১৯
২. কালাবদর -১৯৮৩	শ্যামল সেনগুপ্ত	পরিতোষ দাস	১৬
৩. কানামামা-১৯৮৪	,,	দীপক রক্ষিত	১৪
৪. সাজনানো বাগান -১৯৮৫	মনোজ মিত্র	,,	১৬
৫. জীবন দর্পণ -১৯৮৬	কিরণ মৈত্র	,,	১২
৬. রবি মীনে -১৯৮৬	শ্যামল সেনগুপ্ত	,,	০২
৭. ড. ফস্টাস-১৯৮৮	মার্লো থেকে রূপান্তর	পরিতোষ দাস	
	আ: আল মামুন	প্রণব চক্রবর্তী	০৮
৮. য্যায়সা কা ত্যায়সা-১৯৯০	গিরিশ চন্দ্র ঘোষ	,,	০৫
৯. মধ্যমান -১৯৯০	দিব্যেন্দু পালিতের ত্রাতা		
	অবলম্বনে রজত চক্রবর্তী	,,	০৫
১০. মহাযুদ্ধ ১৯৯৩	শ্যামল সেনগুপ্ত	দীপক রক্ষিত	০৩
১১. ধুঁয়ো ধূলো নক্ষত্র ১৯৯৬	গল্প অসীম রায় নাটক	প্রণব চক্রবর্তী	০২
	দেবকুমার ভট্টাচার্য		
১২. খারিজ -১৯৯৭	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়	ওয়ার্কশপ ভিত্তিক	৫০
		নিয়ন্ত্রনে প্রণব চক্রবর্তী	
১৩. রূপোর হরিণ	বৈদ্যনাথ মুখার্জী	বৈদ্যনাথ মুখার্জী	০৪

১৪. সুন্দর-অক্টো. ২০০৭	মোহিত চট্টোপাধ্যায়	প্রণব চক্রবর্তী	০১
১৫. শাস্তি ১২/১১/০১	বিশ্বকবির শাস্তি গল্প অবলম্বনে বিরু মুখোপাধ্যায় নাট্যরূপ	দীপক রক্ষিত	০২
১৬. অগ্নিগর্ভ হেকেমপুর ও পরাণ মণ্ডলের ঘরগেরস্থি (একাঙ্ক)	শ্যামলতনু দাসগুপ্ত	সুখেন্দু চৌধুরী	০৫
১৭. হাজার স্বপন	হরিমাধব মুখোপাধ্যায়	সুখেন্দু চৌধুরী	১০
১৮. হরে কৃষ্ণ	শ্যামল সেনগুপ্ত	দীপক রক্ষিত	২৫
১৯. সুখশান্তি	R.C.H Project	শ্যামাপসাদ তলাপাত্র[৯৪]	

নাট্যতীর্থ সর্বভারতীয় নাট্য-প্রতিযোগিতায় (পাটনা, কাটিহার) দিশারী পুরস্কারে সম্মানিত হয়। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে নাট্যতীর্থ পাটনা শিল্পী সমিতি আয়োজিত 'সর্বভারতীয় বাংলা পূর্ণাঙ্গ নাটক প্রতিযোগিতা'য় যোগদান করে 'কালাবদর' নাটকটি মঞ্চস্থ করে। এই নাট্য-প্রযোজনায় শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হিসেবে স্মৃতিকণা দাস নির্বাচিত হয়ে পুরস্কৃত হন। এছাড়াও এই নাট্যসংস্থার 'কালাবদর' নাট্য প্রযোজনায় অসাধারণ অভিনয় করে ঝুমা নন্দী ক্রিটিক সার্কেল অফ ইণ্ডিয়ার পক্ষ থেকে নির্বাচিত হয়ে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কাররে সম্মানিত হন। এরপর ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে নাট্যতীর্থ কাটিহারে 'একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা'য় 'অগ্নিগর্ভ হেকেম পুর' নাট্য-প্রযোজনা করে দর্শক মহলে বেশ সাড়া ফেলে দেয়। এই নাট্য-প্রযোজনায় শ্রেষ্ঠ চরিত্র ও তৃতীয় শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসেবে অভিনেতা সুখেন্দু চৌধুরী, তৃতীয় শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে অভিনেতা দীপক রক্ষিত এবং তৃতীয় শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার পুরস্কারে সম্মানিত হয়। সেই সঙ্গে এই নাট্য সংস্থা তার নাট্য-প্রয়াসের সুখ্যাতির জন্য 'উত্তরবঙ্গ নাট্যজগৎ' পত্রিকার পক্ষ থেকে বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত হয়। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দের ৭ ফেব্রুয়ারি এই জেলার স্বনামধন্য ও বিশিষ্ট নট ও নাট্যকার হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের রচিত সামাজিক পূর্ণাঙ্গ নাটক 'খারিজ' নাট্যতীর্থের প্রযোজনায় বেশ সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয় এবং দর্শক স্থলে যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করে। বালুরঘাট নাট্যতীর্থ তার ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ২০১২ খ্রিস্টাব্দের ২৫-২৯ ডিসেম্বর মন্মথ মঞ্চে নাট্যোৎসবের আয়োজন করে। এই নাট্যোৎসবে নাট্যতীর্থ নিজস্ব প্রযোজনায় পূর্ণাঙ্গ নাটক 'শাস্তি' মঞ্চস্থ করে। এছাড়াও নাট্যকর্মীর 'ঘরকথা', 'বঙ্গপুতুল', 'কলকাতার পুতুল নাটক', 'পাখি কাহিনী', 'অনিকেত' ত্রিতীর্থের 'পীরনামা' এবং

নাট্যতীর্থের অন্য আর একটি নাটক 'খারিজ' বেশ মঞ্চ সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয় এবং জেলাবাসীকে মুগ্ধ করে তুলেছিল। এই নাট্যসংস্থার অন্যতম ও মঞ্চসফল চরিত্রাভিনেতা ও চরিত্রাভিনেত্রীরা হলেন সুখেন্দু চৌধুরী, চন্দন চক্রবর্তী অরুণাভ দে, স্বপন চক্রবর্তী, শেফালী চন্দ, ববি চক্রবর্তী প্রমুখ। নাট্যতীর্থের প্রাণপুরুষ প্রণব চক্রবর্তী এই সংস্থার পরিচালকের গুরুদায়িত্ব পালন করেন। এবং তিনি নাট্যচিন্তা নাট্যতীর্থ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। নাট্যতীর্থের সভাপতি দেবল রায়ের সুদীর্ঘ ৫০ বছর ধরে মঞ্চাভিনয়ের অভিজ্ঞতার বিষয়ে প্রণব চক্রবর্তী সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। যে সাক্ষাৎকারটির মাধ্যমে নাট্যতীর্থের নাট্য-প্রযোজনা সম্পর্কে বাস্তব সম্মত এক চিত্র ফুটে উঠেছে, তা তুলে ধরা হল—

''দেবল নাট্য-তীর্থের বয়স প্রায় ১৫ বছর হলো। আমরা বড় ছোট মিলিয়ে অনেক প্রযোজনা করেছি এবং এখনও করছি। শ্যামল সেনগুপ্তের কালাবদর, কানামামা, মহাযুদ্ধ'র মত নাটক; গিরিশ ঘোষের ব্যায়সা কি ত্যায়সা, দিব্যেন্দু পালিতের মধ্যমণি, মার্লোর ফস্টাস; এখন তো আমরা হরিমাধব বাবুর 'খারিজ' নিয়ে ব্যস্ত... নাট্যতীর্থের প্রযোজনায় 'কানামামা' নাটকে ভাসুরের চরিত্রে, ফস্টার নাটকে লুসিকার, কালাবদর নাটকে ভূষণ মণ্ডলের চরিত্রে এবং মধ্যমণি নাটকে বাড়ীওয়ালার চরিত্রে অভিনয় করে বেশ আনন্দ পেয়েছি।''[৯৫] বালুরঘাট নাট্যতীর্থ ২০১৪-২০১৫ খ্রিস্টাব্দে 'হরেকৃষ্ণ' ও 'বুনো ফুল' নামে দুটি নাট্য-প্রযোজনা বেশ সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করে বালুরঘাট তথা জেলার নাট্যচর্চার ধারাকে গতিশীল করে তুলেছেন এবং জেলার নাট্যচর্চার প্রবহমান গতিকে অক্ষুণ্ণ ও অবাধ করে রাখতে এই নাট্যসংস্থা আজও সক্রিয়ভাবে নাট্য-প্রয়াস করেই চলেছেন।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ছোট মহকুমা শহরে বালুরঘাটের অতীত ঐতিহ্যবাহী নাট্যচর্চার উত্তরসুরী রূপে ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১১ই অক্টোবর প্রদোষ মিত্র, প্রাণতোষ ভট্টাচার্য ও রক্তিম সাহা প্রমুখের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সক্রিয় তৎপরতায় 'নাট্যকর্মী' নামে একটি নাট্যসংস্থা গড়ে ওঠে। এই নাট্যসংস্থার প্রধান নাট্যব্যক্তিত্ব তথা কর্ণধার ছিলেন প্রদোষ মিত্র। যুগের সঙ্গে তালমিলিয়ে আধুনিক নাট্য-প্রযোজনায় এই সংস্থা কৃতিত্বের দাবি রাখে। অর্থাৎ নাটক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়াস করে চলেছেন। এই নাট্যসংস্থার অন্যতম ও উল্লেখযোগ্য অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা হলেন প্রাণতোষ ভট্টাচার্য, অমিত সাহা, প্রসেনজিৎ ঘোষ, নীলিমা সরকার, হারান মজুমদার, চুমকী সাহা, জলি মহন্ত প্রমুখ। নাট্যসংস্থাটি নবীন হলেও সংস্থার পরিচালক প্রদোষ মিত্রের পরিচালনায় মোট ৪টি নাটক মঞ্চস্থ হয়। নাট্যকর্মীর অন্যতম ও উল্লেখযোগ্য নাট্য-প্রযোজনাগুলি হল— দ্য জাস্ট, সানাই, নিয়ম ও ব্যতিক্রম, ঝুমুর প্রভৃতি। নাট্যকর্মী স্মরণিকা ২০১৬ থেকে নাট্যকর্মীর প্রযোজনায় ১৯৯৩-২০১৬

খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মঞ্চস্থ নাটকের পরিসংখ্যান নিম্নে তুলে ধরছি—

১. ন্যায়	৮. শোকমিছিল
২. সানাই	৯. ঘরকথা
৩. নিয়ম ও ব্যতিক্রম	১০. শিক্ষামেব জয়তে:
৪. গোধূলী বেলায়	১১. পদভূষণ
৫. দ্য ডাস্ট	১২. পাওনা গণ্ডা
৬. ঝুমুর	১৩. দ্রোহ
৭. আলকায়দা	

১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে নাট্যকর্মীর প্রযোজনায় ও প্রদোষ মিত্রের নির্দেশনায় প্রথম নাটক 'দ্য জাস্ট' লক্ষ্ণৌতে সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হয়। অর্থাৎ এই নাটকটি দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা, দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও তৃতীয় শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কারে সম্মানিত হয়। এবং এই 'দ্য জাস্ট' নাটকে অভিনয়ের জন্য নূপুর হোড় দিশারী পুরস্কার লাভ করেন। নাট্যকর্মীর দ্বিতীয় সাড়া জাগানো নাটক 'সানাই' বাংলা ও বাংলার বাইরে বিভিন্ন স্থানে বিশেষভাবে সম্মানিত হয়। জেলার বিশিষ্ট নাট্যকার ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'সানাই' নাটকে আধুনিক কর্মব্যস্ততার যুগে দাঁড়িয়ে চাকুরীজীবি পিতামাতার কর্ম ব্যস্ততার দরুণ ছোট সানাইদের কীভাবে পিতা মাতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে অধিকাংশ সময় তাদেরকে গৃহে ঘরবন্দী নিঃসঙ্গ অবস্থায় সময় কাটাতে হয় এবং পরিবর্তনশীল সমাজ ব্যবস্থায় উদ্ভূত এই সামাজিক সমস্যাকে বেশ বাস্তবোচিত ও নিপুণভাবে পরিস্ফুটিত করে তুলেছেন। প্রদোষ মিত্রের নির্দেশনায় একক শিশু অভিনয় সমৃদ্ধ নাটকটি কলকাতার 'চেনা অচেনা'র আমন্ত্রণে ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দের ৫ই মে একাডেমীতে দর্শকদের ভরপুর সমাবেশে মঞ্চস্থ হয়। এর ফলে কলকাতায় ব্যাপক সাড়া পড়ে। এরপর নান্দীকারের জাতীয় নাট্যমেলায় ও কল্যানীতে জাতীয় নাট্যোৎসবে এই নাটকটি আমন্ত্রিত হয়ে বেশ সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়। এছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে 'সানাই' নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়। এমনকি মুম্বাইতে এই নাটকটির তিনটি শো হয়। তারপর কলকাতার নাট্য একাডেমির শিশু নাট্যমেলায় আমন্ত্রিত হয়ে মঞ্চস্থ হয়। নাট্যকর্মীর প্রযোজিত এই নাটকটি নেহেরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়ামের দেওয়া 'অসিত মুখোপাধ্যায় ২০০০' অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত হয়। নাট্যকর্মীর প্রযোজিত এই নাটকটির শিশু শিল্পীর ভূমিকায় অভিনয় করে সংস্থার পরিচালক প্রদোষ মিত্রের কন্যা রাইনূপুর মিত্র। তবে লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে, প্রথম একক শিশু শিল্পীর অভিনয় সমৃদ্ধ এই 'সানাই' নাটকটি বাংলা নাটকের ইতিহাসে এক বিরল ব্যতিক্রম দৃষ্টান্ত একথা নিশ্চিত করে বলা যায়।

বালুরঘাট (দক্ষিণ দিনাজপুর) নাট্যকর্মী প্রযোজনা 'সানাই'-এর অভিনয় সম্পর্কে নান্দীকারের নাট্যোৎসবে 'নাট্যকর্মীর সানাই' শিরোনামে একটি আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। এই আলোচনায় সমালোক তাঁর অভিমত ব্যক্ত করে বলেন— ''মোট বিয়াল্লিশ মিনিটের এই মেদবর্জিত প্রযোজনাটির প্রথম ও প্রধান কৃতিত্বের দাবিদার অবশ্যই প্রদোষ মিত্র। যদিও কাহিনীকার ও নিয়ন্ত্রক প্রদোষের চেয়ে অন্য বিভাগের প্রদোষ কিছুটা অনুজ্জ্বল বটে। এ নাটকের সম্পদ হল: প্রদোষ মিত্রের কাহিনী-কাঠামো, ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়ের মায়াময় সংলাপ নির্ভর নাট্যরূপ, আর শিশুশিল্পী রাইনুপূর মিত্রের অভিনয়। বাকি বিভাগ অর্থাৎ মঞ্চ, আলো, আবহ-গানের কথা-সুর নাটকের অনুগামী বটে, তবে গোটা প্রযোজনাটিকে ভিন্ন একটি মাত্রায় কখনোই উন্নত করেনি। নির্দেশনা প্রসঙ্গে বলা যায়: নাটক যেহেতু একটি পরিচালক সর্বস্ব শিল্প-মাধ্যম, তাই প্রতিটি বিভাগের যোগ-বিয়োগে, আর নিখুঁত পরিমিতিবোধে শেষ কথাটি বলতে হয় পরিচালককেই। এই প্রযোজনার সর্বত্র পরিচালকের অনুভবী সহযোগিতা আছে বটে, কিন্তু কখনোই তা অনিবার্য নেতৃত্বের উচ্চতায় উঠে এসেছে বলে মনে হয়নি। উদাহরণে বলা যায়, রাইনুপূর স্বভাবশিল্পী। পর্দা উন্মোচন থেকে পতন অবধি সবটাই তার একক অভিনয়ে প্রতিষ্ঠিত ফলে সংলাপের স্বর-প্রক্ষেপণ এবং 'মড্যুলিউশ' (Modalution)-এর ব্যাপারে নির্দেশকের আরো সতর্ক হওয়া জরুরি। অধিকাংশ সংলাপ এক পর্দাতে উচ্চারণের কারণে অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও আমরা কর্ণক্লান্তির আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পাইনি। সানাই-এর মননের রিয়েলিটি-ফ্যানটাসির দোলাচলকে আরো পরিষ্কার করে ধরতে পারতেন নির্দেশক। মুক্তির প্রীতকে 'সানাই'-এর মনে আকাশ নিয়ে একটা অবসেসন আছে। উড়ো জাহাজ গমনাগমনে, মেঘ গর্জনে সে ছুটে বারবার জানলায় যায়। তার গল্পের পক্ষীরাজ ঘোড়া, গানের মধ্যে তার আকাশ স্পর্শ করার নিবিড় বাসনা— এসব দর্শকের ত্রিমাত্রিক চেতনায় কেমন যেন অধরা থেকেই গেল।''

'সানাই'-এর দৃশ্য নির্মাণ এবং শব্দ আবহ উক্ত সমালোচকের দৃষ্টি এড়ায়নি। এসকল ক্ষেত্রে কিছুটা শিক্ষিত পটুত্বের অভাব বর্তমান ছিল— ''পর্দা অপসারণের প্রাথমিক মুহূর্তে স্কুল ছুটির ঘন্টা বাঁধভাঙা বন্যার মতো মুক্ত শিশুদের কলকাকলির সঙ্গে মিলে যাওয়া নীড়ে ফেরা হাজার হাজার পাখ-পাখালির অবিশ্রান্ত কূজন, টেলিফোনে অচেনা কাকু ও সানাই-এর আকাশগন্ধী গান নিছক নাটুকে শব্দ প্রক্ষেপণে কুণ্ঠিত হয়েই থাকল, অনিবার্য শব্দ শিল্পে আমাদের ইপ্সিত লক্ষে বিদ্ধ করল না।''

'সানাই'-এর আবহ-গানে মাটির স্পর্শের অভাব ছিল। সেদিক থেকে 'সানাই' যতটা হৃদয়বিদারক হয়ে উঠতে পারতো, তা পারেনি— ''আবহ নির্বাচনে এত বিদেশী সংগীতাধিক্য কেন? সে কি সানাই-এর পিতা-মাতা বা তার স্কুলের স্ট্যাটাস-কালচার বোঝানোর জন্য? তাই

যদি হয়, তাহলে সেটা তার 'কস্টিউম', তার সাজেই তো সানাই যথেষ্ট ছিল। বরং নাড়ু-বড়ি-ঠাকুমা বিসর্জিত, সুমুকার-অবনীন্দ্রনাথ বিহীন কমিকস্ ক্লান্ত শিশুমনগুলিকে দেশজ শিকড় সন্ধানী করতে একমাত্র মাটির সুর ব্যবহার করলেই তো এই নাট্য-কাহিনীর বিষয়বস্তুর সঙ্গে মর্মভাবনার সমন্বয় ঘটত এবং নাট্যরসও সমৃদ্ধ ভাবের পরিপূরক হত। নাটকের মতিগতি সেদিকেই নির্দিষ্ট ছিল, কিন্তু সেটা পূর্ণ অবয়বে পাওয়া গেল না।"

উক্ত নাট্যাভিনয়টির নাট্যমুহূর্ত নির্মাণে উক্ত সমালোচকের বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গীতে কিছুটা নাট্যরস স্ফুরণের ঘাটতির অভাব অনুভূত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন— ''একাকীত্বের যন্ত্রণায় সানাইরা কাঁদে আর আমরা অভিভাবকরা অপরাধীর মতো প্রবেশাধিকার না পেয়ে চৌকাঠের বাইরে স্থির কিংবা স্থবির। এই প্রজন্মের ছোটরা বড়দের কাছে তাদের মনোদরজা কোনোদিন না খুললে বিষয়টি কিন্তু সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে সত্যিই বিপন্নতার নামান্তর। গল্পে আর নাটকে এই ইঙ্গিত থাকলেও নির্দেশক কিন্তু শ্বাসরোধকারী এই পরিস্থিতির মুখোমুখি আমাদের হাজির করেননি। আমার মনে হয়, একালের সানাইরা কাঁদছে, ডানা ঝাপটাচ্ছে খাঁচার মধ্যে। আমরা দাঁড়িয়ে খাঁচার বাইরে। মাঝখানে জেনারেশনের কালচারাল ব্লাকহোল। এটাই এই নাটকের ফোকাল পয়েন্ট এবং এটাকেই আরো তীব্র, তীক্ষ্ণ করা দরকার এই নাটকের মুহূর্ত নির্মাণে।" (ঈশ্বর মিত্র—'নাট্যচিন্তা নাট্যতীর্থ'—৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, জানুয়ারী ১৯৯৭)

এইনাট্যসংস্থার পরবর্তী নাট্য-প্রোযোজনা ব্রেখটের লেখা অবলম্বনে নিয়ম ও ব্যতিক্রম'। এই নাট্য-প্রযোজনাটি প্রত্যেকটি মঞ্চ সফলতা লাভে সক্ষম হয়নি। নাট্যকর্মী প্রযোজিত 'ঝুমুর' নাটকটি যথেষ্ট সফলতার সঙ্গে মঞ্চস্থ হয় এবং ব্যাপক দর্শক প্রিয়তা লাভ করে জেলার নাট্যচর্চায় সাড়া ফেলে দিয়েছিল। নাট্য-প্রযোজনায় সে সব অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা মঞ্চ সফল অভিনয় করেছিলেন তাঁরা হলেন অমিত সাহা, প্রদোষ মিত্র, মনোজ গাঙ্গুলী, স্বদেশ সাহা, প্রাণতোষ ভট্টাচার্য, নূপুর হোড় প্রমুখ। নাট্যকর্মীর শেষ উল্লেখযোগ্য নাট্য-প্রযোজনা 'শোকমিছিল' ভবেন্দু ভট্টাচার্যের পরিচালনায় ও নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হয়। এবং নাট্যপ্রেমী দর্শকদের কাছে বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়। নাট্যকর্মী যথাক্রমে ২০০৪ খ্রি: ও ২০০৬ খ্রি: বালুরঘাটে নাট্যোৎসবের আয়োজন করে জেলার তথা সারা বাংলার নাট্যচর্চায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই নাট্যোৎসবে কলকাতা থেকে 'গণকৃষ্টি' ও 'চেতনা নাট্যগোষ্ঠী', জলপাইগুড়ি থেকে 'চিত্তপট নাট্যগোষ্ঠী', শিলিগুড়ি থেকে 'উত্তাল নাট্যগোষ্ঠী' ও বাংলাদেশ থেকে 'আমাদের থিয়েটার'-এ এসে উক্ত নাট্যগোষ্ঠী তাদের মঞ্চসফল ও জনপ্রিয় নাট্য-প্রযোজনা করে জেলার দর্শকদের মুগ্ধ করে তুলেছিলেন।

এই নাট্যসংস্থার অন্যতম ও মঞ্চসফল নাট্য-প্রযোজনাগুলি যথা— 'শোকমিছিল', 'ঘরকথা',

'শিক্ষামেব', 'জয়তে' ভবেন্দু ভট্টাচার্যের নির্দেশনা ও পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়। এই নাট্যসংস্থার 'শোকমিছিল' নাট্য-প্রযোজনাটি বালুরঘাটে নাট্যপ্রেমী দর্শকদের কাছে বেশ সমাদৃত হয়। এই নাট্য-প্রযোজনাটিতে নির্দেশক ভবেন্দু ভট্টাচার্য নতুনত্ব আনার চেষ্টা করেছেন। এরপর মনোজ গাঙ্গুলির নির্দেশনায় বালুরঘাট নাট্যকর্মীর 'নাট্য-প্রযোজনা দ্রোহ মঞ্চস্থ করে বেশ দর্শক-ধন্য হয়ে ওঠে। এই নাট্যসংস্থা স্কুল ড্রামা ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করে বালুরঘাট তথা জেলার নাট্যচর্চায় একটি নতুন মাত্রা সংযোজন করেন। নাট্যপ্রেমী এই সংস্থার মঞ্চসফল তরুণ অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা হলেন অমিত সাহা, শঙ্কর মুখার্জী, দেবস্মিতা দে, ঋতুপালদেব, সুচেতনা ব্যানার্জী, শিল্পী কর্মকার, ঝুমা দেব প্রমুখ। বর্তমানে বালুরঘাট নাট্যকর্মী ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ডিসেম্বর মনোজ গাঙ্গুলীর নির্দেশনায় ও পরিচালনায় 'পদভূষণ' এবং ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি তারই পরিচালনায় 'পাওনাগণ্ডা' এই দুটি নাটকের প্রযোজনা করে বেশ খ্যাতি ও প্রশংসা অর্জন করে।

সম্প্রতি ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের ২-৫ই মে পর্যন্ত বালুরঘাট নাট্যকর্মী স্কুল ড্রামা ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করে। এই নাট্যসংস্থার আয়োজিত স্কুল ড্রামা ফেস্টিভ্যালের বিবরণ তুলে ধরা হল—

অভিনয়ের তারিখ	**নাটক**	**প্রযোজনা/পরিচালনা**
১. ২ মে ২০১৫	শিশুরাজার দেশে	ইলা ঘোষ স্মৃতি সরস্বতী শিশু মন্দির
২. ৩মে ২০১৫	চন্দ্রজয়	টেকনো ইণ্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুল
৩. ৩মে ২০১৫	জাগরণ	নদীপার গার্লস হাইস্কুল/নির্দেশনা নমিতা মিত্র
৪. ৩মে ২০১৫	অবাস্তব	বালুর ঘাট খাদিমপুর উচ্চ বিদ্যালয়/ নির্দেশনায় ভাস্কর চক্রবর্তী
৫. ৪মে ২০১৫	বৃদ্ধাশ্রম	আত্রেয়ী ডি.এ.ভি. পাবলিক স্কুল/রচনা-নির্দেশনা/ সুবিমল সরকার
৬. ৫মে	ঝালাপালা	আশুতোষ বালিকা বিদ্যাপীঠ/ নির্দেশনা -ছন্দা মজুমদার
৭. ৪মে ২০১৫	ভাড়াটে চাই	নদীপার এন.সি. হাইস্কুল/নির্দেশনা-জ্যোতিশঙ্কর চক্রবর্তী (মোহর)
৮. ৫মে ২০১৫	বীর শিকারী	নালন্দা বিদ্যাপীঠ/নির্দেশনা-পার্থ দাস
৯. ৫মে ২০১৫	পঞ্চভূত	বালুরঘাট কবিতীর্থ বিদ্যানিকেতন/ নির্দেশনা -সন্তু রায়, সহ-নির্দেশনা

বালুরঘাট নাট্যকর্মীর আয়োজিত দুই বাংলার দুই দিনের নাট্যোৎসবের বর্ণনা তুলে ধরা হল—

দল	নাটক
২৮ মে ২০১৫ বাংলাদেশ আমাদের থিয়েটার	প্রাগৈতিহাসিক
২৯ মে ২০১৫ জলপাইগুড়ি কলাকুশলী	ভোকাট্টা।[৯৬]

বালুরঘাট নাট্যকর্মীর এই স্কুল ড্রামা ফেস্টিভ্যালের মধ্য দিয়ে নবতর প্রয়াসে নাট্যচর্চার অভিনবত্ব অবশ্যই অভিনন্দন ও সাধুবাদ যোগ্য। বিশেষ করে এই নাট্যসংস্থা আমাদের কিশোরদের মনোজগতে নাটকের বীজ বপন করে ঋত্বিকের ভূমিকা পালন করে চলেছে, যা দক্ষিণ দিনাজপুর তথা সমগ্র উত্তরবাংলার নাট্যচর্চায় এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন তথা অভিনবত্বের বার্তা। ২০০৬ খ্রিস্টাব্দের ২০ জুন নাট্যকর্মী থেকে বেড়িয়ে এসে সুপ্রতিষ্ঠিত অভিনেতা ও নাট্যপরিচালক প্রদোষ মিত্র বালুরঘাট 'সমবেত নাট্যকর্মী' নামে একটি নতুন নাট্যগোষ্ঠী তৈরি করেন। এবং নাট্যকর্মী নাট্যসংস্থার পূর্বতন ঐতিহ্যকে সার্থক উত্তরসূরী হিসেবে তিনি স্বমহিমায় আজও চলমান রেখেছেন। এই নাট্যসংস্থার উল্লেখযোগ্য নাট্য-প্রযোজনাগুলির মধ্যে রয়েছে মোট ৩টি নাটক, যথা— 'এক দুই', 'সুন্দর', 'নানারঙ্গের দিনগুলি' প্রভৃতি। বালুরঘাট সমবেত নাট্যকর্মীর অন্যতম মঞ্চসফল অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা হলেন অভিষেক মিত্র, স্বদেশ সাহা, বাপ্পা রায়, সুকন্যা সরকার সহ আরও অনেকে। সমবেত নাট্যকর্মী ২০১২-১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সারাবছর ধরে নাটকের আয়োজন করে এবং জেলা ও জেলার বাইরে বিভিন্ন সংস্থার নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। 'মায়ের মতো', 'অন্যঝুমুর', 'ভুতনাথ' সহ আরও অনেক নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। এই নাট্যোৎসবে সমাপ্তি অনুষ্ঠানে এক ডজনেরও বেশি নাটক ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে ৯ই ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মঞ্চস্থ হয়। সমবেত নাট্যকর্মীর উদ্যোগে বালুরঘাট রবীন্দ্রভবন মঞ্চে মঞ্চস্থ হয় বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব ও নাট্যকার ব্রাত্য বসুর নির্দেশনায় স্বপ্ন সূচনা নাট্যদলের 'কন্যাদান'; শিল্পীসংঘ হাওড়ার নাটক 'ভুল স্বর্গ' নির্দেশনায় সীমা মুখোপাধ্যায়; নয়ে নটুয়া কলকাতার 'বড়দা বড়দা' নির্দেশনায় গৌতম হালদার; প্রকাশ ভট্টাচার্যের নির্দেশনায় নান্দীপাটের নাটক 'ভ্রম'; গণকৃষ্টি, কলকাতার নাটক 'এখন অন্তিগোনে' নির্দেশনায় অমিতাভ দত্ত; রঙরূপ কলকাতার নাটক 'অধরা মাধুরী'; মলয় ঘোষের নির্দেশনায় শিলিগুড়ির নাটক 'শিকড়ের খোঁজে মরিচ ঝাঁপি'; দেবব্রত আচার্যের নির্দেশনায় কোচবিহারের নাটক আবর্ত। এছাড়াও 'আধুনিক নাটকে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব' নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করে সমবেত নাট্যকর্মী। এই সংস্থার এই অভিনব নাট্যপ্রয়াসে জেলাজুড়ে তথা সমগ্র বাংলা জুড়ে প্রশংসিত হয়েছে। এবং জেলার নাট্যচর্চার ধারায় নতুনতর মাত্রা সংযোজন করে বেশ সাড়াজাগিয়ে তুলেছে। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে ১৯ নভেম্বর

বালুরঘাট সমবেত নাট্যকর্মী প্রদোষ মিত্রের নির্দেশনায় 'নাটের গুরু' প্রযোজনা করে বেশ সাফল্য লাভ করে। ও দর্শক ধন্য হয়ে ওঠে। এই সংস্থার নাট্যপ্রয়াস সম্প্রতি ক্রিয়াশীল থেকে জেলার নাট্যচর্চার ধারাকে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মহকুমা শহর বালুরঘাট থেকে ৬ কিলোমিটার পশ্চিমে বোয়ালদাড় গ্রামের বোয়ালদাড় বারোয়ারী নাট্যসংস্থা সেই গ্রামের প্রধান নাট্যব্যক্তিত্ব উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং অধ্যুষিত মানুষদের নিজস্ব তৎপরতা ও উৎসাহ উদ্দীপনায় মাটির দেওয়াল দিয়ে খড়ের চালায় অস্থায়ী নাট্যমঞ্চ তৈরি করে নাট্যপ্রয়াস করে চলেছেন। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে কালীপূজা উপলক্ষে এই গ্রামের বারোয়ারী নাট্যসংস্থা নবীন নাট্যপ্রেমী তরুণ যুবকদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সক্রিয় প্রচেষ্টায় 'কেদার রায়' নাটকটি বেশ ভালোভাবে মঞ্চস্থ করে। আশেপাশের গ্রাম থেকে প্রচুর দর্শক আগমনের সুবাদে দর্শক ও শ্রোতায় মঞ্চ ভরে ওঠে। তবে এখানে উল্লেখ্য যে অভিনেতারা প্রমটার বাদ দিয়ে নিজেদের পাট নিজেরাই মুখস্থ করে এই নাটকে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এই প্রযোজিত নাটকে নবীন নাট্যশিল্পীদের মধ্যে অন্যতম হলেন দুঃখু সরকার, ভীকু, হুদু প্রমুখ উল্লেখ্য। দীর্ঘদিন নাট্যাভিনয় বন্ধ থাকার পর ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে সুনীল চৌধুরীর উদ্যোগে মহিলাদের স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয় করার মানসিকতাকে সম্মুখে রেখে বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'আজকাল' সামাজিক পূর্ণাঙ্গ নাটক প্রাইমারী স্কুলের বারান্দায় চৌকি জোড়া দিয়ে মঞ্চ তৈরি করে মঞ্চস্থ হয়। এই নাট্য-প্রযোজনায় দুটি মহিলা চরিত্রে শোভা চৌধুরী ও জ্যোৎস্না সমাজদার ও পুরুষ চরিত্রে অধীর সরকার, অনিল সমাজদার, আনন্দ তলাপাত্র, অজিত সরকার প্রমুখেরা যথেষ্ট মঞ্চসফল অভিনয় করে দর্শকদের কাছে অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করে। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই নাট্য-প্রযোজনা থেকেই বোয়ালদাড় বারোয়ারী নাট্যসংস্থায় সর্বপ্রথম মাইকের ব্যবহার শুরু করে এবং মহিলাদের স্ত্রী ভূমিকার অভিনয়ে মঞ্চে নামিয়ে স্ত্রী-পুরুষের মিলিতি অভিনয়ের সূত্রপাত হয়। এরপর থেকে পুরুষদের মহিলা চরিত্রের অভিনয় উঠে যায়। তবে জানা যায় যে, বোয়ালদাড় গ্রামের এই বারোয়ারী নাট্যসংস্থার পূর্বে সৈদপুরে জ্যোতিশ্বর সরকার মেয়েদের দিয়ে 'শকুন্তলা' নাটক মঞ্চস্থ করেন। কিন্তু পুরুষের ভূমিকায় মেয়েরাই পুরুষ সেজেছিল। এই নাট্যসংস্থার অন্যতম অভিনেতা যারা মহিলা চরিত্রে অভিনয় করেছেন, তাঁরা হলেন অরুণ চ্যাটার্জী, দুর্গেশ চ্যাটার্জী, অমর ভাদুরী, নির্মল রায়, হীরা ভুইমালী, দিনেশ বসাক, মংলা ঘোষ, প্রণব সমাজদার প্রমুখ। এবং উল্লেখযোগ্য মহিলা অভিনেত্রীরা হলেন— শোভা চৌধুরী, জ্যোৎস্না সমাজদার, স্মৃতিকণা মণ্ডল, ইরা চৌধুরী, প্রীতিকণা মণ্ডল, রীণা চৌধুরী, প্রমীলা রায়, শেখালী রায়, দিপালী রায়, গৌরী সিং, অর্চনা সরকার, পপী ব্যানার্জী, বুলা চৌধুরী, মানা খাঁ মঞ্জু খাঁ প্রমুখ।

বোয়ালদাড় বারোয়ারী নাট্যসংস্থা মফস্বল নাট্যচর্চার ধারা ধরে রাখার ফলে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে মঞ্চ প্রতিষ্ঠার পুণ্যলগ্ন থেকে বহু পথ পরিক্রম করে অবশেষে ২০১১ খ্রিস্টাব্দে ৭০ বছরে পদার্পণ করে। এটা সম্ভব হয়েছে এই গ্রামের নাট্যপ্রেমী ও নাট্যমনস্ক মানুষদের নাট্যচর্চার প্রতি গভীর টান ও ভালোবাসার সুবাদে। এই উপলক্ষে বারোয়ারী নাট্যসংস্থা ২০১১ খ্রিস্টাব্দের ২রা জানুয়ারি পর্যন্ত বিভিন্ন স্বাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ গ্রামের তরুণ নাট্যশিল্পীদের দিয়ে যথাক্রমে 'চলো যাই ভ্রমণে', 'জন্ম হল অভিশাপ', 'রক্তমাখা দলিল', 'পাষানী মা', 'দুখিরামের সংসার' (সাঁওতালী ভাষায়) প্রভৃতি নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ৫ দিন ব্যাপী ৭০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করে বালুরঘাট তথা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নাট্যচর্চায় ব্যাপক সাড়া জাগিয়ে তোলে।

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০১১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ৭০ বছর ধরে বোয়াদার নাট্যসংস্থার পরিচালিত ও মঞ্চস্থ পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক পূর্ণাঙ্গ নাটকের পরিসংখ্যান তুলে ধরা হল—

প্রযোজিত নাটক

১. মীনা

২. বঙ্গবীর

৩. আজকাল

৪. কেদার রায়

৫. পাষাণী

৬. পার্থসারথী

৭. লালপাঞ্জা

৮. চোর

৯. খ্যাতির বিড়ম্বনা

১০. সংগ্রাম

১১. মাটির ঘর

১২. কৃপণের ধন

১৩. চণ্ডীতলার মন্দির

১৪. মৃত্যুর ডাক

১৫. ভিখারী ঈশ্বর

১৬. সেই রক্ত ঝরা দিনগুলি

১৭. দু-টুকরো সংসার

১৮. অথ ভগবতী উপাখ্যান (মহিলাদের দ্বারা অভিনীত)

১৯. জয়ার সংসার (মহিলাদের নাটক)

২০. ডাক ঘর

২১. বশীকরণ (মহিলাদের দ্বারা অভিনীত)[৯৭]

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট মহকুমার অধীনে অন্তর্ভুক্ত হিলি, কুমারগঞ্জ ও তপন ইত্যাদি থানা শহর ও প্রত্যন্ত গ্রমেও নাটক মঞ্চায়ন করা ছিল নাট্যমোদী তথা নাট্যরস পিপাসু নাট্যপ্রেমীদের নেশা। মোটকথা দিনাজপুর জেলার বাতাসে মাটিতে নাটকের গন্ধ বিরাজমান। তাই জেলা শহরের বাইরের এই থানাশহরে নাট্যচর্চার উদ্দেশ্যে বেশ কিছু নাট্যসংস্থার সন্ধান পাওয়া যায়। এই জেলার হিলি থানা এবং বালুরঘাটের পার্শ্বস্থ জনবহুল গ্রাম পতিরামের নাট্যচর্চার প্রকৃত সূত্রপাত হয় স্বাধীনতার পরবর্তীকালে। হিলি থানায় স্বাধীনতার আগে থেকেই নাট্যচর্চা শুরু হয়। এই থানার আনন্দ আশ্রম, যুবগোষ্ঠী (তিওড়) ইত্যাদি নাট্যসংস্থা স্বকীয় উদ্যোগ ও তৎপরতার সঙ্গে অস্থায়ীমঞ্চ বেঁধে সাধ্যমতো নাট্য-প্রযোজনা করে ধন্য হয়ে ওঠে। পতিরামের দিশারী নাট্যসংস্থাও বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে নাট্য-প্রয়াস করে বহুল প্রশংসিত হয়। এখানকার স্বর্গত বেঙ্গা সরকার, নগেন্দ্রনাথ সরকার, কাশীনাথ বাবু প্রমুখেরা নাট্যমোদী ব্যক্তিরূপে পরিচিত ছিলেন। কাশীনাথ বাবু 'মেক আপম্যান'-এর কাজে বেশ সুদক্ষ ছিলেন এবং তিনি যাত্রাপালায় অভিনয় করতেন। তবে বেঙ্গা সরকার নাট্যশিল্পী হিসাবে সেই সময়ে অভিনয় করে প্রশংসিত হয়েছিলেন।

বালুরঘাট থেকে উত্তরে অবস্থিত কুমারগঞ্জ থানার তৃষ্ণা সাংস্কৃতিক মঞ্চ বেশ সাফল্যের সঙ্গে নাট্য-প্রযোজনা করে জনসমাদর লাভ করে। এই জেলার সংস্কৃতি মনস্ক থানারূপে তপন বেশ সুপরিচিত। এই থানা লোকায়ত সংস্কৃতিচর্চার পাশাপাশি নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে বেশ সুনাম অর্জন করেছিল। তপন থানার 'মিতালী ক্লাব', 'আনন্দ আশ্রম নাট্যসংস্থা' বেশ সাবলীলভাবে নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে এতদ্ অঞ্চলের মফস্বল কেন্দ্রিক নাট্যচর্চায় বেশ সাড়া ফেলে দিয়েছিল । ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের ১০ নভেম্বর 'তপন সাংস্কৃতিক সংস্থা' সমাজ কল্যাণ দপ্তরের আমন্ত্রণে ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের ৩১ জানুয়ারী রতন ঘোষের 'ভোরের মিছিল' নাটকটি মঞ্চস্থ করে সাড়া ফেলে দেয়। এরপর ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের ব্লক যুব উৎসব আয়োজিত নাট্য-প্রতিযোগিতায় প্রবীর দত্তের 'সারি সারি মৃতদেহ' নাট্য-প্রযোজনাটি করে এই নাট্যসংস্থা প্রথম স্থান অর্জন করে বহুল প্রশংসিত হয়। বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির আমন্ত্রণে এই নাট্যসংস্থা ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ফেব্রুয়ারী বালুরঘাট কৃষিমেলায় 'সারি সারি মৃতদেহ' নাট্য-প্রযোজনাটি বেশ সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করে। তপন সাংস্কৃতিক সংস্থা এই

বৎসরের ১৮ মার্চ পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত পশ্চিম দিনাজপুর অঞ্চলভিত্তিক নাট্যোৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে বালুরঘাট নাট্যমন্দিরে 'সারি সারি মৃতদেহ' নাট্যপ্রযোজনাটি করে। এই নাট্য-প্রযোজনার মধ্য দিয়ে তপন সাংস্কৃতিক সংস্থা ব্যাপক পরিচিতি ও সুনাম অর্জন করে। এমনকি পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকার ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের ১০ এপ্রিল সংখ্যায় এই নাটকটির অসাধারণ ও নিপুণ প্রযোজনা উচ্চ প্রশংসা লাভ করে। পরিবার পরিকল্পনা দপ্তরের আমন্ত্রণে ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের ৩১ মার্চ, এই নাট্যসংস্থা কিরণ মিত্র রচিত 'জীবন দর্পণ' নাটকটি স্থানীয় মঞ্চে মঞ্চস্থ করে দর্শকদের মুগ্ধ করে তোলে। এই নাট্যসংস্থার পরবর্তী নাট্য-প্রযোজনা শৈলেন গুহ নিয়োগীর 'উত্তাল তরঙ্গ'। তপন সাংস্কৃতিক সংস্থার ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ থেকে যেসব মঞ্চ সফল নাট্য-প্রযোজনা করে সেগুলি হল— 'বৃত্ত ভেঙ্গে ভেঙ্গে', 'সেই মানুষটির খোঁজে', 'রাম শ্যাম যদু', 'চিচিং ফাঁক' প্রভৃতি। এই নাট্যসংস্থাটি গ্রুপ থিয়েটার সংস্থা এবং সেই সঙ্গে সমাজ কল্যাণমূলক কাজের মধ্য দিয়ে জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থন ও আশীর্বাদ ধন্য হয়ে উঠিছিল।

তপন থানার নিকটস্থ সংস্কৃতিমনস্ক খিরট্টা গ্রামের সংস্কৃতিচর্চার প্রাণপুরুষ স্বর্গীয় ননীগোপাল বর্মনের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে নাট্যপ্রেমী তরুণ ও প্রবীণদের উদ্যোগে নাট্যচর্চার প্রতি প্রবল টানে 'আদর্শ ক্লাব' গড়ে ওঠে। এই ক্লাবের তরুণ-তরুণীরা নিজেদের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় মেতে ওঠে কয়েকটি মঞ্চসফল নাট্য-প্রযোজনা করে। যে নাট্য-প্রযোজনাগুলি উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু জায়গায় আমন্ত্রিত হয়ে মঞ্চস্থ হয় এবং বহু সম্মানে প্রশংসিত হয়। তাদের অন্যতম ও উল্লেখযোগ্য নাট্য-প্রযোজনাগুলি হল— 'সূর্য আছে আলো নেই', 'ফেরিওয়ালা', 'মুক্তির আহ্বান', প্রভৃতি। এই নাট্য-প্রযোজনাগুলি দর্শকদের মুগ্ধ করে তোলে এবং গ্রামে রীতিমতো সাড়া জাগিয়ে নাট্যচর্চার প্রেরণায় নতুন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। সর্বোপরি সারা জেলায় তাদের প্রযোজিত নাটক বেশ আলোড়ন জাগিয়ে তোলে। এদের উল্লেখযোগ্য নাট্যশিল্পীদের মধ্যে অন্যতম হল— মন্মথ বর্মন, নিত্যগোল বর্মন, গৌরপদ বর্মন, বিনয় বর্মন, বাদলকৃষ্ণ বর্মন, বিপ্লবকুমার বর্মন, পতিতপাবন বর্মন, সমসের আলি, সহিদুর আলি, মিজানুর রহমান, হামিদুর মোল্লা, রাজ্জাক আলি প্রমুখ।[৯৮] দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর-মহকুমার অধীনভুক্ত গঙ্গারামপুর, বংশীহারী, হরিরামপুর ও কুশমণ্ডি থানা শহরে সৌখিন ও বিশেষ করে মফস্বল কেন্দ্রিক নাট্যচর্চার মধ্য দিয়ে এতদ অঞ্চলের নাট্যরস পিপাসু দর্শকদের মুগ্ধ করে তুলেছিল। অর্থাৎ এই সমস্ত স্থানে প্রায় সখের থিয়েটারের ঢঙে কালীপূজা, দুর্গাপূজা উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে অনিয়মিত বা বিচ্ছিন্নভাবে নাট্যচর্চা হয়ে থাকে। তবে এখানে নাট্যচর্চা হাল আমলেই শুরু হয়েছে। যাত্রাগান ও আঞ্চলিক লোকসঙ্গীত চর্চার সঙ্গে সঙ্গে মূলত জেলার সদর বালুরঘাট শহরের নাট্যচর্চার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তরুণ নাট্যপ্রেমী

যুবকেরা নাট্যচর্চা তথা নাট্যাভিনয়ের তাগিদ অনুভব করে। গঙ্গারামপুরের নাট্যচর্চায় সাহা পাড়ার মোহিনী সাহাদের পূজা উপলক্ষে নাট্যাভিনয়ের আদি নাট্যদল বলে দাবী করতে পারে। এখানে অন্যতম ও উল্লেখযোগ্য নাট্যশিল্পীদের মধ্যে ছিলেন শচীন সাহা, বৈদ্যনাথ সাহা, রণজিৎ রায় প্রমুখ। যে সব নাট্যসংস্থা বিচ্ছিন্নভাবে নাট্য প্রযোজনা করে চলেছেন তাদের মধ্যে 'ক্রান্তিচক্রের' অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই নাট্যসংস্থার অন্যতম মঞ্চসফল নাট্য-প্রযোজনা কিরণ মৈত্রের 'অন্যছায়া', তুলসী লাহিড়ীর ছেঁড়াতাঁর' দর্শক মহলে বহুল প্রশংসিত হয়ে আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। কিন্তু বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে অবস্থান করার ফলে নাট্যাভিনয়ের ধারাবাহিকতাকে ধরে রাখতে পারেনি। 'রূপকার', 'ত্রিনয়ন নাট্যসংস্থা' নিষ্ঠাসহ ও সাধ্যমতো কয়েকটি নাট্য-প্রযোজনা করে গঙ্গারামপুরে বেশ প্রভাব ফেলে দেয়। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে গঙ্গারামপুরে 'সাংস্কৃতিক সংসদ' নামে একটি নাট্যসংস্থার আবির্ভাব হয়। এই নাট্যসংস্থার উল্লেখযোগ্য নাট্য-প্রযোজনা— 'মহেশ', 'আবর্ত', 'বিলাসী', 'শঙ্খচূড়' প্রভৃতি এই অঞ্চলে বেশ সাড়া জাগিয়ে তোলে। সাংস্কৃতিক সংসদের কালচারাল ফোরাম ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১৭মে মিলনীক্লাব মাঠে টিকিট করে শ্যামলকান্ত দাসের 'অগ্নিগর্ভ' নাটক মঞ্চস্থ করে। এরপর ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে এই সংস্থা শঙ্খচূড় নাট্য-প্রযোজনা করে দর্শকদের মুগ্ধ করে তুলেছিল।

১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে গঙ্গারামপুরের কালদীঘিতে গড়ে ওঠে 'কালদীঘি নাট্যসংস্থা' এই নাট্যসংস্থা প্রায় দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে বহু প্রসিদ্ধ নাটক মঞ্চস্থ করে দর্শক-ধন্য হয়ে ওঠে। এবং বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই সংস্থার অন্যতম অভিনেতা-অভিনেত্রীরা হলেন— শঙ্কর পণ্ডিত, বাবলু চৌধুরী, নাজিম আহমেদ, অঞ্জন চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, মায়া ঘোষাল, কনা পণ্ডিত, পবিত্র ভট্টাচার্য, অমল দত্ত, প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। গঙ্গারামপুরের পার্শ্বস্থ বেলবাড়ির 'নাট্যভারতী' নাট্যসংস্থা নাট্যচর্চায় মনোনিবেশ করে বেশ সাড়া ফেলে দেয়। এই নাট্যদলের প্রধান নাট্যব্যক্তিত্ব বা প্রাণপুরুষ ছিলেন অরুণ মল্লিক। এছাড়াও পীযুষ বসাকের সৌখিন নাট্যসংসদ' ও 'গঙ্গারামপুরের নাট্যচর্চার জগতে উল্লেখযোগ্য নাট্য প্রতিষ্ঠান। এই নাট্যসংস্থা সাধ্যমতো নাট্য-প্রযোজনা করে বহুল প্রশংসিত হয়।[৯৯] গঙ্গারামপুর মহকুমার পার্শ্বস্থ বংশীহারী থানার 'অরণী' নাট্যসংস্থা বেশ সুনামের সঙ্গে জেলা তথা জেলার বাইরে নাটক মঞ্চস্থ করে সারা উত্তরবঙ্গে বেশ সারা জাগিয়ে তুলেছে। এই নাট্যসংস্থার বর্তমান সম্পাদক পবিত্র দাস ভীষণ তৎপরতার সঙ্গে সম্প্রতি নাট্যপ্রয়াস করে চলেছেন। ও হরিরামপুর থানার 'শুভম' সংস্থা অনিয়মিতভাবে নাট্যোপ্রয়াস করে থাকে। এছাড়াও কুশমণ্ডি থানার 'ঊষাভানু', 'তপশিলী জাতি উপজাতি সাংস্কৃতিক সমিতি', 'গ্রামীণ লোকসংস্কৃতি ও ভাষা উন্নয়ন সংস্থা' ইত্যাদি সংস্থা এই অঞ্চলের লোকসংস্কৃতিচর্চার ফাঁকে ফাঁকে নাট্যচর্চার মনোনিবেশ করে

খ্যাতি অর্জন করে। তবে পরিশেষে একথা দৃঢ়ভাবে বলা যায় যে, গঙ্গারামপুর মহকুমার এসব অঞ্চলের নাট্যচর্চা ইতিহাসে স্থান পাবার উপযোগী হয়ে উঠতে পারেনি। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নাট্যচর্চা অখণ্ড বা বহত্তর অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার ঐতিহ্যবাহী সমৃদ্ধ নাট্যচর্চার ধারা বেয়ে ক্রমান্বয়ে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে অর্থাৎ বিশ শতকের একেবারে গোড়া থেকেই পশ্চিম দিনাজপুরের রাজা মহারাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় মূলত: অর্থানুকূল্যে এই জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে অবিরত ভাবে নাট্যচর্চা হয়েছে এবং এরই পদাঙ্ক অনুসরণের মধ্য দিয়ে বর্তমানে একবিংশ শতকের দোরগোড়ায় পৌঁছে অবিশ্রান্ত ধারায় উক্ত নাট্যচর্চা প্রবহমানতার ধারা বেয়ে অগ্রসর হয়ে চলেছে। এই জেলার নাট্যচর্চায় সৌখিন নাট্যপ্রয়াস, গ্রুপ থিয়েটার সংস্থা, মুক্ত মঞ্চ প্রভৃতি মঞ্চ-ব্যবস্থার ক্রম পরিণতি এবং পরিবর্ধন ঘটতে দেখা যায়। ঠিক তেমনিভাবে নাট্যমঞ্চ সাজ-সজ্জার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন উপকরণ অর্থাৎ সেট, সিন, আলো, শব্দ প্রক্ষেপণ প্রভৃতি নানা রকম পরিবর্তন সজ্ঞাত পরিণতিতে পৌঁছে সূক্ষ্ম পথের সন্ধান মিলেছে। সেই সঙ্গে নাট্যবিষয়ক সেমিনার, নাট্যোৎসব, স্কুল ড্রামা ফ্যাসিস্টভ্যাস, নাট্যবিষয়ক পত্র-পত্রিকা প্রভৃতির স্বকীয় উদ্যোগ ও আয়োজন ব্যাপক পরিমাণে প্রকাশের পরিপূর্ণতা অর্জন করেছে। এর ফলস্বরূপ লক্ষ করা যায় দক্ষিণ দিনাজপুরের নাট্যপ্রেমী তথা নাট্যামোদী জনসাধারণ নাট্যায়ণ-ব্যবস্থার পরিপুষ্টিগত সার্বিক রূপ প্রত্যক্ষ করতে সমর্থ হয়েছে। সর্বোপরি ঐতিহ্যবাহী নাট্যচর্চায় সমুজ্জ্বল এই অঞ্চলের নাট্যচর্চার প্রত্যুষ লগ্নে স্বনামধন্য বিশিষ্ট্য নাট্যকার শিবপ্রসাদ করের জন্ম, বিকাশ ও বৃদ্ধি লাভ ঘটে। শিবপ্রসাদ কর ছিলেন এই অঞ্চলের খ্যাতিসম্পন্ন নাট্যকার। তবে শিবপ্রসাদ প্রথমপর্বে মঞ্চ সফল সুঅভিনেতা ও পরবর্তীতে নাট্যকার। এরপর এই অঞ্চলে গর্ব করার মতো যশস্বী ও মহীয়ান নাট্যকার মন্মথ রায়ের নাট্যপ্রতিভার উন্মেষ, বিকাশ ও বিবর্ধন লাভ করে। শুধু তাই নয় মন্মথ রায় আজ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা তথা সমগ্র বাংলার সুপরিচিত নাট্যকার। এভাবে ক্রমপর্যায়ে আমরা মৌলিক নাট্যকার হিসাবে মন্মথ রায়, শিবপ্রসাদ কর, অমিয় সেন, সুভাষ সমাজদার ও পরেশ ঘোষ প্রমুখ প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের নাট্যকারদের নাট্যকৃতির পরিচয় লাভ করি ঠিক তেমনিভাবে আমরা স্বাধীনোত্তর পর্বের নাট্যকার হিসাবে অমলেশ মিত্র, সুজিত ভট্টাচার্য, নীহার ভট্টাচার্য, শুভ্রাংশু শেখর মৈত্র, নির্মলেন্দু তালুকদার, হরিমাধব মুখোপাধ্যায়, সুভাষ চট্টোপাধ্যায়, অজিতেশ ভট্টাচার্য, ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়, ভবেন্দু ভট্টাচার্য, জিষ্ণু নিয়োগী প্রমুখ নাট্যকারদের প্রত্যক্ষ করে ধন্য ও নন্দিত হয়ে উঠি। এমনকি নাট্যচর্চার যে সামগ্রিকতা অর্থাৎ নাট্যায়ন এবং নাট্যরচনার যৌথ সমন্বয়ে যা পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অতীত ঐতিহ্যবাহী নাট্যচর্চায় সমৃদ্ধ এতদ্ অঞ্চলের জনপদে উক্ত নাট্যচর্চার সেই সামগ্রিক স্বরূপের সন্ধান পাই। যা বাংলা নাট্যচর্চার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে স্থান লাভ করে গৌরবান্বিত ও সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

মোটকথা বাংলা নাটকের ইতিহাসে রাজধানী কলকাতার সঙ্গে বালুরঘাট তথা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বা সমতালে লড়েছিল। আজও নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে এই জেলা চলমানতার ধারায় ঐতিহ্য সমৃদ্ধ ও গতিশীল।

তথ্যসূত্রঃ

১.নীহাররঞ্জন রায় - 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' (আদিপর্ব), দে'জ পাবিলিশিং কলকাতা-৭৩, সংযোজিত সাক্ষরতা সংস্করণ ১৩৮৭, পৃ. ২৩।

২. প্রাগুক্ত - পৃ. ১৫৫, ২৯৯।

৩. সুকুমার সেন - 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (১ম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১ম আনন্দ সংস্করণ, কলকাতা-০৪, জানুয়ারি, ১৯৯১, পৃ. ৪।

৪. নীহারঞ্জন রায় - বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), পৃ. ১০১

৫. সমর পাল - 'বরেন্দ্র অঞ্চলের সাহিত্য : প্রাচীন যুগ' বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি, 'বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস রাজশাহী বিভাগ : ইতিহাস ও ঐতিহ্য' ঢাকা : গতিধারা, ১৯৯৮/২০০৯, পৃ. ৯৭৯।

৬. মেহ্‌রাব আলী - 'দিনাজপুরের ইতিহাস সমগ্র' (৫ম খণ্ড), ১ম প্রকাশ আগস্ট ২০০০, দিনাজপুর, বাংলাদেশ, দিনাজপুরের ইতিহাস প্রকাশনা প্রকাশ-২০০২, পৃ. ৩৮৬।

৭. নীহাররঞ্জন রায় - 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' (আদিপর্ব), দে'জ পাবিলিশিং কলকাতা-৭৩, সংযোজিত সাক্ষরতা ১৩৮৭, পৃ. ৩০১।

৮. প্রাগুক্ত - পৃ. ৩০১।

৯. Kunjagobinda Goshwami- Excavations at Bangarh (1938-41) p. iii.

১০. রমেশচন্দ্র মজুমদার - 'বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ), কলকাতা, ১ম প্রকাশ ১৩৮০, পৃ. ৪৮।

১১. Francis Buchanan - Account of the District of Zila Dinajpur, p. 129.

১২. F. W. Strong - Eastern Bengal District Gazettears Dinajpur

1912, Chapter-I, page- 1.

১৩. সুনীতিকুমার কানুনগো - দিনাজপুরের রাজনৈতিক ইতিহাস : প্রাচীন যুগ, শরীফ উদ্দিন আহমেদ (সম্পাদিত) 'দিনাজপুর : ইতিহাস ও ঐতিহ্য', ঢাকা, বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, ১ম সংস্করণ, জুলাই ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ৫৬।

১৪. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া - দিনাজপুরের প্রশাসনিক 'ইতিহাস : প্রাচীন ও মধ্যযুগ' শরীফ উদ্দিন আহেমদ (সম্পাদিত) 'দিনাজপুর : ইতিহাস ও ঐতিহ্য', ঢাকা বাংলেদেশ ইতিহাস সমিতি, ১ম সংস্করণ, জুলাই ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ১৪৪।

১৫. মেহ্‌রাব আলী - 'দিনাজপুরের ইতিহাস সমগ্র' (৫ম খণ্ড), ১ম প্রকাশ আগস্ট ২০০০, দিনাজপুর, বাংলাদেশ, দিনাজপুরের ইতিহাস প্রকাশনা প্রকাশ-২০০২, পৃ. ১২।

১৬. মেহ্‌রাব আলী - 'দিনাজপুরের ইতিহাস সমগ্র' (৫ম খণ্ড), ১ম প্রকাশ আগস্ট ২০০০, দিনাজপুর, বাংলাদেশ, দিনাজপুরের ইতিহাস প্রকাশনা প্রকাশ-২০০২, পৃ. ৩৮৫।

১৭. W.W. Hunter - 'Police Circle (Thana) in Dinajpur District - 1872', Statistical Account of the District of Dinajpur, p. 371.

১৮. J.C Sengupta - West Bengal District Gazetteers West Dinajpur, 1965, The state editor, West Bengal District Gazetteers, Calcutta-1, page-2.

১৯. ড. নীহাররঞ্জন রায় - 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' (আদিপর্ব), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, সংযোজিত সাক্ষরতা সংস্করণ ১৩৮৭, পৃ.৫৭৪

২০. প্রাগুক্ত - পৃ. ৫৭৪

২১. ধনঞ্জয় রায় - 'দিনাজপুর জেলার ইতিহাস', কে.পি. বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ ২০০৬, পৃ. ৫৪, ৫৫।

২২. নীহাররঞ্জন রায় - বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), পৃ. ৫৮৩

২৩. অরুণকুমার মজুমদার - 'কৈবর্ত বিদ্রোহ ও কবি সন্ধ্যাকর নন্দী', অমল বসু (সম্পাদিত), 'প্রতিলিপি' পশ্চিম দিনাজপুর জেলা সংখ্যা, আশ্বিন, তেরশ অষ্টাদশী, পৃ. ৭৫,৭৬

২৪. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য - 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' এ.মুখার্জী এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, পরিবর্ধিত একাদশ সংস্করণ, পৃ. ২৯৪, ২৯৫

২৫. শান্তনু প্রামাণিক - পশ্চিম দিনাজপুর জেলার প্রাচীন কবি জগজ্জীবন ঘোষালের 'মনসামঙ্গল', অজিতেশ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), মধুপর্ণী, বিশেষ পশ্চিম দিনাজপুর জেলা সংখ্যা ১৩৯৯, পৃ. ২৩৪-২৩৬

২৬. কুমার রায়, - 'পটভূমি' শিশির মজুমদার (সম্পাদিত), নাট্যশালা শতবর্ষ স্মরণিকা পশ্চিম দিনাজপুর, রায়গঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর জেলা বাংলা সাধারণ নাট্যশালা শতবর্ষপূর্তি উৎসব সমিতি, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৩, পৃ. ৩৩

২৭. কুমার রায় - 'পটভূমি' শিশির মজুমদার (সম্পাদিত), নাট্যশালা শতবর্ষ স্মরণিকা পশ্চিম দিনাজপুর, পশ্চিম দিনাজপুর জেলা বাংলা সাধারণ নাট্যশালা শতবর্ষপূর্তি উৎসব সমিতি, রায়গঞ্জ, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৩, পৃ. ৩৩-৩৪

২৮. গোপাল লাহা - পশ্চিম দিনাজপুর জেলার প্রবন্ধ ও আলোচনাপঞ্জী, অজিতেশ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), 'মধুপর্ণী' বিশেষ পশ্চিমদিনাজপুর জেলা সংখ্যা-১৩৯৯, পৃ.৫৫৮

২৯. ড. অজিতকুমার ঘোষ - 'নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যমঞ্চ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ : আগস্ট ১৯৯৭, শ্রাবণ, ১৪০৪, পৃ.৩৪

৩০. কিরণময় রাহা - 'বাংলা থিয়েটার', ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, নয়াদিল্লী, বাংলা অনুবাদ ১৯৮৫, পৃ. ১

৩১. দর্শন চৌধুরী - 'বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস' পুস্তক বিপণি,

কলকাতা-০৯, পঞ্চম পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ; সেপ্টেম্বর ২০১১, পৃ.৪১

৩২. মেহরাব আলী - 'দিনাজপুরের ইতিহাস সমগ্র' (৫ম খণ্ড), দিনাজপুরের ইতিহাস প্রকাশনা প্রকল্প-২০০২, দিনাজপুর, বাংলাদেশ, প্রকাশকাল আগস্ট ২০০০, পৃ. ৩০৮

৩৩. কুমার রায় - 'আত্মস্মৃতি ও দিনাজপুরে নাটকের পটভূমি প্রসঙ্গে' মতিয়ার রহমান (সম্পাদিত), বার্ষিক সংকলন ১৯৭৪: হীরক জয়ন্তী স্মরণে (দিনাজপুর : দিনাজপুর নাট্যসমিতি, ১৯৭৪), পৃ.২৬

৩৪. সত্যরঞ্জন দাস - 'শতবর্ষের আলোকে সমগ্র দিনাজপুরের রঙ্গমঞ্চ', বর্তমান, ২৩ বর্ষ ২৬৫ সংখ্যা শনিবার ১৫ ই ভাদ্র ১৪১৪, পৃ. ৯৩

৩৫. শুভাশীষ গুপ্ত - 'প্রাক্-স্বাধীনতা দিনাজপুর রঙ্গালয়ের ইতিহাসের পটভূমিকায় (১৮৭৯-১৯৪৭) রায়গঞ্জ রঙ্গমঞ্চের এক-চতুর্থ শতাব্দী (১৯৪৬-১৯৭০), ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ৩১ জানুয়ারী, ২০০৯, পৃ.৭

৩৬. কুমার রায় - 'পটভূমি' শিশির মজুমদার (সম্পাদিত), নাট্যশালা শতবর্ষ স্মরণিকা পশ্চিম দিনাজপুর, পশ্চিম দিনাজপুর জেলা বাংলা সাধারণ নাট্যশালা শতবর্ষপূর্তি উৎসব সমিতি, রায়গঞ্জ, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৩, পৃ. ৩৩

৩৭. প্রাগুক্ত - পৃ. ৩৩

৩৮. যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী (সম্পাদক)- 'মাসিক দিনাজপুর পত্রিকা', ১৩০৬ সাল, পৌষ সংখ্যা, পৃ. ১২৭

৩৯. মেহ্রাব আলী - 'দিনাজপুরে রঙ্গমঞ্চের এক শতাব্দী' (শহরে ও গ্রামে গঞ্জে নাট্যচর্চার ধারাবাহিক বিবরণ), দিনাজপুরের ইতিহাস প্রকাশনা প্রকল্প-২০০২, ক্ষেত্রীপাড়া, দিনাজপুর, সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০২, পৃ. ৪

৪০. প্রাগুক্ত - পৃ. ৪১

৪১. শুভাশীষ গুপ্ত - 'প্রাক্-স্বাধীনতা দিনাজপুর রঙ্গালয়ের ইতিহাসের পটভূমিকায় (১৮৭৯-১৯৪৭) রায়গঞ্জ রঙ্গমঞ্চের এক-চতুর্থ শতাব্দী (১৯৪৬-১৯৭০), ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ৩১ জানুয়ারী, ২০০৯, পৃ. ৩১

৪২. মেহ্রাব আলী, - 'দিনাজপুরে রঙ্গমঞ্চের এক শতাব্দী' (শহরে ও গ্রামে গঞ্জে নাট্যচর্চার ধারাবাহিক বিবরণ), দিনাজপুরের ইতিহাস প্রকাশনা প্রকল্প-২০০২, ক্ষেত্রীপাড়া, দিনাজপুর, সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০২, পৃ. ৭১

৪৩. শুভাশীষ গুপ্ত - 'প্রাক্-স্বাধীনতা দিনাজপুর রঙ্গালয়ের ইতিহাসের পটভূমিকায় (১৮৭৯-১৯৪৭) রায়গঞ্জ রঙ্গমঞ্চের এক-চতুর্থ শতাব্দী (১৯৪৬-১৯৭০), ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ৩১ জানুয়ারী, ২০০৯, পৃ. ৩২

৪৪. মতিয়ার রহমান সরকার - 'স্মরণিকা সম্পাদকের কথা', ষোড়শ নাট্যোৎসব '৯৪ স্মরণিকা (দিনাজপুর ঃ দিনাজপুর নাট্যসমিতি, ১৯৯৪), পৃ. ৩

৪৫. মেহ্রাব আলী - 'দিনাজপুরে রঙ্গমঞ্চের এক শতাব্দী' (শহরে ও গ্রামে গঞ্জে নাট্যচর্চার ধারাবাহিক বিবরণ), দিনাজপুরের ইতিহাস প্রকাশনা প্রকল্প-২০০২, ক্ষেত্রীপাড়া, দিনাজপুর, সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০২, পৃ. ৫৮

৪৬. প্রাগুক্ত - পৃ. ৭০,৭১

৪৭. শুভাশীষ গুপ্ত - 'প্রাক্-স্বাধীনতা দিনাজপুর রঙ্গালয়ের ইতিহাসের পটভূমিকায় (১৮৭৯-১৯৪৭) রায়গঞ্জ রঙ্গমঞ্চের এক-চতুর্থ শতাব্দী (১৯৪৬-১৯৭০), ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ৩১ জানুয়ারী, ২০০৯, পৃ. ৩৭

৪৮. মতিয়ার রহমান সরকার - 'স্মরণিকা সম্পাদকের কথা', ষোড়শ নাট্যোৎসব '৯৪ স্মরণিকা (দিনাজপুর ঃ দিনাজপুর নাট্যসমিতি, ১৯৯৪), পৃ. ১৯

৪৯. মেহ্‌রাব আলী - 'দিনাজপুরে রঙ্গমঞ্চের এক শতাব্দী' (শহরে ও গ্রামে গঞ্জে নাট্যচর্চার ধারাবাহিক বিবরণ), দিনাজপুরের ইতিহাস প্রকাশনা প্রকল্প-২০০২, ক্ষেত্রীপাড়া, দিনাজপুর, সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০২, পৃ. ১২৮

৫০. কালী কর - 'পুরনো সেই দিনের কথা এক বালুরঘাট' মৃণাল চক্রবর্তী (সম্পাদিত), 'দধীচি' উত্তরাধিকার বালুরঘাট সংখ্যা, ষষ্ঠ বর্ষ, চোদ্দশ' সাত, পৃ. ২১, ২৭, ২৮

৫১. সন্তোষ নন্দী - পাদ প্রদীপের আলোয় নাটকের কয়েক দশক, দধীচি, উত্তরাধিকার বালুরঘাট সংখ্যা, সম্পাদক মণ্ডলী, ষষ্ঠ বর্ষ, বিশেষ সংখ্যা, চোদ্দশ' সাত, পৃ. ১৩৩।

৫২. কালী কর - 'পুরনো সেই দিনের কথা এক বালুরঘাট' মৃণাল চক্রবর্তী (সম্পাদিত), 'দধীচি' উত্তরাধিকার বালুরঘাট সংখ্যা, ষষ্ঠ বর্ষ, চোদ্দশ' সাত, পৃ. ৩২

৫৩. ড. অতুলচন্দ্র চক্রবর্তী, - 'নাট্যকার মন্মথ রায়ের জীবনী ও নাট্য সাধনা' পুনশ্চ, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ- ২০ জানুয়ারী ১৯৯৪, পৃ. ৪৩

৫৪. নরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় - সেকাল থেকে একাল: নাট্যচর্চা: পশ্চিম দিনাজপুর-বালুরঘাট নাট্যমন্দির', নাট্যশালা শতবর্ষ স্মরণিকা পশ্চিম দিনাজপুর, সম্পাদক শিশির মজুমদার, ১৯৭৩, পৃ. ৬০

৫৫. প্রাগুক্ত - পৃ. ৬৪, ৬৫

৫৬. ড. অতুলচন্দ্র চক্রবর্তী, - 'নাট্যকার মন্মথ রায়ের জীবনী ও নাট্য সাধনা' পুনশ্চ, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ- ২০ জানুয়ারী ১৯৯৪, পৃ. ৪৩

৫৭. ড. অতুলচন্দ্র চক্রবর্তী, - 'নাট্যকার মন্মথ রায়ের জীবনী ও নাট্য সাধনা' পুনশ্চ, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ- ২০ জানুয়ারী ১৯৯৪, পৃ. ৪৩

৫৮. জ্যোৎস্না কুমার সেন - 'রায়গঞ্জ নাট্যসমিতি থেকে রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট' নাট্যশালা শতবর্ষ স্মরণিকা পশ্চিম দিনাজপুর, সম্পাদক-শিশির মজুমদার, ১৯৭৩, পৃ. ৬৭

৫৯. মন্মথ রায় - 'পশ্চিম দিনাজপুর জেলার নাট্যশালা শতবর্ষ পূর্তি উৎসব প্রসঙ্গে' নাট্যশালা শতবর্ষ স্মরণিকা পশ্চিম দিনাজপুর, সম্পাদক- শিশির মজুমদার, রায়গঞ্জ ১৯৭৩, পৃ. ৩, ৪

৬০. প্রবোধবন্ধু অধিকারী - নাট্যশালা শতবর্ষ স্মরণিকা পশ্চিম দিনাজপুর, সম্পাদক শিশির মজুমদার, রায়গঞ্জ ১৯৭৩, পৃ. ৪

৬১. শুভাশীষ গুপ্ত - প্রাক্-স্বাধীনতা দিনাজপুর রঙ্গালয়ের ইতিহাসের পটভূমিকায় (১৮৭৯-১৯৯৭) রায়গঞ্জ মঞ্চে এক-চতুর্থ শতাব্দী (১৯৪৮-১৯৭০), ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ৩১ জানুয়ারী ২০০৯, পৃ. ৬৭, ৬৮

৬২. প্রাগুপ্ত - পৃ. ৮৫-৮৮

৬৩. প্রাগুক্ত - পৃ. ৯৩, ৯৪

৬৪. সুবর্ণজয়ন্তী স্মরণিকা ২০১৩, ছন্দম, রায়গঞ্জ উত্তর দিনাজপুর, পৃ. ১০০

৬৫. শরদিন্দু দাশগুপ্ত - কালিয়াগঞ্জের নাট্যচর্চা, শারদীয়া, বর্তমানের কথা।

৬৬. নরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তী - যাত্রিক নাট্যগোষ্ঠী, যাত্রিক নাট্যোৎসব ২০১২ এবং শরদিন্দু দাশগুপ্ত, কালিয়াগঞ্জের নাট্যচর্চা, শারদীয়া, বর্তমানের কথা।

৬৭. সাক্ষাৎকার - বিভুভূষণ সাহা, প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক অনন্য থিয়েটার, কালিয়াগঞ্জ উত্তর দিনাজপুর এবং তার তথ্য সম্বলিত ও লিখিত প্রতিবেদন। এর সঙ্গে গৃহীত হয়েছে অরূপ মিত্র, উত্তর দিনাজপুরের থিয়েটার, সময় নাট্যভাষ, প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, সম্পাদনা শেখর সমাদ্দার, পৃ. ২৯

৬৮. সাক্ষাৎকার - মিহির দাশগুপ্ত, বিশিষ্টনাট্যকর্মী, হেমতাবাদ, উত্তর দিনাজপুর। এবং তার তথ্য সম্বলিত লিখিত প্রতিবেদন।

৬৯. সাক্ষাৎকার - সুদীপ্ত মিত্র, বিশিষ্ট নাট্যকর্মী ইটাহার, উত্তর দিনাজপুর

এবং এর সঙ্গে গৃহীত হয়েছে তার তথ্য সম্বলিত লিখিত প্রতিবেদন।

৭০. সাক্ষাৎকার - যোগেশ বর্মন, চোপড়া, ইসলামপুর, উত্তর দিনাজপুর।

৭১. পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক-শিল্পী সংঘের বাঙলা সাহিত্য সম্মেলন, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, ৫-৭ জানুয়ারি।

৭২. A summary of the changes in the Jurisdiction of District in Bengal 1757-1916-Rai Monmohan chakrabartti Bahadur, Revised and Updated by Kumud Ranjan Biswas, Page-294,295

৭৩. মোহরাব আলী, - 'দিনাজপুরে রঙ্গমঞ্চের এক শতাব্দী, পৃ. ১৪০

৭৪. হরিমাধব মুখোপাধ্যায় - পশ্চিমদিনাজপুর জেলার নাট্যচর্চা কিছু প্রশ্ন, কয়েকটি ভাবনা, প্রতিলিপি, সম্পাদক-অমল বসু, তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, আশ্বিন তেরোশ অষ্টাশী, পৃ. ১৫২

৭৫. ব্রাত্য বসু - 'নাট্যার্থে প্রাণবন্ত, সচল রয়েছে বালুরঘাট আনন্দবাজার পত্রিকা, উত্তরবঙ্গ, শনিবার ৩০ জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ২০

৭৬. মধুপর্ণী - পশ্চিম দিনাজপুর জেলা সংখ্যা, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪১৪ এবং হরিমাধব মুখোপাধ্যায়, 'সিদুর রোমন্থন' স্মরণিকা নাট্যোৎসব-২০১৬, বালুরঘাট নাট্যমন্দির সম্পাদক-সন্তোষ সাহা, ১ম প্রকাশ ৬ই মে ২০১৬, পৃ. ৩৫

৭৭. অমলেশ মিত্র - 'বালুরঘাটকে ঘিরে দক্ষিণ দিনাজপুরে নাট্যচর্চা, প্রত্যুষ, সম্পাদক-কৃষ্ণপদ মণ্ডল, দশম বর্ষ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সংখ্যা, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৯২

৭৮. সাক্ষাৎকার— - দীপক রক্ষিত (বিশিষ্ট নাট্যকর্মী), অজিত মহন্ত (সাধারণ সম্পাদক), বালুরঘাট নাট্যমন্দির, এবং তাঁদের তথ্য সংবলিত লিখিত প্রতিবেদন। এর সঙ্গে তথ্যসূত্র হিসাবে গৃহীত হয়েছে— স্মরণিকা নাট্য-উৎসব-২০১৬, বালুরঘাট নাট্যমন্দির সম্পাদক-সন্তোষ সাহা, ৬ মে ২০১৬, পৃ. ৬০-৬৮

৭৯. অরুণকুমার মজুমদার - পশ্চিম দিনাজপুরের খণ্ড ইতিহাস, বিশ্বজ্ঞান, কলকাতা-৯, ১ম প্রকাশ ১বৈশাখ ১৩৯০, পৃ. ১১৯

৮০. হরিমাধব মুখোপাধ্যায় - 'বীক্ষমান স্মৃতি' আত্মস্মৃতিতে উত্তরবঙ্গ, সম্পাদক-অজিতেশ ভট্টাচার্য, ১ম প্রকাশ, নভেম্বর ২০০২, পৃ. ১৯০

৮১. প্রাগুক্ত - পৃ. ১৯১

৮২. আত্মস্মৃতিতে উত্তরবঙ্গ, সম্পাদক-অজিতেশ ভট্টাচার্য, ১ম প্রকাশ নভেম্বর ২০০২, পৃ. ১৯৬, ১৯৭

৮৩. অজিতেশ ভট্টাচার্য - বালুরঘাট নাট্যচর্চায় ত্রিতীর্থ এবং অন্যান্য, নাট্যশালা শতবর্ষ স্মরণিকা পশ্চিম দিনাজপুর, সম্পাদক- শিশির মজুমদার, রায়গঞ্জ, ১৯৭৩, পৃ. ৭৯

৮৪. একাদশ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বইমেলা-২০০৭, স্মরণিকা, সম্পাদনায়-হরিদাস সাহা, স্মরণিকা উপ-সমিতি ১৬-২২ শে জানুয়ারি, ২০০৭, পৃ. ৩৬

৮৫. ব্রাত্য বসু - 'নাট্যার্থে প্রাণবন্ত, সচল রয়েছে বালুরঘাট, আনন্দবাজার পত্রিকা, উত্তরবঙ্গ, শনিবার ৩০ জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ২০

৮৬. বর্তমান - পাক্ষিক প্রতিবেদন গৌরবঙ্গ ২৩ জুন, ২০০৩, পৃ. ১২

৮৭. মধুপর্ণী - বিশেষ উত্তরবঙ্গ সংখ্যা, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, সম্পাদক-অজিতেশ ভট্টাচার্য, পৃ. ১৯২

৮৮. অজিতেশ ভট্টাচার্য - বালুরঘাট নাট্যচর্চায় ত্রিতীর্থ এবং অন্যান্য, নাট্যশালা শতবর্ষ স্মরণিকা পশ্চিম দিনাজপুর, সম্পাদক- শিশির মজুমদার, রায়গঞ্জ, ১৯৭৩, পৃ. ৭৯

৮৯. দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদক- অভিনয়, চতুর্থ বর্ষ, সংখ্যা-৬, সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৭৪, নির্বাচিত নাট্যসমালোচনা এবং পৃ. ৯৪, ৯৫

৯০. অশ্রুকুমার শিকদার - গ্রাম থিয়েটারের তিন দশক: উত্তরবঙ্গ, অসময়ের নাট্যভাবনা, সম্পাদক- রঙ্গন দাসগুপ্ত, বর্ষ-১২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৫, সংখ্যা ৩-৪, পৃ. ৪২

৯১. সাক্ষাৎকার-কমল দাস - (বিশিষ্ট নাট্যকর্মী) ত্রিতীর্থ, এবং তার তথ্য সংবলিত লিখিত প্রতিবেদন। এর সঙ্গে তথ্যসূত্র হিসেবে গৃহীত হয়েছে-আনন্দবাজার পত্রিকা, উত্তরবঙ্গ, রবিবার ২

আগস্ট ২০১৫, পৃ. ১৪

৯২. ড. অপরেশ লাহিড়ী - উত্তরবঙ্গের নাট্যসাহিত্য এবং নাট্যচর্চার ইতিহাস, বইওয়ালা, কলকাতা-৪৮, পৃ. ২৩৪

৯৩. ত্রিতীর্থ প্রোডাকশন বুক, ত্রিতীর্থ, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর।

৯৪. নাট্যচিন্তা নাট্যতীর্থ, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৯

৯৫. নাট্যচিন্তা নাট্যতীর্থ, সপ্তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১৫

৯৬. অনুপকুমার মণ্ডল (সম্পাদনা)- অচিন চৌধুরী কথা : গ্রুপ থিয়েটার শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ, জেলা গ্রন্থাগার, দক্ষিণ দিনাজপুর (১৯১৪-২০১৪), পৃ. ৬৩, ৬৪

৯৭. অমিত সরকার - 'ঐতিহ্যময় ৭০', ৭০ বৎসর পূর্তি উৎসব স্মরণিকা ২০১১, বোয়ালদাড় বারোয়ারী নাট্যসংখ্যা (১৯৪২-২০১১) পৃ. ৭৬

৯৮. সাক্ষাৎকার এবং লিখিত প্রতিবেদন প্রদান করেছেন খিরট্টা আদর্শ ক্লাবের কর্ণধার ড. নিত্যগোপাল বর্মন, খিরট্টা, তপন, দক্ষিণ দিনাজপুর।

৯৯. সাক্ষাৎকার এবং লিখিত ও স্বাক্ষরিত তথ্য-প্রমাণাদি প্রদান করেছেন সুকুমার সরকার, কালদীঘি, গঙ্গারামপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর।